উৎসাহদানের শক্তি, উৎসাহের স্বাদ

উৎসাহদানের শক্তি,
উৎসাহের স্বাদ

থোমাস হোয়াং

এমি পাবলিকেশন

বিষয়বস্তু

	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৫
অনুবাদকের কথা	৬
প্রথম অধ্যায়	**৮**
জিহ্বার বিস্ময়কর ক্ষমতা	৯
ছোঁয়াচে প্রকৃতি	১০
আত্মিকতাহীন উপাসনা	১৩
আমাদের অন্তরের বিষ পরিষ্কার করা	১৪
পরিপূর্ণ রূপান্তর	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	**১৯**
আমারই তো উৎসাহিত হওয়া প্রয়োজন	২০
পর্দা, যীশুর দেহ	২২
প্রভুর কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া	২৫
তৃতীয় অধ্যায়	**২৯**
উৎসাহ অলৌকিক কিছু সৃষ্টি করে	৩০
উৎসাহ, ক্ষমতার যোগানদাতা	৩১
প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহদান	৩৩
সান্ত্বনার মাধ্যমে উৎসাহদান	৩৬
প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে উৎসাহদান	
সতর্কতার মাধ্যমে উৎসাহদান	৩৮
চতুর্থ অধ্যায়	**৪১**
সময়মত বলা কথা,	
কারুকাজ কাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল	৪২
যে কথা হাড় শুকনো করে	৪৩
তিক্ততার মূল	৪৬
তিক্ততার মূল সরিয়ে ফেলার উপায়	৪৮
জিহ্বার পবিত্রতা	৫২
পঞ্চম অধ্যায়	**৫৪**
উৎসাহদানঃ	
শুধু কথার চেয়ে কাজে বেশী সুন্দর	৫৫
স্পর্শের মাধ্যমে উৎসাহদান	৫৬
শোনার মাধ্যমে উৎসাহদান	৫৯
আতিথেয়তার মাধ্যমে উৎসাহদান	৬২
মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার মাধ্যমে উৎসাহদান	৬৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	**৬৭**
উৎসাহদাতা বার্ণবা	৬৮
বার্ণবা, একজন পরিপূর্ণ খাঁটি মানুষ	৭০
বার্ণবা, একজন ভাল মানুষ	৭১
যারা আমার উৎসাহদাতা	৭৩

সপ্তম অধ্যায় **৭৮**
বার্ণবা, পৌলের বিশ্বস্ত সমর্থক ৭৯
পৌলের মন পরিবর্তন ৭৯
পৌলের দশ বছরের প্রশিক্ষণ ৮১
বার্ণবা পৌলকে আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে নিমন্ত্রণ দিলেন ৮২
বার্ণবা ও পৌলের চারিত্রিক পার্থক্য ৮৪
একজন নেতার বিশ্বস্ত সহকারী দরকার ৮৬
অনেকে পৌল হতে পারে, কিন্তু বার্ণবা কমই পাওয়া যায় ৮৯

অষ্টম অধ্যায় **৯৫**
যারা পৌলের বিশ্বস্ত উৎসাহদাতা ৯৬
শিষ্যের গুণাবলী ৯৬
পৌলের অবিশ্বস্ত শিষ্যেরা ৯৭
পৌলের বিশ্বস্ত শিষ্যেরা ১০০
ঈশ্বর পৌলকে কেন ভালোবেসেছেন? ১০১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইটি প্রকাশনার জন্য যাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের সকলের কাছে আমি অশেষ ঋণী।

আমার জামাতা, জে জিউয়ং চয় এর একান্ত আন্তরিকতার প্রশংসা না করে পারি না, কারণ তার উদ্যমে এবং আগ্রহে কোরিয়ান ম্যানুস্ক্রিপ্ট থেকে এই বইটির ইংরেজি খসড়াটি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। তার আগ্রহ ছাড়া বইটির ইংরেজি প্রকাশনাও সম্ভব হতো না ।

লেখক হিসাবে, আমি হাওয়ার্ড হোসাপ শিমের কাছেও কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ। তিনি অতি ধৈর্য সহকারে প্রাথমিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট পুনরীক্ষণ ও সংশোধন করেছেন। পূর্ণ সময়ের জন্য একজন ব্যাংক কর্মচারী হয়েও এই ইংরেজি প্রকাশনার জন্য তিনি অনেক অনেক রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন।

জাস্টিন জেয়োহন কিমকে জানাই আমার বিশেষ ধন্যবাদ, যিনি প্রভুর প্রতি তার অংগীকার বিশ্বস্তভাবে প্রদর্শন করেছেন এবং সার্থকভাবে কোরিয়ান ভাষার গঠনকে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর ও পুনর্বিন্যাস করে অনুবাদের কাজ শেষ করেছেন।

এছাড়া, এমি মিনিস্ট্রির কাজের জন্য আত্ম-নিবেদিত প্রাণ এমি পাবলিকেশনের প্রধান সম্পাদক ইস্টের ওয়নজু ক্যাং এর কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

থোমাস হোয়াং

অনুবাদকের কথা

কোরিয়াতে গিয়েছিলাম 3 D (Dirty, Devil & Dangerous) কাজ করে পরিবারের খাবার যোগাড় করতে। কিন্তু দেখা হলো কয়েকজন ঈশ্বরের লোকের সাথে, যারা আমাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজে।

ভুলেই গিয়েছিলাম, আমি এক সময় ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীর পালক ছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম, ঈশ্বর আমার পালকীয় জীবনের এক মাসের মধ্যেই বেশ কিছু আত্মিক দানও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোরিয়ার কয়েকজন ঈশ্বরের লোক আমাকে মনে করিয়ে দিলেন– মানুষ আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও ঈশ্বর আমাকে ব্যবহার করতে চান।

এদের মধ্যে ডঃ থোমাস হোয়াং একজন, যিনি তার কলেজে আমাকে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন যেন বাংলাদেশে এসে আমি তারই সাথে থেকে প্রভুর পরিচর্যা কাজ করি।

বইটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমার বড় বোন নীলাশ্রী দে'র হঠাৎ সাহায্য যেন হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টির মত নেমে এসেছিল। সেজন্য, আমি তার কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ।

আমি বিশ্বাস করি, এই বইটি আপনাদের সকলেরই ভাল লাগবে। আমি যেমন উৎসাহ পেয়েছি– পেয়েছি প্রভুর কাজে ফিরে আসার সাহস ও উদ্দীপনা। আসুন না, আমরা বাংলাদেশের খ্রীষ্টিয়ানেরা বিভেদ ভুলে, ভালবাসায় একে অন্যকে উৎসাহিত করি। যীশু বলেছেন: "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে ভালবেসো। যদি তোমরা একে অন্যকে ভালবাস তবে সবাই বুঝতে পারবে তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদ)।

এই বইটির ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষীতে পুনরায় ছাপানো হচ্ছে। এই কাজে আমাদের এমি কলেজের চার জন মিশনারি ও একজন স্টাফ তাদের শ্রম দিয়ে রিভিউ কাজে সাহায্য করেছেন যার জন্য তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যাকোব ৩:১-১৮ পদ

আমার ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে সকলেই শিক্ষক হতে যেয়ো না, কারণ তোমরা তো জান, আমরা শিক্ষক বলে অন্যদের চেয়ে আমাদের আরও কঠিন ভাবে বিচার করা হবে। আমরা সবাই নানা ভাবে অন্যায় করে থাকি। যদি কেউ কথা দ্বারা অন্যায় না করে তবে সে নির্দোষ; তার সারা দেহকে সে সামলাতে পারে।..... কিন্তু যে জ্ঞান স্বর্গ থেকে আসে তা প্রথমতঃ খাঁটি, তারপর শান্তিপূর্ণ; তাতে থাকে সহ্যগুণ ও নম্রতা; তা করুণা ও সৎ কাজে পূর্ণ, স্থির ও ভন্ডামিশূন্য। যারা শান্তির চেষ্টা করে তারা শান্তিতে বীজ বোনে এবং তার ফল হল সৎ জীবন।

প্রথম
অধ্যায়

জিহ্বার বিস্ময়কর ক্ষমতা

জিহ্বার বিস্ময়কর ক্ষমতা

কথা বলার গুরুত্ব সম্পর্কিত উদাহরণ তুলে ধরতে বেশ ভাল ও মজাদার একটা পুরানো কোরিয়ান প্রবাদ বাক্য আছে: 'শুধুমাত্র একটি কথা আপনার ঋণ শোধ করতে পারে।' কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা আমাদের ইচ্ছার ছাঁচে গঠিত। আমরা যা বলি, যেভাবে বলি, তা লোকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে এবং তাদের রক্ষা করতে পারে। আবার ঠিক একইভাবে আমাদের কথা কারও ক্ষতে আঘাত লাগতে পারে এবং আহত করতে পারে। সেই জন্য, আমাদের 'জিহ্বার' উপরে আমাদের কর্তৃত্ব রাখার মধ্য দিয়ে তার অপরিমেয় ক্ষমতা জীবনে সত্যিকার 'সার্থকতার চিহ্ন' প্রকাশ করতে সক্ষম।

দু'বছর আগে ঘটে যাওয়া ছোট্ট ঘটনা আমি এখানে বলছি। একদিন সন্ধ্যায় আমি সাবওয়ে স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন একজন মহিলা তার ছোট বাচ্চাটিকে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন এবং প্রশ্ন করলেন: 'দাদু, বলতে পারেন ৭ নম্বর প্রস্থান পথটি কোন্ দিকে?' অবাক হবার মত বিষয়! এভাবে 'দাদু' বলে সম্বোধন শুনে আমি শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদু, ৭ নম্বর প্রস্থান পথটি কোন্ দিকে?' তবুও হতবুদ্ধির মত যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করলাম, 'আমি তো জানি না– আপনার উচিত হবে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করা'।

(উল্লেখ্য: কোরিয়ান সংস্কৃতিতে বয়স্ক লোকদের 'দাদু' বা 'দিদা' বলে সম্বোধন করা খুবই সাধারণ বিষয়, তা তাদের আত্মীয় হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। এটা খুবই সাধারণ নিয়ম, যা একজন মহিলা অচেনা আর একজনকে এভাবে সাবওয়ে স্টেশনেও জিজ্ঞাসা করতে পারে)।

অন্য কেউ ঐ মহিলার প্রশ্নটি গুরুত্বহীন মনে করতে পারে, কিন্তু আমি নিজেকে মোটেই দাদু ভাবতে পারছিলাম না। আমার পাকা চুল হয়তোবা এ বিষয়ে কিছুটা ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু নিজেকে কখনই এত বুড়ো ভাবিনি। 'দাদু' ডাক শোনা খুব একটা মনোরম অভিজ্ঞতা বলা চলে না, কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করা ছাড়া আমার করার আর কি আছে! আসলে আমার কি এমন বয়স হয়ে গেছে? ঐ একটি মাত্র শব্দ 'দাদু' আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে এবং কোন ভাবেই আমাকে ছাড়ছে না। দুটি বছর আগেকার এই ঘটনা, এখনও আমি তা ভুলে যেতে পারছি না। একটি মাত্র শব্দ যথার্থই আমাকে দাদু বানিয়ে ফেলেছে; অন্ততঃপক্ষে আমার নিজের কাছে তো বটেই। যেহেতু আমরা সকলেই জানি, কারও কাছ থেকে অনিচ্ছাকৃত বা অসতর্কভাবে বলা কথায় কষ্ট পাওয়া বিরল কোন অভিজ্ঞতা নয় এবং নিশ্চয়ই আমি এই ঘটনাটি ভাল একটি উদাহরণ বলে বিবেচনা করতে পারি।

আরও একটি উদাহরণ বলছি। বেশ কয়েক বছর আগে ঘটনাটি ঘটেছিল। আমার অফিসের একজন মহিলা কর্মীর বেশ ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তাই আমি ঠাট্টা করেই তাকে বলেছিলাম, তার ব্যায়াম করা উচিত এবং রাতে বেশী না খাওয়া উচিত। আমার এই মন্তব্য তাকে ভীষণভাবে কষ্ট দিয়েছিল। বেশ কিছু সময়ের জন্য তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু একদিন তিনি আমার কাছে ই-মেইল পাঠালেন- লিখলেন, আমি তাকে যে কথাটি বলেছি তাতে তিনি বেশ কষ্ট পেয়েছেন। এভাবেই আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম যে, এমনি অসতর্ক কথায় কেউ ভীষণ কষ্ট পেতে পারে। তখন থেকেই আমি সতর্কতার সাথে আমার জিভ্‌কে ব্যবহার করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পবিত্র বাইবেল আমাদের বলেছে যে, আমাদের খারাপ মনোভাব এবং কৌশলের অভাবের জন্যই নিজেরা স্বার্থপর হই এবং তাতে অন্যদের প্রতি আমাদের সুবিবেচনার অভাব দেখা যায়। যেহেতু আমরা আত্ম-কেন্দ্রিক এবং প্রায়শই আমরা চিন্তা করি না, কখন আমরা খারাপভাবে কথা বলছি এবং অশিষ্টাচারণ করছি। আর তখন শ্রোতাদের কাছে আমাদের কথার পরিণতি কি হতে পারে। সেই কারণেই আমাদের পবিত্র বাইবেলে ১ করিন্থীয় ১৩:৫ পদে বলা হয়েছে যে, "ভালবাসা খারাপ ব্যবহার করে না।" ভালবাসার এই বিষয়টি মহৎ চরিত্রের ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

ছোঁয়াচে প্রকৃতি

এটা হতে পারে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে, সহকর্মীদের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অথবা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, একটি মাত্র অসতর্কভাবে বলা কথা তাদের হৃদয় বিষাক্ত করে এবং দুঃখ-কষ্টের দিকে পরিচালিত করে। আমরা অনেক সময় এইরকম বিষাক্ত হৃদয়ের সামনে পড়ে যাই, যার মুখ দেখতে বিষণ্ন, বুড়ো বুড়ো মনে হয়। হিতোপদেশ ১৬:২৪ পদ এবং ১৭:২২ পদে আমরা এই বিষ সম্পর্কে জানতে পাই, যা আমাদের অন্তর পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এই বিষ দেহকে ক্ষতিগ্রস্থ করবার ক্ষমতা রাখে- যা কিনা অন্য কোন স্থান থেকে নয় বরং সব সময় আমাদের মধ্য থেকেই আসে। বিশেষ প্রকারের এই বিষ এমন এক হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়, যে হৃদয়ে স্বার্থপরতা, শত্রুতা এবং এরকম অনেক ঘৃণার জিনিষে পরিপূর্ণ। যদি এই বিষ আপনার হৃদয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তা সাংঘাতিক সমস্যা করবে, কারণ আপনি অন্যদেরও সংক্রামিত করতে পারেন। এই ধরনের বিষ বিস্তার লাভ করে অন্যান্য অনেক হৃদয়কে সংক্রামিত করে, যেহেতু এটা ছোঁয়াচে প্রকৃতির।

আজকের দিনে, এই বিষ আমাদের সমাজে বেশ বড় একটা সমস্যা। একটু কাছে থেকে দেখলে এটাকে ক্যানসারের মতই মনে হবে। চিরাচরিত অপারেশন পদ্ধতি একটি সংক্রামিত হৃদয়কে পুরোপুরিভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারে না। যদি আমরা আমাদের মধ্যে মন্দতা উৎপন্নকারী এই বিষে ভরা অংশ নির্মূল করতে পারি, তবে আমরা পবিত্র এবং খাঁটি মানুষে রূপান্তরিত হতে পারি। তখন মানুষ যেমন সম্মান করবে, ঈশ্বরও তেমনি স্বীকৃতি দেবেন। অন্য কথায়, আমরা মহৎ এবং শুদ্ধ চরিত্রের লোক হতে পারব।

যীশুর জাগতিক ভাই যাকোব প্রেরিতদের মধ্যে একজন নেতা ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে, অত্যাচারিত খ্রীষ্টিয়ানেরা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে এবং মন্ডলী গঠন করে তাদের বিশ্বাসের চর্চা অব্যাহত রাখে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা উপস্থিত হতে থাকে। নূতন নিয়মে যাকোবের লেখা বইটি যিরূশালেম থেকে বিদেশে অবস্থানরত যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল। এই পত্রাবলীতে মাত্র পাঁচটি অধ্যায় আছে, কিন্তু একটি বিষয় সংশোধন করার প্রেক্ষীতে এটা লেখা হয়েছিল। কারণ সেখানে খ্রীষ্টিয়ানেরা একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিল এবং একে অন্যের আত্মিকতার পথ খুবই কষ্টকর ও বিভ্রান্ত করে তুলেছিল।

এখানে তৃতীয় অধ্যায়টি বিশেষ করে লক্ষণীয়, যেখানে যাকোব উক্ত বিষয়গুলিকে প্রধান বিবেচনা করে কথা বলেছেন। পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণীত হয়ে যাকোব প্রথমেই কথা বলার বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন: "কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক মনে করে অথচ নিজের জিভ্‌কে না সামলায় সে নিজেকে ঠকায়। তার ধর্মকর্ম মিথ্যা" (যাকোব ১:২৬ পদ)। এই কথাটি সরাসরি ব্যাখ্যা করলে এরূপ দাঁড়ায়- যেহেতু আপনি সঠিকভাবে বাইবেল পড়েন, প্রার্থনা করেন, অন্যদের সেবা করেন ও দান করেন; তাহলে কি এই কাজগুলিতে ধার্মিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায় বলে আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন? আপনি যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করেন অথচ আপনার জিভ্‌কে সংযত করতে না পারেন, তাহলে নিজেকে ঠকানো ছাড়া আপনি আর কিছুই করছেন না। এরূপ লোক দেখানো ভক্তি অর্থহীন বলেই বিবেচিত হয়, কারণ তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নাই কিন্তু এসেছে মানুষের কাছ থেকে। এগুলো হচ্ছে মিথ্যা ভক্তি, কারণ অন্তরের ভেতরটা এখনও নোংরামি এবং বিষে ভরে আছে। এই পদটি আমাদের আরও বলেছে যে, লোক দেখানো ধার্মিকতা ঈশ্বরের কাছে কিছুই নয়।

যাকোব ৩:৩-৬ পদের মধ্যে তিনটি রূপক উল্লেখ করে 'কথা বলার' গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের কাছে আলোকপাত করা হয়েছে:

"ঘোড়াকে বশে রাখবার জন্য আমরা তার মুখে লাগাম দিই, আর তখন তাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চালিয়ে নিতে পারি। আবার দেখ, জাহাজ যদিও অনেক বড় আর জোর বাতাস সেটা ঠেলে নিয়ে যায় তবুও মাত্র ছোট একটা হাল দিয়ে নাবিক সেটাকে যেদিক খুশী সেই দিকে নিয়ে যেতে পারে। জিভ্‌ও তেমনি; দেহের একটা ছোট অংশ হলেও তা অনেক বড় বড় কথা বলে। আবার অল্প একটুখানি আগুন কিভাবে একটা বড় জংগলকে জ্বালিয়ে ফেলতে পারে! তেমনি জিভ্‌ও ঠিক আগুনের মত। আমাদের দেহে যতগুলো অংশ আছে

তাদের মধ্যে জিভ্ যেন একটা মন্দতার দুনিয়া। নরকের আগুনে জ্বলে উঠে সে গোটা দেহকেই নষ্ট করে এবং জীবন-পথে আগুন ধরিয়ে দেয়।"

যাকোব প্রথমতঃ ঘোড়াকে বাধ্য করতে তার মুখে লাগাম পরানোর সাথে জিভের তুলনা করেছেন। আমি নিশ্চিত আপনি জানেন ঘোড়া কত বড় প্রাণী। আর যে লাগাম আমরা তার জন্য ব্যবহার করি তা আশ্চর্যজনকভাবে ছোট। তবুও তারা আমাদের বশে আসে এবং এভাবে ঘোড়াকে বশে রাখা সম্ভব হয়। জিভ্ও ঠিক তেমনি, দেহের অতি ছোট একটি অংশ, যা একজনের সমগ্র চরিত্র নির্দেশ করতে সমর্থ এবং অন্যদেরও তার ভাগী করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ জিভ্কে জাহাজের পিছনে থাকা ছোট হালের সাথে তুলনা করা হয়েছে। জাহাজ কতটা বড় তা কোন বিষয় নয়, কিন্তু তার হালটিই চলার পথ নির্দেশ করে দেয়। জিভের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তৃতীয় রূপকটি, তা হচ্ছে অল্প একটুখানি আগুনের স্ফুলিংগ যা সমগ্র জংগলকে পুড়িয়ে দিতে পারে। পবিত্র বাইবেল বলে, জিভ্ একজন মানুষের সমগ্র জীবনকে মন্দতার আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে, যদিও আমাদের দেহের সবচেয়ে ছোট একটি অংশ হচ্ছে জিভ্, তবুও তার রয়েছে অপরিমেয় ভীতিপ্রদ ক্ষমতা।

যাইহোক, আমি কি ইতোমধ্যে পাঠকদের কাছে আমার জিভের ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ করি নাই যে আমি কেমন লোক? এটাইতো দেখিয়ে দেয় যে জিভ্ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, আসলে জিভ্কে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ৮ পদে বলা হয়েছে, " কিন্তু কোন মানুষ জিভ্কে দমন করে রাখতে পারে না। ওটা হচ্ছে অস্থির ও মন্দ এবং ভয়ংকর বিষে ভরা।" আর আমাদের জিভ্ দিয়ে এই ভয়ংকর বিষ অবিরত বের হতে থাকে। তারপরেও, খুব সূক্ষ্মভাবে আমরা যখন পরীক্ষা করি, তখন তা শুধু জিভের বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরের বিষয়ও সেখানে থাকছে। কারণ আমাদের হৃদয়ে যা আছে, তা-ই আমাদের জিভ্ দিয়ে প্রকাশিত হয়।

যে লোকেরা একই জিভ্ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং মানুষকে অভিশাপ দেয়, যাকোব তাদের ভন্ডামি সম্পর্কে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, একই জিভ্ দিয়ে পিতা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট তাঁরই প্রিয় মানব জাতিকে অভিশাপ দেওয়া এবং ঐ একই জিভ্ দিয়ে তাঁর গুণগান করা শুধু ভন্ডামী নয় বরং ভীষণ মন্দ বিষয়! কিভাবে প্রশংসা ও অভিশাপ একই মুখ থেকে বের হয়ে আসে?

১১ ও **১২** পদে, যাকোব এর অবাস্তব দিকটি উল্লেখ করেছেন: "একই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা স্রোতের মধ্যে কি একই সময়ে মিষ্টি আর তেতো জল থাকে? আমার ভাইয়েরা, ডুমুর গাছে কি জলপাই ধরে? কিম্বা আংগুর লতায় কি ডুমুর ধরে? তেমনি করে নোনা জলের মধ্যে মিষ্টি জল পাওয়া যায় না।" আবার, এই দুটি পদ আমাদের একটি বাস্তব দিকও নির্দেশ করছে, তা'হল– আমাদের বলা কথা যেখান থেকে উৎপন্ন হয়, সেই অন্তরের বহিঃপ্রকাশ আমাদের জিভ্ দ্বারা হয়। অর্থাৎ আমাদের অন্তরের কথাই আমরা জিভ্ দিয়ে প্রকাশ করি।

আবার, যাকোব আমাদের এভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন, "কিন্তু তোমাদের অন্তর যদি হিংসায় তেতো হয়ে ওঠে এবং স্বার্থপরতায় ভরা থাকে তবে জ্ঞানের গর্ব কোরো না, সত্যকে মিথ্যা বানায়ো না।" এখানে হিংসা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথাক্রমে তিক্ততা এবং স্বার্থপরতার কথা প্রকাশ করে।

আমরা যখন স্বার্থপর হই, আমরা শুধু নিজেদের কথা ভাবি। আমরা জিততে চাই এবং যে কোন ভাবেই আমরা সার্থকতা অর্জন করতে চাই। এই কারণে আমরা অন্যদের ঈর্ষা করে থাকি; আমরা অন্যদের সার্থকতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখি এবং তাদের ব্যর্থতায় খুশী হই। আর এই তিক্ত ঈর্ষাভাব ঝগড়া সৃষ্টি করে। বাস্তবে স্বার্থপরতা আর ঈর্ষা হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে কাজ করে এবং আমাদের সমাজে সারাক্ষণ ঝগড়া ও সংঘাত সৃষ্টি করে। তারা সত্যিই বিষাক্ত, এবং **১১**, **১২** পদে তা লবণাক্ত জলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বাইরে আমরা ভাল স্বভাব প্রদর্শনের চেষ্টা করি, কিন্তু যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং

তিক্ত ঈর্ষাভাব দেখা যায়, তখন আমাদের জাগতিক জ্ঞান থেকে পাওয়া মন্দ ফলগুলি আমাদের বাইরের ভাল স্বভাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

এমন সময়ও আসে যখন আমরা আমাদের হৃদয় থেকে মারাত্মক বিষের এই স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হই। যাই হোক, প্রায়ই আমরা তা করতে পারি না। আমরা আমাদের পিতা ঈশ্বরের সন্তান এবং যদিও আমরা তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছি, তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মধ্যে থাকা বিষের ফলে কত কষ্ট ভোগ করি। আমাদের অনেকেই অজান্তেই তা করে থাকি, কিন্তু দুঃখজনক হলেও আমাদের কেউ কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তা করে। মন্ডলীর মধ্যে এমন হওয়া খুবই বিপদজনক।

ঈর্ষা বা হিংসার বিপক্ষে বাইবেলের অবস্থান একেবারে স্পষ্ট এবং এটা শয়তানের সবচেয়ে মারাত্মক স্বভাবের একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হিতোপদেশ ২৭:৪ পদে রাগ ও ঈর্ষা এই দুইয়ের মধ্যে একটি চমৎকার তুলনা প্রকাশ করা হয়েছে। রাগকে নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসাকে ভয়ংকর ভাবে অদম্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্র বলেছে, "কিন্তু হিংসার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।" রাগ ও ভীষণ উত্তেজনা, এই উভয়ের রয়েছে ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা, কিন্তু হিংসার সাথে তাদেরও তুলনা করা যায় না। একটি ঈর্ষাকাতর হৃদয় অদম্য বন্যার মত ধ্বংসের কারণ হয়। হিংসা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ধ্বংসাত্মক। এটি শয়তান শত্রুর এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

সকল সৃষ্টির শুরুতে, লুসিফার ছিল ঈশ্বরের একজন প্রিয় স্বর্গদূত, কিন্তু পরিণামে তার ঔদ্ধত্য বেড়ে উঠেছিল। লুসিফার যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমকক্ষ হবার দাবী করেছিল, তখন তাকে স্বর্গ থেকে তার ঔদ্ধত্যের জন্যই বিতাড়িত করা হয়েছিল। ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে একদা তাকে বিতাড়িত করার কারণে ঈশ্বর পতিত স্বর্গদূতের নাম শয়তান বা পাপাত্মাদের অধিপতি রেখেছিলেন। আজও, লুসিফার সুগভীর ঘৃণার অনুভূতি ও হিংসা নিয়ে ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে আসে, কারণ আমরা তো ঈশ্বরের ভালবাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করছি যা সে তো কোন ক্রমেই পাচ্ছে না। মানবজাতির প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে, ঈশ্বরের কাছ থেকে মানবজাতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে তার অন্যতম প্রচেষ্টা।

শয়তান শব্দটির মূল বুৎপত্তিগত গ্রীক শব্দ হচ্ছে 'দিয়াবলোস', যার মানে অপবাদক, ধ্বংসকারী এবং বিচ্ছিন্নতাকারী। আসলে, একদা সস্নেহে লালিত পালিত প্রধান স্বর্গদূত ঈশ্বর প্রেমী মানুষের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নয়, কারণ সে তো অতি চালাক এবং আমাদের পদ মর্যাদায় হিংসুক ও বেদনাহত। এটাই হচ্ছে এক হিংসাকাতর হৃদয়ের পরিচয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি, হিংসা হচ্ছে শয়তানের সবচেয়ে নোংরা, সবচেয়ে মন্দ এবং সবচেয়ে বেশী ধ্বংসকারী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য- যা আমাদের মধ্যেও রয়েছে। যদি আমাদের হৃদয়ে হিংসা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে পৃথিবীতে স্বর্গ বাস্তবায়িত হবে এবং সমাজে শুধুমাত্র শান্তি, আনন্দ, ক্ষমা, গ্রহণযোগ্যতা এবং উৎসাহ দেবার মনোভাবই থাকবে। কিন্তু হিংসার শেকড় থেকেই ঘৃণার অনুভূতি এবং সব রকম তর্ক-বিতর্ক, বিভক্তি ও হতাশার জন্ম নেয়।

প্রকৃতপক্ষে, হিংসার চেয়ে হিংসার ফলগুলি আরও বেশী ভয়ংকর। যখন আমাদের হৃদয়ে হিংসা গুড়ি মেরে ঢোকে, তখন ঝগড়া-বিবাদও সেই সাথে আসে। বাস্তবে, ঝগড়া তখনই শুরু হয় যখন আমরা আমাদের স্বার্থপরতা, স্বার্থপর উচ্চাশা এবং আত্ম-কেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি বেশী মাত্রায় জোর ও গুরুত্ব দেই। যদি এই অসংখ্য স্বার্থপর উচ্চাশাগুলি আমরা অন্যদের জীবনে সম্প্রসারণের চেষ্টা করি, তাহলে আমরা সর্বদাই মানবিক সংঘাত ও ধ্বংসের কথাই শুনব।

আজকাল, অধিকাংশ সামাজিক অবদান, অর্থনৈতিক কর্মপন্থা এবং নৈতিক দর্শনগুলি প্রাথমিক ভাবে আত্ম-কেন্দ্রিক। সন্দেহাতীতভাবে আমরা একক ব্যক্তিত্ববাদী এবং আত্ম-কেন্দ্রিক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে অন্য কারও জন্য সুবিধা সৃষ্টি করার সুযোগ খুবই কম। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার নিদর্শনকে শয়তানের নমুনা বলা যায়। কারণ, বিগত দু'হাজার বছর ধরে এই ধরনের মন্দ চিন্তা-ভাবনাগুলি মুখস্থ করার মত করে গভীর ভাবে মন্ডলীর মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও বৈধভাবে আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের মহান সন্তান হয়েছি এবং থাকতেও চাচ্ছি, কিন্তু নৈতিকভাবে আমরা তেমন আচার-আচরণ নিশ্চয়ই করছি না। সেই কারণে,

খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাস অসংখ্য বিতর্ক, ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং ঘৃণার বিষয়ে পরিপূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি, সারা পৃথিবী ব্যাপী আজ প্রায় বিশ হাজার বিভিন্ন খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় বা দল বা ডিনোমিনেশন সৃষ্টি হয়েছে এবং সবই নীতিগত ভাবে যীশুর নামেই স্থাপিত। আর এই বিভক্তি তাদের নিজেদের কাজে ও চিন্তা-ভাবনায় আত্ম-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য।

কিন্তু আমরা কি সকলেই ঈশ্বরের সন্তান এবং খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোন বলে পরিচিত নই? আমাদের সিদ্ধান্ত কি এটাই ছিল না যে খ্রীষ্টের প্রদর্শিত ভালবাসায় আমরা তাঁকে অনুসরণ করব? যীশু তাঁর মহান মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন; তিনি দয়া করে আমাদের প্রতিটি অন্যায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমরা যদি আমাদের অন্যায়গুলো, এমন কি আমাদের ছোট ছোট ভুলগুলো বর্জন করতে না পারি, তাহলে এটা কি আমাদের জন্য লজ্জার বিষয় নয়?

প্রিয় বন্ধুরা, এই কথাটি আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের সকলকেই জড়িয়ে ধরে আছে; এখানে ঝগড়াটে খ্রীষ্টিয়ান এবং শান্তিপূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান সকলেই সমান। তা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের কাছে বলা যীশুর সহানুভূতিসূচক অনুরোধ শুনতে পারি: 'তুমি যে রকম, আমি ঠিক সেই রকম ভাবেই তোমায় গ্রহণ করেছি এবং ভালবেসেছি। তাই তোমাদের উচিত প্রত্যেকের নানা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একে অপরকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং একে অপরকে ভালবাসা।' ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এই রকম হৃদয় আশা করেন। এই ধরনের হৃদয় যাদের রয়েছে, তাদের জিভ্ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাদের জিভে বিষ থাকবে না, বরং তা জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

আত্মিকতাহীন উপাসনা

যদি আমরা যাকোব ৩:১৫ পদের দিকে দৃষ্টি দেই, আমরা সেখানে যাকোবের কাছ থেকে জাগতিক, আত্মিকতাহীন এবং মন্দ বিষয়ের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী পড়তে পারি। যারা এই ধরনের জাগতিক জ্ঞান অনুশীলন করে, তারা তাদের হৃদয় থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা না করে শুধু মুখেই করে। যারা বাইরে তাদের ধার্মিকতা প্রদর্শন করে কিন্তু তাদের জিভ্ অন্যদের প্রতি বিষে পূর্ণ; শাস্ত্র অনুসারে, এই লোকেরা সহজাত ধারণায় অনুপ্রাণীত, কারণ তারা যে কথা বলে তা আত্মিক নয় বরং বন্য, অবাধ্য এবং পাপে পূর্ণ। যাকোব এরূপ জ্ঞানকে আত্মিকতাহীন জ্ঞান বলেই সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই ধরনের জ্ঞানকে আবার মন্দ জ্ঞানও বলা যায়, কারণ লোকে যখন তাদের জিভ্কে নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করে তখন তা ধ্বংস আনে। আসলে তারা তো স্বর্গীয় জ্ঞানের অনুশীলন করে না বরং শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞানের অনুশীলন করে।

এর মানে, নীতিগতভাবে ঈশ্বরের কোন কোন সন্তান শয়তানের মত কাজ করে, যদিও বৈধভাবে তারা ঈশ্বরের পরিবারের লোক।

১৭ পদে, যাকোব আরও এক ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন, যা উপর থেকে আসে। তিনি লিখেছেন: "কিন্তু যে জ্ঞান স্বর্গ থেকে আসে তা প্রথমতঃ খাঁটি, তারপর শান্তিপূর্ণ; তাতে থাকে সহ্যগুণ ও নম্রতা; তা করুণা ও সৎ কাজে পূর্ণ, স্থির ও ভন্ডামিশূন্য।" এখানে আমরা দেখতে পাই, স্বর্গীয় জ্ঞান অনেক রকম বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আসলে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রথম ও সবচেয়ে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে খাঁটি মনোভাব। একটি খাঁটি হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি এবং তার প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে। একটি খাঁটি মন কখনও স্বার্থ চিন্তা করে না, এমন কি আত্ম-কেন্দ্রিক হয় না। যে মানুষ উপর থেকে জ্ঞান পেয়ে থাকে, সে একজন খাঁটি, ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র মানুষ।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরীয় জ্ঞান হচ্ছে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহ্যগুণ সম্পন্ন। সহ্যগুণ সম্পন্ন মানে শান্ত ও নম্রতার সাথে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো। একটি নম্র হৃদয় স্বীকার করে, অন্যদের কাছ থেকে সব সময়ই তাদের কিছু শেখার আছে এবং শোনার বিষয়েও তারা বেশী মনোযোগী থাকে। ঈশ্বরের কাছ থেকে সহানুভূতি পাবার অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে একটি নম্র হৃদয় সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তি নম্র হতে পারে কারণ

তিনি তো ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছেন। আর যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে তা পেয়েছে তারা সত্যিই তা অন্যদেরও দিতে পারে। নম্রতা অন্য লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে সাহায্য করে থাকে এবং দুর্ভাগা ও কষ্ট পাওয়া লোকদের প্রতিও সহানুভূতি দেখাতে পারে। আমরা যখন অন্যদের মানসিক উৎকণ্ঠার সময়, জাগতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সময় তাদের প্রতি গভীর ভাবে সহমর্মিতা দেখাই, আমরা তখন খ্রীষ্ট সদৃশ সহানুভূতিই প্রদর্শন করি। এই কারণে পবিত্র বাইবেল বলেছে যে, সহানুভূতির মধ্য দিয়ে আমরা প্রচুর ভাল ফল উৎপন্ন করতে পারি। আর এই সহানুভূতি হচ্ছে ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত লোকদের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য, যে জ্ঞান পবিত্র আত্মা দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা। ন্যায়পরায়ণতা শব্দটি আক্ষরিক অর্থে কারও পক্ষ না নেওয়া এবং কোন পক্ষপাতিত্ব না করা বুঝায়। যেমন করে বিচারকেরা প্রভাবিত না হয়ে সমতা বজায় রেখে সকল কেসের বিচার করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তেমন করেই ঈশ্বর চান যেন আমরা ন্যায্যভাবে অন্যদের বিষয় বিবেচনা করি। বামে কি ডানে না ঘুরে, বা কারও পক্ষ অবলম্বন না করে খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত ঈশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করা। তথাপিও, শয়তান সর্বদা মানুষের মাঝখানে এসে নাক গলায় এবং দলাদলি করতে, পক্ষ নিতে ও একজনের সাথে অন্য একজনের বিপক্ষতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। যেহেতু আমরা জানি, কোন দল অথবা সংস্থার মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ; তাই যখনই আমরা কোন অনৈক্য দেখি তখনই আমরা যেন আমাদের একে অন্যের মধ্যেকার বিরোধ সৃষ্টিকারী দেয়াল দ্রুত ভেংগে ফেলি।

সবশেষে, ১৭ পদে আমরা আরও দেখতে পাই যে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে জড়িত রয়েছে সততা বা বিশ্বস্ততা। যখন একজন ব্যক্তির বাইরের আচরণের সাথে তার সত্যিকার অন্তরের আচরণের অমিল দেখা যায়, তাকে একরকম ঠকামি বলা যায়। সহজ ভাষায় আমরা বলি ভন্ডামি। ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত নারী ও পুরুষ হবে এমন বিশ্বস্ত, যাদের বাইরের আচার-আচরণের সাথে অন্তরের আচার-আচরণের নিখাদ মিল থাকবে। এরকম লোকেরাই তো ঈশ্বরীয় কাজের দ্বারা তাদের জিভ্‌কে পরিবর্তন করে থাকে।

আমি এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি, আমি যদিও একজন প্রচারক, তবুও আমি কিন্তু এরকম সমস্যাবলী থেকে অবশ্যই রেহাই পাই না। আমরা সকলেই এই জটিল বিষয়ে আক্রান্ত।

আমাদের অন্তরের বিষ পরিষ্কার করা

আমাদের ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ ইচ্ছা সহজেই আমাদের মুখ দিয়ে বলাতে পারে- 'আমি আপনাকে সম্মান করি।' আমার এই উদ্দেশ্য অকৃত্রিম। তবুও মৌলিকভাবে রূপান্তর না ঘটলে এবং আত্মার আরোগ্য না হলে অতিসত্বর আমাদের মুখ আমাদের হৃদয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছি যে, অনেক লোক আছেন যারা অতিরিক্ত কথা বলেন না; সেজন্য তারা তাদের অন্তরের বিষ ছড়িয়েও দেন না। কিন্তু তারপরেও, একজন ব্যক্তির সত্যিকার স্বভাব সর্বদা ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হয়। কারণ আমাদের হৃদয়ের বিষ সহজে আটকে রাখা যায় না। সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে, এটা আমাদের হৃদয় শয়তানের অনুরূপ করে রূপান্তরিত করে। এতে যে তিক্ত বিষ এবং যে ঘা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, তা শত্রুর পক্ষে বাসা বেঁধে থাকার জন্য খুবই উপযুক্ত। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন অপারেশনের মত কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যেন এই বেদনা থেকে সত্যিই সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি।

আমাদের প্রভু যীশু আমাদের হৃদয়ের আত্মিক বিষ বের করে ফেলতে চান এবং তাঁর চরিত্র সেখানে প্রতিস্থাপন করতে চান। অল্প সময়ের মধ্যে তা সম্ভব নয় কারণ অন্তরের বিষ ও বেদনা থেকে সারা জীবনের জন্য আরোগ্য পাওয়া খুব একটা সহজ অপারেশন নয়, যার প্রক্রিয়া খুবই দীর্ঘ এবং ধাপে ধাপে করতে হয়। প্রথমে হৃদয়ের মধ্যেকার টিউমার পবিত্র আত্মার ছোরা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে প্রকৃতই কেটে ফেলতে হবে। তারপর, পবিত্র আত্মা, যিনি সাহায্যকারী, তিনি আত্মিক শল্য চিকিৎসকের ভূমিকা নেবেন এবং ক্ষত স্থানকে

অবশ্যই পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেবেন। তারপর, আত্মিক অভিষেকের মাধ্যমে ক্ষত স্থান শুকিয়ে যাবে। এখন মৃত ক্যানসার কোষগুলি অবশ্যই বদল করে সেখানে সবল এবং ঈশ্বরীয় কোষ দিতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যায় রাখতে হবে। সবশেষে, উদ্দীপনা শুধুমাত্র তখনই আসে যখন আত্মা রূপান্তরিত হয়ে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং যীশুর চরিত্রের অনুরূপ হয়। এটা এক দীর্ঘ ও চলমান প্রক্রিয়া, যাতে প্রয়োজন প্রতিদিনের চিকিৎসা এবং সারা জীবনের উদ্যোগ। এই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলি শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া।

সংক্ষিপ্ত করে বলতে গেলে এর সাথে জড়িত রয়েছে প্রভুর কাছে আমাদের প্রতিদিনকার দুর্বলতা স্বীকার করা এবং সমস্যাবলী তুলে ধরা। আমাদের মধ্যে যে মারাত্মক বিষ রয়েছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে একমাত্র যীশু আমাদের আরোগ্য করতে পারেন। শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের সামর্থ্যের উপরে আমাদের আস্থা রাখতে হবে; তা শুরু হয় যখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের নিজেদের সামর্থ্য ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমরা আমাদের সমস্যাবলী সমাধান করতে পারি না। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা বিনীত ভাবে অপারেশনের ডাক্তারের যোগ্যতা স্বীকার করি যে, তিনিই চূড়ান্ত ভাবে অপারেশন করে আমাদের ভেতরের শয়তানের প্রভাব সরিয়ে দিতে পারেন। মাত্র একজনই শক্তিশালী সার্জন আছেন যিনি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন, আর তিনি হচ্ছেন পবিত্র আত্মা। শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার শুদ্ধিকরণ ক্ষমতায় পুড়ে খাঁটি হয়ে, জলে পরিষ্কৃত হয়ে, কেটে-ছেটে আরোগ্য পাবার মধ্য দিয়েই এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

যীশু আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে এইসব সমস্যাবলীর মোকাবেলা করা যায়। আমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে আসতে হবে এবং আন্তরিকভাবে তাঁর সাহায্য চাইতে হবে। সমাধানের উপায় হচ্ছে প্রতিদিন তাঁর সাথে কথোপকথনে সময় কাটানো। এও স্বীকার করতে হবে, বলতে হবে- 'প্রভু, আমার জীবনে আত্মিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। আমার মুখ থেকে এখনও বিষ বের হয় এবং আমার আচার-আচরণের ফলে কষ্টের উদ্ভব হয়, আর তা আমার ভাই-বোনদের শক্তিশালী করতে পারে না।' এ রকমটি করে আমরা আমাদের হৃদয় বশীভূত রাখতে পারি। তখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যেকার বিষ পরিষ্কার করতে ও নিষ্ক্রিয় করতে কাজ শুরু করেন এবং আমাদের আরোগ্য করেন ও আমাদের হৃদয়কে রূপান্তরিত করেন। স্বভাবতঃ এভাবে জিভ্‌কে বশীভূত করতে হয় কারণ কথাবার্তা বলা তো যোগাযোগের মাধ্যম এবং আমাদের হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ। এটা আমাদের জানা দরকার যে, পরীক্ষার মাধ্যমে শুদ্ধ বা পবিত্রীকৃত লোকদের চেনা সম্ভব। এরকম পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা জীবনের কথা বলেন, উৎসাহের কথা বলেন এবং যে কোন অবস্থার মধ্যেই তারা আশার কথা, সাহসের কথা এবং শান্তির কথা বলেন। তারা বিষ বাক্য ছড়ান না বরং তার বদলে অনুগ্রহ এবং শান্তির কথা উচ্চারণ করেন।

যাহোক, যে লোকেরা হতোদ্যম এবং যাদের বিচার করার মানসিকতা রয়েছে তাদের চেয়ে আমরা কি আমাদের চারপাশের লোকদের উৎসাহিত করাটা বেশী উপভোগ করি না? আমরা সকলেই এমন লোকদের সাহচর্য সমর্থন করি; কষ্টের সময় এবং একাকী থাকার সময় যাদের উপরে আমরা সত্যিই নির্ভর করতে পারি। আমরা দেখতে পাই যে, যীশুর দেওয়া গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সাথে এরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের তুলনা করা যায়। সেই কারণে, সবচেয়ে কষ্টকর সময়ে আমরা প্রথমেই আমাদের প্রভুর দিকে তাকাই।

এমন কোন একজন লোক নাই যে, একাকীত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই। চূড়ান্তভাবে, আমরা সকলেই নিঃসংগ থাকি। কখনও কখনও, আমি যখন একা আমার অফিসে থাকি তখন আমার সাথে ঈশ্বরের ছোট্ট করে কথাবার্তা হয়, যেমন: 'প্রভু আমি জানি, একদিন আমাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই আমি এ মুহূর্তে স্বীকার করছি, আমার যা কিছু নিজের বলে মনে হয়, তা বাস্তবিক আমার নয়। যে দালানটি সংস্থা আমার জন্য তৈরী করেছে, ব্রডকাস্টিং কোম্পানি এবং আমার করা অন্যান্য সকল কাজগুলিও আমার নয়! যখনই তুমি ডাকবে, আমি জানি– আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। আমাকে অবশ্যই আমার ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। প্রভু, আমি তো সব কিছুতেই একা, নিজের বলতে সত্যি আমার কিছুই নাই। আমি একা।' বাইরে থেকে একাকীত্ব সহজে অনুভব করা যায় না এবং অনেক বার নিঃসংগতা আমাদের সকলকে পেয়ে বসে, এমনকি আশ্চর্যজনক ভাবে আমাকেও পেয়ে বসে। এরকম একটি জীবন সন্ধিক্ষণ আমাদের সকলেরই কোন এক সময় পার হতে হবে।

পালক হিসাবে হাসপাতালের অবরুদ্ধ দরজা দিয়ে পরিদর্শনের জন্য ঢোকার সুযোগ আমি প্রায়শই পেয়ে থকি। এমনি এক পরিদর্শনের সময়, জরুরী বিভাগে, আমি একজন ৬০/৭০ বছর বয়সী ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাই, যিনি আমাকে প্রার্থনা করতে ও আত্মিক সাহায্য দিতে বলেছিলেন। ভদ্রলোক খুব একটা ভাল অবস্থায় ছিলেন না, কারণ তাকে নিঃশ্বাস নিতে অক্সিজেন মুখোশ ব্যবহার করতে হচ্ছিল। তার চারপাশে তার পরিবারের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব জড়ো হয়েছিল যেন তার আসন্ন মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তবু আশ্চর্যের বিষয়, এই ভদ্রলোকের চির বিদায়ের জন্য আলাদা হয়ে যাবার কারণে তাদের কারও এতটুকু কষ্ট অনুভব হচ্ছে বলে মনে হলো না; বরং তারা একে অন্যের সাথে ভদ্রলোককে কোথায়, কখন, কিভাবে কবর দেবে এবং কবর দেবার খরচ কত হবে তা-ই আলোচনা করছিল।

আমার অনুভূতিতে ধাক্কা লাগলো। বুঝতে পারলাম, জীবনের শেষ লগ্নে এসে আমরা কতটা একা ও নিঃসংগ হয়ে পড়ি। তবুও যাহোক, একজন তো প্রত্যেকটি জীবনের মধ্যে বাস করেন এবং একটি মাত্র আত্মা প্রতিটি দেহের খাঁচায় আটকে থাকে। যে রোগীটিকে আমি হাসপাতালে দেখলাম, তাকে তো রোগ আর মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, আর এটা তার একারই অভিজ্ঞতা। এমন কি আমাদের আত্মিক জীবনেও সম্পূর্ণ সততা ও স্বচ্ছতা নিয়ে হলেও ঈশ্বরের সামনে এক এক করে, একক একজন ব্যক্তি হিসাবে আমাদের অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

তবে, জীবন সায়াহ্নে এসে সকলেই যে এমন নিঃসংগতা অনুভব করবে তা নয়। যারা বিশেষতঃ আত্ম-কেন্দ্রিক জীবন-যাপন করেছে, তাদের জীবন শেষ হতে পারে জরুরী বিভাগে এসে। আবার যারা সকলের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে সকলের সাথে মিলে মিশে বাস করেছে তাদের শেষ দিনগুলি সকলের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা পেয়ে উজ্জ্বলতায় ভরে উঠবে। তিনি যে শস্য বুনেছিলেন, এটি তারই একটি চূড়ান্ত ফসল। সারা জীবন স্বার্থপর এবং পৃথকভাবে থাকলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

পরিপূর্ণ রূপান্তর

এভাবে চিন্তা করতে গেলে জিভ্‌কে বশীভূত রাখা নিতান্ত সাধারণ বিষয় হতে পারে না, যেহেতু কথা বলার মধ্য দিয়েই এই গাছটি লাগানো হয়, কারণ খুব ইচ্ছা শক্তি দিয়েও খারাপ কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই দরকার হয় সক্রিয়তা এবং অন্তর্দৃষ্টি, যেন আমাদের বিষের উৎপত্তিস্থল লুপ্ত করা যায়।

উপাসনা, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয়ের বিরাট বাধাজনক হিংসা ভেংগে টুকরো টুকরো করতে পারি। পবিত্র আত্মার অভিষেকের মাধ্যমে আমাদের মনের গভীরে গেঁড়ে থাকা শেকড়, অর্থাৎ হিংসা, লোভ ও শত্রুতার নোংরা বাঁধাগুলো অবশ্যই দিনের পর দিন পরিষ্কার করতে হবে, কেটে-ছেটে ফেলতে হবে এবং পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লাগাতার চেষ্টা করলেই নিশ্চিতভাবে আমাদের আকাংখিত রূপান্তর সম্ভব হবে।

অনেক সময় এই রূপান্তর এমন ভাবে অগ্রসরমান যে, শুধুমাত্র যে ব্যক্তি এই কাজে অগ্রসর হয় সে-ই মাত্র সবশেষে বুঝতে পারে। তবে, যারা তার আশেপাশে থাকে, তারা একটু তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করে; সত্যিই এই ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, আগে এই ব্যক্তি একটুতেই ভীষণ রেগে যেত কিন্তু এখন তিনি বেশ শান্ত ও ভদ্র। এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যেই শান্তি আমাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করে। এই শান্তি জগতের শান্তি নয় যে, পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে তা আসবে আর চলে যাবে। জগতের পরিবেশ পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের শান্তি সব সময় থাকে। সেইজন্যই, খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের শত্রুদের ভালবাসতে পারে এবং তাদের যারা কষ্ট দেয়, তাদের প্রতি ধৈর্য ও নম্রতা দেখাতে পারে। অথচ আমাদের পুরানো হৃদয় একদা হিংসা এবং স্বার্থপরতায় ভরা ছিল। কিন্তু রূপান্তরিত হৃদয় ক্ষমা ও অনুগ্রহে পূর্ণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যদের সেবা করতে এটিই আমাদের সাহায্য করে এবং অন্যদের ভালবাসতে সক্রিয় ভাবে সুযোগ করে দেয়, যদিও তারা আগে ছিল আমাদের শত্রু। আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে অতি স্বাভাবিক ভাবে পবিত্র আত্মার ক্ষমতার দ্বারাই এই

ইচ্ছা আসে। যখন আমরা আমাদের আচার-ব্যবহারে এমন পরিবর্তন দেখতে পাই, শুধুমাত্র তখনই আমরা অনুভব করতে পারি যে, কিছুটা হলেও আমাদের পরিবর্তন ঘটেছে।

শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াটি ক্রমাগত এবং প্রতিদিনের প্রক্রিয়া, যা আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। যেহেতু আমাদের জীবন শুদ্ধ ও পবিত্র হয়েছে, সেহেতু আমাদের পরিবর্তিত আচার-আচরণ আমাদের পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরও প্রভাবান্বিত করবে এবং বড়দের অনুকরণ করার ইচ্ছাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে। এর ফলে, পবিত্র হওয়া বা শুদ্ধ হওয়ার কাজটি উত্তরাধিকার সূত্রে বংশের পর বংশ ধরে চলে আসবে। তবে, আমাদের মানব জীবনে শুধুমাত্র যে ফল আমরা ধারণ করি, তা-ই চিরজীবন থেকে যায়। আর তা অবশ্যই নিশ্চিত ভাবে আমাদের স্বাস্থ্য বা টাকা পয়সা নয়, যা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু স্ব স্ব যোগ্যতা নিয়ে একদিন ঈশ্বরের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তিনি আমাদের পুরস্কার দেবেন এবং নতুন দায়িত্বও দেবেন। নতুন স্বর্গীয় নিয়মের অধীনে বিরাট ভূমিকা রাখতে তিনি আমাদের সুযোগ দেবেন; উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস বলে তিনি আমাদের সম্বোধন করবেন। বিশ্বাসীদের জন্য এই চূড়ান্ত আশীর্বাদ তিনিই সংরক্ষিত করে রেখেছেন।

অল্প দিন আগে, আমার দু'জন হাই স্কুল বন্ধুর সাথে খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। একজন ছিলেন ওকালতি পেশায় বেশ সার্থক, আর অন্যজন ছিলেন ব্যাংকার, অর্থাৎ অর্থনৈতিক পৃথিবীতে মোটামুটি বিখ্যাত। আমরা যখন একটা টেবিলের চারদিকে বসেছি তখন তারা দু'জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দেখতে বেশ তরুণ রয়ে গেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, আধুনিক জীবনের সরু চিড়-ধরা চেহারা আমার বন্ধুদের ভাঁজ পড়া কুঞ্চিত মুখে বেশ ভালই প্রতিফলিত হয়েছে, যা ঠিক আমার ভাঁজ না পড়া মসৃণ মুখের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি অনুভব করতে পারি, জগতের সার্থকতা অর্জনের জন্য হিংসা ও আত্ম-কেন্দ্রিকতার সাথে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। আর তাই তাদের বলিরেখাগুলি যুদ্ধের ক্ষত হিসাবে ফুটে উঠেছে। আমি আমার পাঠক-পাঠিকাদের বলতে চাই যে, এ রকম বলিরেখা সমৃদ্ধ মুখের চেয়ে বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রজ্ঞা ও প্রশান্তি আনতে পারলে ঈশ্বরের চোখে আমরা দেখতে আরও প্রশংসনীয় হব।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন না আমরা আমাদের জীবনে আসা উদ্বেগ ও মাথা ব্যথার কারণগুলি সব ঝেড়ে ফেলে দেই। অনেক লোক যুক্তি দেখিয়ে একথা বলেন যে, সামাজিক জীব হিসাবে আমরা কিছুতেই আমাদের ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন মানবিক উদ্বেগ, হিংসা, বিবাদ এবং অন্যান্য স্বার্থপরতার মত বিষয়গুলি এড়িয়ে যেতে পারি না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এগুলো সবই শয়তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং এগুলো থেকে আমাদের মুক্ত থাকা খুবই কঠিন। কিন্তু পবিত্র হতে চেষ্টা করতে আমাদের কি ব্যর্থ হওয়া উচিত? রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করার আশা ছেড়ে দেওয়া কি আমাদের উচিত? – না, অবশ্যই না! শুধুমাত্র প্রতিদিন ঈশ্বরীয় রূপান্তর যোগ্য বাক্য ধ্যান করা ও প্রার্থনায় সুরক্ষিত থাকার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীরে আত্মিক পুষ্টি লাভ করতে পারি। তারপর, আমরা আমাদের ভিতরে থাকা বিষগুলিকে পুড়িয়ে, কেটে পরিষ্কার করে আরোগ্য লাভ করতে পারি। এভাবে এক অনুপম শান্তি আমাদের নবায়িত জীবনে স্থিতি লাভ করে এবং তখনই পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের বাক্যরূপ বীজ বপন করতে পারেন। ফলে আমরা আমাদের জীবনে আত্মার ফলগুলি ধারণ করতে পারি যা কিনা আমাদের খ্রীষ্টের মত হতে সক্ষম করে তোলে।

এটাই হচ্ছে শুদ্ধ বা পবিত্র হবার প্রক্রিয়া। পবিত্র লোক হিসাবে তখন আমরা খ্রীষ্টের মতন সক্রিয় উৎসাহদাতা হতে পারি। আমাদের পবিত্র হবার মান অনুসারেই স্বর্গরাজ্যে আমাদের শ্রেণী নির্ণীত হবে, যেহেতু স্বর্গের সমাজ হচ্ছে পবিত্র বা পৃথকীকৃত যাজকদের সমাজ। প্রভু চান যেন আমরা সকলেই বেড়ে উঠে তাঁর মত হই; তাহলে তিনি আমাদের জন্য যে আশীর্বাদ প্রস্তুত করে রেখেছেন আমরা তার ভাগী হতে পারি।

ইব্রীয় ১০:১৯-২২ পদ

ভাইয়েরা, যীশু খ্রীষ্টের রক্তের গুণে সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকবার সাহস আমাদের আছে। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য একটা নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন, যেন আমরা পর্দার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর দেহের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে পারি। এছাড়া আমাদের একজন মহান পুরোহিতও আছেন, যাঁর উপরে ঈশ্বরের পরিবারের লোকদের ভার দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে নিশ্চয়তা আসে, এস, আমরা সেই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় খাঁটি অন্তরে ঈশ্বরের সামনে যাই; কারণ দোষী বিবেকের হাত থেকে আমাদের অন্তরকে রক্ত ছিটিয়ে শুচি করা হয়েছে এবং পরিষ্কার জল দিয়ে আমাদের দেহকে ধোওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়
অধ্যায়

আমারই তো উৎসাহিত হওয়া প্রয়োজন

আমারই তো উৎসাহিত হওয়া প্রয়োজন

আমরা জানি, যখন আমরা পরিশ্রান্ত, নিঃশেষিত, ক্ষত-বিক্ষত, তখন কয়েকটি সহমর্মিতার কথা আমাদের কত না সান্ত্বনা এবং উৎসাহ যোগাতে পারে। যারা আত্মিক ও মানসিক ভাবে দুর্বল, তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে শক্তিশালী করে তোলার জন্য উৎসাহ দেওয়ার মত বিকল্প প্রতিকার আর নাই। উৎসাহ দান করাটা এমন এক হাতিয়ার, যা লোকদের জীবন রক্ষা করতে পারে। তবুও, উৎসাহ দিতে হলে, অবশ্যই একজনের জীবনে উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, আমরা শুধুমাত্র তখনই সত্যিকারভাবে অন্যদের উৎসাহিত করতে পারি, যখন আমাদের নিজেদের প্রাণে প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া উৎসাহ ও সান্ত্বনা থাকে।

বেশ কয়েক বছর আগে আমি "জিপি" নামে ছোট্ট সুন্দর একটা গায়ক পাখীকে নিয়ে লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। এই পোষা পাখীটি নিয়ে জিপির মালিকের খুবই গর্ব, কারণ সৌন্দর্য ছাড়াও মোহনীয় ছিল তার গলার স্বর। যাইহোক, মালিক ভদ্রমহিলা খুব চালাক ছিলেন না, কারণ একদিন তিনি জিপিকে খাঁচায় রেখেই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে খাঁচার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। অবাক হবার মতন ঘটনা নয়; ছোট্ট জিপি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মধ্যে ঢুকে গেল। চরম দুঃখে মালিক যখন যন্ত্রটি খুললেন তখন তিনি তার আদরের গায়ক পাখীটাকে ময়লা ও ধুলায় জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাখীটার গায়ে লেপটে থাকা ময়লা ও ধূলা তিনি জল দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর, তাকে চুল শুকানোর যন্ত্রের সাহায্যে শুকনো করলেন। কিন্তু ছোট্ট জিপির ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ঢোকা, ঠান্ডা জলে স্নান এবং চুল শুকানোর যন্ত্রে তাকে শুকনো করার ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মিষ্টি গানের কণ্ঠ চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

জিপির এই ঘটনাটি বেশ বিনোদনমূলক। কিন্তু অন্যান্য গল্পের মতই এটিও মানুষের জীবনের কিছু সত্যি কথা প্রকাশ করে। মানসিক চাপ এবং অনিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিকতা জিপির চমৎকার গানের গলাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কোন কোন সময়, মানুষ হিসাবে আমরা কি ঠিক একই রকম পরীক্ষার মধ্যে পতিত হই না? দুর্ঘটনার কারণে বাকরুদ্ধ এই ছোট্ট পাখীটা সম্ভবতঃ আর কোন দিন তার মালিককে গান শোনানোর ইচ্ছা অনুভব করে নাই। নিজেকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মধ্যে আবিষ্কার করে খুশীর গান গাওয়ার ইচ্ছা তার মধ্য থেকে উবে গিয়েছিল। জিপির এই অবস্থার কথা ভেবে ভেবে মালিকেরও খুশীর গান গাওয়ার ইচ্ছা চলে গিয়েছিল। ঠিক একই ভাবে, আমাদের প্রতিদিনকার দুঃশ্চিন্তা ও সমস্যাবলী আমাদের আগে থেকেই দখল করে রাখে, যার কোন সমাধান আমরা পাই না। আর আমরা মানুষেরা এই অবস্থায় কারও জন্য গান গাইতে ইচ্ছাও অনুভব করি না বরং শূন্য দৃষ্টিতে বসে থেকে নিজেদের দোষ দেই। আমরা বলি, সকলেই বেশ ভাল আছে অথচ আমাদের সমস্যাগুলো নৈরাশ্যজনক ভাবে থেকেই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই আমাদের সকলেরই এইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

পালকেরা যখন প্রতিবেশীদের ভালবাসা এবং একে অন্যকে দেখাশোনার কথা প্রচার করেন, তখন আমরা অনেকেই চিন্তা করি (আবার কেউ কেউ জোরে জোরে বলি): 'পালক, আপনি কি আমার বর্তমান অবস্থার কথা কখনও চিন্তা করেছেন? আমারই ভালবাসা দরকার, আমার প্রতিবেশীর নয়।' আর এরকম চিন্তা-ভাবনা করে শাস্ত্র বাক্য পালন করতে আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও অসামর্থতা জন্মে, সেজন্য আমরা নিজেরা নিজেদের দোষী ভাবি। কিন্তু তবু, বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের, এমন কি আমাদেরও কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে দেন যেন আমরা সকলেই আমাদের প্রতিবেশীদের কষ্টকর অবস্থা ভাল করে বুঝতে পারি এবং তাদের প্রতি যত্ন নিতে পারি।

পবিত্র শাস্ত্রের গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায়টি এমন একটি চমৎকার শাস্ত্রাংশ, যেখানে ঈশ্বর প্রদত্ত নৈরাশ্যের মধ্যেও তিনি কিন্তু তাঁর প্রিয় দাস দায়ূদের জন্য চূড়ান্তভাবে সুবিধাজনক ঘটনা ঘটতে দিয়েছিলেন। যদিও ইস্রায়েলের একজন বীর নায়ক হিসাবে এবং পরবর্তীতে একজন রাজা হবার মধ্য দিয়ে দায়ূদ সব সময় গৌরব ও সান্ত্বনা উপভোগ করেন নাই। তার জীবনে তাকে অনেক ভয়ংকর এবং বিপদজনক ঘটনার মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিল। দায়ূদের এই গীতটির মধ্যে রয়েছে তার ভক্তি ও আরাধনার একটি প্রমাণ: "ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা পার হতে হলেও আমি বিপদের ভয় করব না" (৪ক পদ)। নিঃসন্দেহে তার ছিল ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং ঈশ্বরের সার্বক্ষণিক পরিচালনা, যার জন্য দায়ূদ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে

চলতে পেরেছিলেন। আমাদের প্রভু কোন কোন সময় সুচিন্তিত ভাবেই আমাদের "ঘন অন্ধকারে ঢাকা উপত্যকা" বা মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়ে যেতে দেন। ঠিক একই রকম ঘটনা শ্রদ্ধেয় প্রেরিত্ পৌলের জীবনেও ঘটেছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন: "কারণ আমার পক্ষে জীবন হল খ্রীষ্ট এবং মরণ হল লাভ" (ফিলিপীয় ১:২১ পদ)। আসলে মৃত্যু পৌলের কাছ থেকে বেশী দূরে ছিল না; পবিত্র বাইবেল সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। কৌতুহলপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যারা ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে এবং উৎসর্গীকৃত ভাবেই সেবা করে থাকে, তারা অনেক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়। দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, ঈশ্বর প্রায়শঃ ইচ্ছা করেই অনেক কষ্টকর অবস্থা অনুমোদন করেন। ঈশ্বরের পবিত্র উদ্দেশ্য, যেন তাঁর দাস-দাসীরা নম্র হয়; আর যারা সমস্যায় জর্জরিত, যেন তাদের সান্ত্বনা দিতে ও উৎসাহ যোগাতে পারেন।

ইব্রীয় পুস্তকটি মূলতঃ চিঠি আকারে যিহূদী সমাজের লোকদের কাছে লেখা হয়েছিল। যীশুই যে ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট এবং তিনিই যে সকল পাপীর জন্য ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছেন, সেই শিক্ষা দিতে এটি লেখা হয়েছিল। এই বইটির লেখক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে যিহূদীদের বোঝাতে তাদেরই পালনীয় পুরাতন নিয়মের বলি উৎসর্গের নিয়ম-কানুন উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর, শিক্ষা দিয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট এই সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু। যদিও আমরা জানি যে, সেই সময় অধিকাংশ যিহূদী যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। যারা সেই সময় খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বাস করেছিল, তাদের উপরে ভীষণ তাড়নাও নেমে এসেছিল। কেউ কেউ তাদের স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাজ্য হয়েছিল; আবার কেউ তাদের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা এবং কেউ আবার তাদের বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক পরিত্যাজ্য হয়েছিল। ইব্রীয় পুস্তকটি এই রকম যিহূদী খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যই লিখিত হয়েছিল যারা বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এই লোকেরা বিশেষতঃ আর্থিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত ছিল কারণ তারা সব সময় বৈষম্যমূলক আচরণের শিকারও হচ্ছিল। আজকের দিনে এ ভাবে বলা যায়: যদি এই সব লোকেরা ব্যাংকের সেবা পাবার প্রয়োজন বোধ করতো, তবে তাদের এই ভিন্ন ধর্মে অন্তর্ভূক্তির কারণে ব্যাংক তাদের প্রত্যাখ্যান করতো। তাদের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী, তারা ব্যাংক ঋণ পেতো না এবং তাদের গ্রাহক কমে যেতো। তারা যীশুকে বিশ্বাস করেছিল বলেই এই সব কঠিন আর্থিক শাস্তি তাদের উপরে নেমে আসতো। দ্বিতীয়তঃ তারা সামাজিক ভাবেও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়ার অনুমতি ছিল না এবং এভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য ভাল চাকুরি খুঁজে পাওয়াও কঠিন ছিল। একবার কল্পনা করুন, আপনার প্রতিবেশীরা আপনার পরিবারের প্রতি ভীষণ প্রতিকূল, কারণ শুধুমাত্র আপনার উপস্থিতির কারণেই ঐ গ্রামের জায়গা-জমির দাম কমে গেছে। প্রথম শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ানেরা ঠিক এইরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো, অপমান করা হতো এবং তাদের উপস্থিতি অন্যদের কাছে ঘৃণার বিষয় মনে হতো। আপনারা হয়তোবা অনেকে জানেন, আমেরিকার কোন কোন জায়গায় আফ্রিকান-আমেরিকানদের (নিগ্রো) এখনও এড়িয়ে চলে। কারণ অভিযোগ করা হয় যে, তাদের উপস্থিতি ঐ অঞ্চলের জায়গা-জমির দামের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। বাস্তবিক, আমার এই পরিচর্যা কাজের প্রথম বছর আমি যখন কিছু আফ্রিকান-আমেরিকানদের সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে জড়ো করতে চেষ্টা করেছিলাম, তখন আমেরিকান একটি গ্রাম থেকে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আমাকে শেষ পর্যন্ত পৌর অফিসে যেতে হয়েছিল, কারণ তারা জানতো না যে আমি একজন পালক। অনেক লোক কালো লোকদের সমাবেশের বিষয়ে নালিশ করেছিল; সন্দেহ করা হয়েছিল- এই সমাবেশ শহরের 'নিরাপত্তা' এবং 'সুনাম' বিঘ্নিত করবে। আসলে আপনি দেখতে কেমন, আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই প্রেক্ষীতে একচোখা বিচার মেনে নেওয়া খুব একটা মনোরম ব্যাপার নয়। অবশ্য আমি যে সমস্যা অতিক্রম করেছিলাম, তা প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি অত্যাচারের তুলনায় তেমন কিছুই নয়।

আজকের দিনেও খ্রীষ্টিয়ানেরা, দু'হাজার বছর আগেকার তাদের খ্রীষ্টিয়ান ভাইদের মতই বিশ্বাসের কারণে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা লাভ করছে। কেউ কেউ আবার আর্থিকভাবে লোকসানের অভিজ্ঞতাও লাভ করছে। যেমন বলা যায়- যারা প্রভুকে ভালবাসে, তাদের জন্য দান-দশমাংশ দেওয়া, মিশনারিদের স্পনসর করতে অর্থ দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের বেশ কিছু টাকা-পয়সা খরচ হয়। যেহেতু তারা সাধারণতঃ মিথ্যা কথা বলে না, সেহেতু তাদের প্রদেয় সব রকম খাজনা, ট্যাক্স তারা ঠিকমতই দেয়। তারা দু'টো একাউন্ট খাতা রাখে না। ফলে, অসাধু নাগরিকদের চেয়ে তাদের খরচ স্বভাবতই বেশী হয়ে

থাকে। যাই হোক, সততা ও ভালকাজ করা সত্ত্বেও হয়তো তাদের আর্থিক সমস্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং সেই সাথে প্রবল মানসিক চাপও সহ্য করতে হয়। হতে পারে, টাকা জমানোর চেয়ে তারা প্রচুর ঋণে জড়িয়ে পড়ে।

ঈশ্বরের কাছে তাদের সকল প্রার্থনা রাখা সত্ত্বেও, ভাল নাগরিক হিসাবে জীবন-যাপন করা সত্ত্বেও, যারা খ্রীষ্টকে ভালবাসে তাদের জীবনে এমন অনেক খারাপ কিছু ঘটতে পারে। এইরকম ভাবে কষ্ট সহ্য করার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে প্রার্থনা তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের দান, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, কঠিন প্রত্যাশা নিয়ে মন্ডলীতে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করার ইচ্ছা এবং সুসমাচার প্রচার কাজও বাধা পায়। সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ না হলে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এমন কঠিন ইচ্ছা সব কিছুকে ঘিরে রাখে, আর আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোন পথ খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নাই। ফলশ্রুতিতে, কাজ-কর্ম ছেড়ে দেওয়া এবং সব কিছু অস্বীকার করার চিন্তা স্বাভাবিক ভাবনা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ স্ববিরোধী এই বেপরোয়া মুহূর্তে একজন পালক এমনি একজন অনুৎসাহিত ব্যক্তিকে বলতে পারেন যেন সে তার প্রতিবেশীদের উৎসাহ দেয়। এতে প্রায় সকলেই একথা বলবে: 'আমারই তো উৎসাহিত হওয়া প্রয়োজন; আমার প্রতিবেশীর নয় কারণ সে তো বেশ ভালই আছে।'

এরকম অবস্থায় আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হচ্ছে, প্রথমতঃ অবস্থা বেশী খারাপ হবার আগেই যেন আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের উৎসাহ দেই। যদিও সব সময় ঈশ্বরের আদেশ পালন করা আমাদের জন্য সম্ভব হয় না, তবুও আমরা ঈশ্বরের বাধ্য থাকার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি এবং আমরা নিজেদের ভীষণ দোষীও ভাবতে পারি। মনে হতে পারে যে, আমাদের সম্পূর্ণ আত্মিক গঠন প্রণালী ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন আর ঈশ্বরের প্রশংসা করতে আনন্দ আসে না এবং প্রার্থনার শক্তিও হারিয়ে গেছে। যার ফলে, উপাসনা-আরাধনা আগের চেয়ে আরও বেশী একঘেয়েমিপূর্ণ মনে হয়। মনে হয় যেন প্রচার আর শেষই হবে না; অথচ আমরা এও জানি যে, উপাসনায় আমাদের যোগ দিতে হবে। আমরা অধিকাংশই এই বাজে অভ্যাসের সাথে পরিচিত। আবার, যখন আমরা ভাল অবস্থায় থাকি; যারা এই রকম কষ্টের মধ্য দিয়ে চলছে, আমরা তাদের সমর্থন দিতে আগ্রহ দেখাই না। তার বদলে, আমরা তাদের দোষারোপ করি, বিচার করতে চেষ্টা করি এবং বলি, 'ঐ লোকটির বিশ্বাস ঠান্ডা হয়ে গেছে, আর তাই তাকে এ রকম কষ্টকর অবস্থা পার হতে হচ্ছে।' অথবা, 'লোকটি নিশ্চয়ই কোন ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে, তাই তার কৃত পাপের জন্য এই দাম তাকে দিতে হচ্ছে।'

পর্দা, যীশুর দেহ

উল্লেখিত এই বিষয়গুলো খুব কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এগুলো সবই ভুল বিষয়। যদি আমরা ঈশ্বরের চোখ দিয়ে দেখি, তাহলে সত্য বিষয়টি এর সম্পূর্ণ উল্টো বলেই দেখতে পাব। ঈশ্বর তাঁর লোকদের জীবনে সমস্যা ঘটতে দেন, কারণ তিনি যাদের বেশী ভালবাসেন, তিনি চান যেন তারা তাদের বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়। এটি আমাদের বুঝতে হবে, এরকম পরীক্ষা হচ্ছে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সন্তানদের ভালবাসা দেখানোর জন্য তাঁরই প্রকাশিত পথ। ঠিক এই বিষয়টি নির্দিষ্ট করে ইব্রীয় পুস্তকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইব্রীয় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে প্রভু যে কথা বলেছেন তা'হল: 'আমার ভাইয়েরা, তোমাদের কষ্ট সকল আমি জানি। আমি এও জানি যে, তোমরা সৎভাবে জীবন-যাপন করার জন্য সব রকম ভাবে চেষ্টা করেছ, আর্থিক দায়ভারও পূর্ণ করেছ এবং খাজনা ও দশমাংশও দিয়েছ। তোমরা প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছ এবং আমার আদেশ মেনে চলছ। কিন্তু তারপরেও স্ববিরোধী মনে হলেও, এই সব দুঃখ-দুর্দশা এসেছে। আমি তোমাদের এই সব দুঃখ-কষ্টের কারণগুলি বলছি। এই সবই তোমাদের শক্তিশালী করছে এবং নত-নম্র করছে। তোমরা আমাকে মনে কর। মনে কর, কি ব্যথা আমি ক্রুশের উপরে সহ্য করেছি, আর মন্দিরের পর্দা আগাগোড়া ছিঁড়ে ফেলার জন্য কি দাম আমি দিয়েছি। এভাবেই আমি তোমাদের উদ্ধারের জন্য মহাপবিত্র স্থানে যাবার পথ খুলে

দিয়েছি। তোমরা মনে রেখ যে, তোমাদের দুঃখ-কষ্টের সময় এবং তোমাদের সকল অবস্থার পিছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা লুকানো আছে। তাই, বিশ্বাসের চোখ দিয়ে তাঁকে আরও বেশী করে খুঁজতে থাক কারণ তোমাদের দুঃখ-কষ্টই তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেবে।' (এই প্রসংগে ইব্রীয় ১০:১৯-৩৯ পদ লক্ষ্য করুন)।

পুরাতন নিয়মে যিহূদী উপাসনা-ঘর আলাদা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথমটা হচ্ছে: আবাস-তাম্বুর উঠান, দ্বিতীয়টা হচ্ছে: পবিত্র স্থান এবং তৃতীয়টা হচ্ছে: মহাপবিত্র স্থান। এই মহাপবিত্র স্থানেই সাক্ষ্য-সিন্দুক রাখা হয়েছিল। মহাপবিত্র স্থানে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকার জন্যই তা পর্দা দিয়ে পবিত্র স্থান থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু ক্রুশে মারা যাবার মুহূর্তে যিরূশালেম উপাসনা-ঘরের সেই পর্দাটি "উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিল" (মথি ২৭:৫১ পদ)। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে এই চমকপ্রদ ঘটনার অর্থ আমাদের কাছে কি হতে পারে? এখন, যেহেতু পর্দাটি ছিড়ে গেছে, সেহেতু আমরা আমাদের দোষ-ত্রুটি এবং অন্যায় থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি। এই পর্দাটি ছিল খ্রীষ্টের দেহের (ইব্রীয় ১০:২০ পদ) একটি নমুনা (ইব্রীয় ৮:৫ পদ), একটি প্রতীকী চিহ্ন (ইব্রীয় ৯:৯ পদ) এবং একটি ছায়ামাত্র (ইব্রীয় ১০:১ পদ)।

বাস্তবিকই, কঠিন সমস্যাগুলি আমাদের জন্য সংকেত চিহ্ন, যা ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে আমাদের বাধ্য করে। দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের আমন্ত্রণ দেন যেন আমরা তাঁর সাথে আরও ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠভাবে কথোপকথন করি। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের নিবিড় আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আমাদের সাথে ভালবাসার সহভাগিতা রাখা। তিনি আমাদের তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করার সুযোগ দেন এবং আমাদের সাথে সব সময় যোগাযোগ সম্পর্ক রাখতে চান। আর এই সম্পর্কের মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব, একান্ত ব্যক্তিগত। আমরা অতিমাত্রায় একগুঁয়ে এবং কঠিন-মনা। সেজন্য, কোন কোন সময় আমাদের সাথে ঈশ্বরের কথা বলার জন্য এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে আমাদের জন্য তাঁর শক্তিশালী এবং জরুরী সংকেত ধ্বনি। এভাবে আমাদের জীবনে যে সব দুঃখ-কষ্ট আসে, তা মেনে নেবার মধ্য দিয়েই আমরা সব বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারি। ইব্রীয় ১০:২২ পদ আমাদের কাছে বলে, কিভাবে এই সংকেতের উত্তর দেওয়া আমাদের উচিত: "সেইজন্য বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে নিশ্চয়তায় খাঁটি অন্তরে ঈশ্বরের সামনে যাই; কারণ দোষী বিবেকের হাত থেকে আমাদের অন্তরকে রক্ত ছিটিয়ে শুচি করা হয়েছে এবং পরিষ্কার জল দিয়ে আমাদের দেহকে ধোওয়া হয়েছে।" যীশু ক্রুশে যে রক্ত পাতিত করেছেন, তা আগেই আমাদের পরিষ্কার করেছে, যেন আমরা পবিত্রতায় থেকে পাপকে সচেতন ভাবে অনুভব করি। এই পদ আমাদের একথা বলে- যেহেতু আমরা উদ্ধার পেয়েছি, সেহেতু এখন আমরা খোলামেলাভাবে, সরলতায় ও পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি।

আমাদের কাছে ঈশ্বরের আমন্ত্রণ হচ্ছে- যেন আমরা 'সরল হৃদয়' নিয়ে তাঁর কাছে আসি। ক্রুশে খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব হয়েছে, যা শুধু আমাদের পাপ ধূয়ে পরিষ্কার করেছে তা-ই নয়, কিন্তু পর্দাটি দু'ভাগে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে যেন আমরা নিশ্চিত স্বাধীনতায় মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারি ও ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারি। আর সেজন্য, আন্তরিক হৃদয়ে সর্বশক্তিমানের কাছে আসা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ আনুষ্ঠানিকতায় এই ধরনের সাক্ষাতের গুরুত্ব যথেষ্ট নয় কিন্তু একান্ত আকাঙ্ক্ষায় ও সৎ হৃদয় নিয়েই ঈশ্বরের সামনে আমাদের যাওয়া উচিত।

আমাদের স্বভাব যখন এরকম হয়, তখন আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে পৌঁছে যায়। তখন একটি ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা এমন হয়, যা আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় এবং এই প্রার্থনার এক একটি বাক্য আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে প্রবাহিত হয়। একটি আন্তরিক প্রার্থনা কিন্তু দু'জন লোকের ঘরোয়া আলাপের মত নয় যে, তারা উদাসভাবে একে অন্যের হাত ধরে করমর্দন করে অসংগত কিছু কথাবার্তা বলবে। যেমন– 'আরে, কেমন আছ?' এভাবে তো একজন লোকের সাথে পাকাপাকি সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায় না। লোকেরা যখন একজন আর একজনের সাথে সরলতা বহির্ভূত কথা-বার্তা বলে, তখন তারা ভাসা ভাসা ভাবে নিজেদের প্রকাশ করে। কিন্তু এভাবে তাদের মধ্যে সত্যিকার সহভাগিতার সম্পর্ক তৈরী হয় না। তবে, যদি কেউ তার হৃদয় খুলে দিয়ে সরলভাবে কথা বলে তাহলে তা অপর পক্ষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এটা তো সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যেন আমরা অন্তর-মন খুলেই যোগাযোগ করি। ঠিক একই কথা ঈশ্বরের সাথে

আমাদের সহভাগিতার ক্ষেত্রেও বলা যায়। আমাদের পিতা, আমাদের ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সাথে অর্থাৎ আমাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে চান। সেজন্য, তিনি আমাদের কাছ থেকে অখন্ড মনোযোগ আশা করেন। আমরা যখন সমস্যায় পড়ি, তখনও তিনি সরল হৃদয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে আমাদের উৎসাহ দেন।

এছাড়া, ঈশ্বরের কাছে আসার আগে আরও একটি শর্তের কথা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা'হল: আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে "বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর আছেন" (ইব্রীয় ১১:৬ পদ)। অন্য কথায়, আমাদের অবশ্যই এই দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে, আমাদের ঈশ্বর একজন সত্য ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ম্লান হয়ে যায় না। আর আমাদের এই বিশ্বাসও থাকতে হবে, যারা আমাদের প্রভুর কাছে সরল ও খোলামেলা হৃদয় নিয়ে আসে, তিনি তাদের সবকিছু যোগান দিতে পারেন ও তাদের আশীর্বাদ করতে পারেন। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকা উচিত নয়।

কল্পনা করুন, আপনার মেয়ে আপনার কাছে এসে এক জোড়া নতুন জুতা চাইল। তার চাওয়ার ধরনের উপর কিন্তু আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন– তাকে দেবেন কি দেবেন না। যদি আপনার মেয়ে হেলাফেলা করে আধা সন্দেহ নিয়ে চায়, তাহলে তার ইচ্ছা পূরণের ব্যাপারে আপনি কি বেশী একটা গরজ করবেন? সম্ভবতঃ না। ঠিক একইভাবে, আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের এমন করে প্রার্থনা করা দরকার যেন তিনি আমাদের আরও বিশ্বাস দান করেন। পবিত্র শাস্ত্রে প্রভু বলেছেন, " যদি একটা সর্ষে দানার মত বিশ্বাসও তোমাদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও,' আর তাতে ওটা সরে যাবে" (মথি ১৭:২০ পদ)। যীশু যেমন বলেছেন, যাদের বিশ্বাস আছে তাদের জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। বিশ্বাসের সংগে ঈশ্বরের শক্তিও প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাসের স্বল্পতা হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা।

ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের বেশী বিশ্বাস অর্জনের জন্য প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা খাঁটি হৃদয় নিয়ে এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের নিশ্চয়তা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে দৌড়ে আসতে পারি, আর চিৎকার করে বলতে পারি, 'পিতা, এই যে আমি'। ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমাদের উচিত আমাদের অন্তর-মন ঢেলে দেওয়া, যিনি তাঁর ইচ্ছা মত আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এর অর্থ, অতীতে আমরা যে সব জাগতিক কৌশল ব্যবহার করেছি তা সবই বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের পথ ত্যাগ করে তাঁর পথে চলতে হবে। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের প্রভু আমাদের আচার-আচরণ অনুমোদন করবেন। অতঃপর, তখনই তিনি আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে শুরু করবেন।

যেহেতু আমরা হচ্ছি 'বিশ্বাসের সন্তান', তাই আমাদের লাগাতার প্রার্থনা করে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আমাদের যথেষ্ট আত্মিক দৃঢ়তা দিচ্ছেন। প্রার্থনা করা মানে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভর করা। আমরা জানি, আমাদের নিজেদের শক্তিতে আমরা কিছুই করতে পারি না, সেজন্য প্রার্থনা বিশ্বাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে সত্যিকারভাবে প্রার্থনা উৎসর্গ করি, তখন আমরা যে তাঁর উপরে সত্যিই আস্থাশীল তা তিনিও স্বীকার করে থাকেন; আর তখন তাঁর অনুগ্রহ তিনি আমাদের প্রচুর রূপে দেন। ঠিক সেই ক্যানারি পাখী জিপির মত, আমরা অনেক সময় আমাদের প্রতিদিনকার দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য এবং মানসিক চাপে বাঁধা পড়ি। ফলে, ঈশ্বরের উপস্থিতি জেনেও খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তাঁর উপরে নির্ভর করতে ভুলে যাই। সব কিছু যখন এভাবে ঘটে, তখন উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই কষ্টকর একটি অবস্থায় আমাদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের পিতার আর কোন উপায় থাকে না। আমাদের নত-নম্র করার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবহার করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় থাকে না; কারণ তিনি আরও একবার আমাদের বোঝাতে চান যে, আমাদের নিজেদের দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়। তাই, আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি, যা ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে যাবার সত্যিকার পথ। আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁর সবল হাত দু'টি বাড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষমান; কখন আমরা সন্দেহ না করে, একটি শিশুর মত বিশ্বাসে, নম্র ও সরল হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে যাব।

যেহেতু মহাপবিত্র স্থানের পর্দাটি দু'টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেছে, সেহেতু এখন আমরা ঈশ্বরের উপাসনাগারে যে কোন সময় প্রবেশ করতে পারি। আত্মিকভাবে এর অর্থ, আমরা এখন শুধুমাত্র অটল প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যখন প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর সিংহাসনের কাছে

এগিয়ে আসি, তখন তাঁর সন্তানের মত তাঁর কাছে আমাদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা স্বীকার করতে হবে। তারপর, তাঁর প্রতি আমাদের পূর্ণ ভক্তি দেখাতে হবে এবং আমাদের সকল অখন্ড মনোযোগ তাঁর দিকেই রাখতে হবে। সেজন্য দরকার হবে অতি উচুঁমাত্রার মনোযোগ। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার, যখন আমাদের শক্তির অভাব ঘটবে তখন আমাদের পরামর্শদাতা পবিত্র আত্মা আমাদের সোজা করে ধরে রাখতে উপস্থিত আছেন। সেজন্য, তাঁর নির্দেশনা এভাবে আমাদের চাওয়া উচিত: 'পবিত্র আত্মা, এস এবং আমার হৃদয় স্পর্শ কর, যেন আমি সরলতায় এবং পূর্ণ বিশ্বাসের নিশ্চয়তায় আমার পিতার সাথে কথা বলতে পারি।' পবিত্র আত্মার প্রতি আপনি যখন পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হবেন, তখন তিনিই স্বর্গীয় পিতার কাছে এগিয়ে যেতে আপনাকে সঠিক নির্দেশনা এবং পরিচালনা দেবেন।

প্রভুর কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া

প্রার্থনাকে যোগাযোগের একটা পথ ছাড়া নিশ্চয়ই আর কিছু বলা যায় না! কারণ প্রার্থনা হচ্ছে প্রভুর সাথে আমাদের কথাবার্তা বলা। প্রার্থনার সময় একজন অবশ্যই আন্তরিকভাবে এবং অর্থপূর্ণভাবে, গৎ বাধা একই কথা বার বার না বলে প্রার্থনা করবে। আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অনুরোধে ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে মনোযোগ দেন। তাছাড়াও, যেহেতু যোগাযোগ মানে স্বাভাবিকভাবেই দু'দিক থেকে দু'জনের আলাপচারিতা, আর তাই ঈশ্বর কি বলেন, অপর পক্ষের তা শুনতে ভুলে গেলে চলবে না। আবার অন্যদিকে, আমরা চুপচাপ তাঁর কথা শুনেও আমাদের প্রার্থনা চালিয়ে যেতে পারি। শান্ত এবং মৌন ধ্যানের মাধ্যমে, আমাদের সব রকম দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বর কি বলেন তা আমরা শুনতে পারি। আমরা তাঁর উদ্দেশ্য জানতে পারি এবং আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান সম্পর্কেও শিখতে পারি। ঈশ্বরের কথা শুনতে গিয়ে আপনি এও লক্ষ্য করবেন যে তিনি আমাদের সাথে বুঝবার মত করেই কথা বলেন। আমাদের পরামর্শদাতা পবিত্র আত্মাকে ধন্যবাদ দেই, কারণ তিনি আমাদের অনুপ্রাণীত করেন। আমার, কোন কোন সময় ঈশ্বর পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্য দিয়েও আমাদের সাথে কথা বলেন। এই সবই হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতা। আমরা যদি আমাদের মধ্যস্থতাকারী পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাথে সহজ সরলভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাই, তাহলে তিনি তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। পুত্র যীশু এবং পবিত্র আত্মার সাথে সাক্ষাতের খুব ভাল একটি উপায় হচ্ছে প্রার্থনা। এভাবে শুধু যে আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি তা নয় কিন্তু তাঁর উপস্থিতির বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিও লাভ করতে পারি। এটা যখন ঘটে তখন আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হই এবং সত্যিই তাঁর সন্তান বলে বিবেচিত হই।

তবুও যাহোক, এটাও খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাওয়া যাবে যে, বলা যতটা সহজ কিন্তু কাজে করাটা খুব একটা সহজ বিষয় নয়। কারণ যখন কোন আলাপচারিতা হয় তখন যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশও দরকার হয়। টেলিভিশন চালিয়ে রেখে বা জোরে জোরে গান-বাজনা চালিয়ে রেখে আমাদের প্রভুর সাথে কথাবার্তা বলা একেবারেই অসম্ভব। এ রকম সময়ে যদি আত্মিক চোখ দিয়ে আমরা সতর্কভাবে আমাদের বাড়ীর দিকে তাকাই, তাহলে আমাদের শত্রুপক্ষের উপস্থিতি আমরা খুব স্পষ্টই অনুভব করতে পারব। এই সব বাধা-বিপত্তি আমাদের প্রার্থনাকে খুবই কষ্টসাধ্য করে না দিলেও তা বেদনাদায়ক তো বটেই। এরকম আত্মিক পরিবেশে যদিও অনেকে কিছু কথাবার্তা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তবুও খুবই তাড়াতাড়ি তারা এও আবিষ্কার করতে পারে যে, স্বর্গ সিংহাসনের কাছে তাদের প্রার্থনা পৌঁছাতে গভীরভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের পিতার সাথে ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা অনধিগম্য বলা যায়। এর সমাধান কিন্তু খুব সহজ। এই পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে হলে একজনকে অবশ্যই সকল ধরনের মন্দ আত্মাদের তাড়িয়ে পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে দিতে হবে। টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়ে তার বদলে খ্রীষ্টিয়ান গান বাজানো যেতে পারে। এ রকমটি করতে পারলে আমাদের প্রার্থনা নদীর স্রোতের মত বয়ে যেতে থাকবে।

আমাদের প্রভু যে সব পবিত্র স্থানে থেকে নেতৃত্ব দেন, স্বর্গদূতেরা সেখানে প্রবল উৎসাহে পাহারা দিতে থাকে। ইদানিং কালে, আমার এক সহকর্মী, যিনি আফ্রিকাতে পরিচর্যা কাজ করেন, যার রয়েছে ভাববাণী বলার দান; তিনি আমাদের চার্চ পরিদর্শন করতে আসেন। রবিবার গীর্জার পরে তিনি আমার কাছে এসে

বললেন, আমাদের উপাসনা ঘরে ঢুকেই স্বর্গদূতদের উপস্থিতি দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। তার দর্শনে, তিনি যীশুকে আমাদের উপাসনার স্থানে দেখেছিলেন এবং সম্পূর্ণ স্থানটি প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল। আমার পরিচর্যা কাজে এই সহকর্মী আমাকে বেশ উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'ঈশ্বর আপনাকে সারা পৃথিবী ব্যাপী ব্যবহার করতে ইচ্ছুক এবং তাঁর ইচ্ছা এখন পূর্ণ হতে যাচ্ছে।'

যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বর গীর্জাঘরের কেন্দ্রস্থলে থাকেন, পবিত্র আত্মাও ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে তাঁর মহাপরাক্রম প্রদর্শন করেন। আপনার পালক খুব বড় একজন বক্তা নাও হতে পারেন, উপাসনার গানের তাল অনেক সময় কেটে যেতে পারে, কিন্তু তবু, সম্পূর্ণ নিখুঁত না হলেও পবিত্র আত্মা আমাদের মত পুরুষ ও মহিলাদের আনন্দের সাথে ব্যবহার করে থাকেন। পালক, প্রশংসা ও আরাধনাকারী সংগীতদল ইত্যাদি সামনে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া বুদ্ধির কাজ নয়, তারা কিন্তু সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। পালক বা সংগীতদল কেউই উপাসনার মধ্যমনি নয়, কিন্তু মধ্যমনি হচ্ছে পবিত্র আত্মা, যিনি তাদের মাধ্যমেই তাঁর কাজ সম্পাদন করেন। সেই জন্য বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখেই আমাদের শিখতে হবে। মানবিক দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পবিত্র আত্মা তাঁর ইচ্ছা সার্থক করতে বিনতি করে থাকেন, যেন ঈশ্বরের সামনে এগিয়ে আসা কোন একজন ভক্ত লোকের মধ্য দিয়েও উপাসনাকারীদের আশীর্বাদ করতে পারেন। এই ধরনের আচার-আচরণ ও গ্রহণযোগ্যতার ফলশ্রুতিতে পবিত্র আত্মার মহৎ এবং আশ্চর্য কাজগুলি মন্ডলীর মধ্যে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, একটি পবিত্র স্থানে এসে ঈশ্বরের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্য দিয়ে আমরা যীশুর সাক্ষাৎ পেতে পারি এবং আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারি। এটি আমাদের সকলের জন্যই উপকারী। যদি আপনি চার্চ থেকে দূরে কোথাও থাকেন বা চার্চে যেতে মোটেও সময় না পান, তবু আপনি সপ্তাহের ছুটির একদিন প্রভুর কাছে আসতে পারেন। অবশ্য, প্রভুর কাছে আসতে না পারার নানা কারণ আছে, কিন্তু সেগুলো সবই শুধু অযুহাত মাত্র। আপনি যদি প্রবল উৎসাহ নিয়ে ও সরল অন্তরে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কামনা করেন, তাহলে এক্ষেত্রে সময় এবং দূরত্ব তেমন কোন বিষয় নয়। আমরা যদি সকলেই সপ্তাহের ছুটির একটি দিন প্রভুর কাছে এসে কথাবার্তা বলি, তাহলে আপনি এবং আমি প্রচুর উৎসাহ পাব এবং দিনের পর দিন ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি লাভ করব।

এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, শুধুমাত্র মানবিক সত্তা দিয়ে সত্যিকার উৎসাহ চেপে রাখা যায় না। যদি আমাদের চারিদিকের লোকেরা আজকে আমাদের আনন্দ দান করে, তাহলে পরের দিনই দুঃখ দেবে, কারণ জাগতিক উৎসাহগুলো সবই মানবিক স্বভাবের ভিত্তিতে গড়া। দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে এটাই যে, লোকেরা উৎসাহ দিক বা নিরুৎসাহিত করুক, সবই তাদের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে। লোকদের উপরে আমরা তো পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না। নিজেকে প্রশ্ন করুন: লোকদের উপর কতখানি গুরুত্বপূর্ণভাবে নির্ভর করে জীবনে কতবার ভীষণ কষ্ট ভোগ করেছেন? দুঃখ-কষ্টে কতবার চিৎকার করে বলেছেন, 'ঐ লোকটিকে আমি এত বিশ্বাস করতাম, আর সে কি-না আমার সাথে বেঈমানি করল?' জগতের মানুষের প্রতি নির্ভর করলে আমরা অবশ্যই আঘাত পাব। এটি একটি অবধারিত সত্য ও যা মানুষের পাপ স্বভাবের মূলে গ্রোথিত।

সে যাইহোক, তার মানে তো এটি নয় যে, আমরা অন্যদের কাছ থেকে দূরে থাকব; বরং ঈশ্বর চান যেন আমরা একে অন্যকে ভালবেসে কাছে টেনে নেই এবং মেনে নেই। কোন শর্ত ছাড়াই ভালবাসতে তিনিই আমাদের আমন্ত্রণ করেছেন; তারা যেমনই হোক আমরা যেন আমাদের হাত দু'টি বাড়িয়ে তাদের স্বাগত জানাই। নিঃস্বার্থ ভালবাসা মানে, কারও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মাথা না ঘামানো। এর মানে, যে কোন অবস্থায় তাদের ভালবাসতে হবে। এই ভাবে ভালবেসে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের প্রথম পাওয়া অবিশ্বাস্য ক্ষমতা প্রকাশ করতে সমর্থ হই। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এই ক্ষমতা এবং উৎসাহ, শর্তহীনভাবে আমরা অন্যদেরও উৎসাহ দিতে ব্যবহার করতে পারি। কারণ এই ক্ষমতা আমাদের ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হয়।

যারা বিয়ে করেছেন, তারা তাদের স্ব স্ব বিবাহিত সঙ্গীকে উৎসাহিত করুন। শুধুমাত্র দিনের শেষে বাড়ীতে ফিরে গিয়ে নয়, কিন্তু সব সময় বিভিন্নভাবে তাদের প্রতি সমর্থন দেখান। অবশ্যই অন্যদের শক্তিশালী করতে ও তাদের প্রতি আমাদের সীমিত চেষ্টা দিয়ে সমর্থন দেখাতে হলেও ঈশ্বরের সাহায্য আমাদের দরকার

হয়। প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে কথাবার্তা বলার মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই তাঁর সান্ত্বনা এবং তাঁর ক্ষমতা লাভ করতে পারি।

ব্যক্তিগতভাবে, স্বামী হিসাবে আমি ও আমার স্ত্রী এবং তিনটি সন্তানকে আমার সাধ্যানুসারে উৎসাহ দিয়ে থাকি। যদিও প্রায়ই আমি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকি, তবুও প্রতিদিন আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে ই-মেইল পাঠাই এবং প্রতিদিন আমার স্ত্রীর সাথে মুঠো ফোনে কথা বলি। আমার ই-মেইলে লেখা চিঠির আকার কয়েকটি শব্দের মধ্যে সীমিত থাকে, আবার কখনও বা বেশ লম্বা চিঠিও হয়ে যায়। কিন্তু আমার ভালবাসার মানুষদের সাথে প্রতিদিনই যোগাযোগ করতে আমি যারপর নাই চেষ্টা করি।

সরলভাবে বলছি, বিগত কোন একটি মাসে আমি আমার পরিবার থেকে দূরে ছিলাম, আর কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, প্রতিদিন আমার পরিবারের সাথে মুঠো ফোনে আলাপ বা ই-মেইল করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদিন বা দু'দিন বাদ গেলে আমার পরিবারের সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন হয়। ছেলে-মেয়েদের কাছে ই-মেইল না করার জন্য আমার স্ত্রী আমাকে বকাঝকা করতে থাকে। 'তুমি আমাদের কাছে ই-মেইল পাঠাও নি কেন? তুমি কি আমাদের ভুলে গেছ?' এটি তাদের প্রশ্ন। এরকম অবস্থায় ব্যস্ত থাকার অযুহাতও চলে না, আর তাই আমাকেও অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

আসলে, অনেক সময় যখন কোন অযুহাত চলে না তখন অবশ্যই শর্তহীনভাবে এবং না থেমেই আমাদের ভালবাসা দেখাতে হয়। একদিন সকালে, আমার ছোট মেয়ে ফোনে ডেকে আমাকে প্রার্থনা করতে বলল, কারণ যাতায়াতের সময় তার বেশ ঠান্ডা লেগেছিল। তাই আমি ফোনেই তার জন্য আরোগ্যদায়ী প্রার্থনা করলাম। পরদিন সকালে সে আবার আমাকে ফোন করল। তার গলার স্বর খুশীর আমেজে পরিপূর্ণ: 'বাবা, তোমার মিটিং কেমন ছিল? তুমি নিশ্চয়ই উপাসনা পরিচালনা করতে প্রস্তুতি নিতে নিতে বেশ ক্লান্ত..... আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করি, কেমন?' বেশ অনেক সময় ধরে আমি আমার ফোনে কান লাগিয়ে আমার মেয়ের প্রার্থনা শুনলাম। এটি সত্যিই চমৎকার একটি প্রার্থনা ছিল।

আমার ছোট মেয়ে মাত্র কলেজ পাশ করেছে, আর সব সময় সে প্রার্থনা করে যেন, তার বাবা দিনের পর দিন ঈশ্বরের নম্র দাস হয়ে ওঠে। আমার ছেলে-মেয়েদের প্রার্থনা আমার জন্য এক অমূল্য উৎসাহের ভান্ডার। যখন তারা বলে, তারা আমার পরিচর্যা কাজের জন্য কতটা গর্বিত ও কতটা সুখী, তখন আমি আনন্দের সাগরে ভাসি, আর আমার শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের নৈতিক শক্তি সামনের দিকে আরও এগিয়ে যায়। আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা এভাবে প্রতিদিন আমাকে উৎসাহিত করে আমার অনুভূতিকে জাগিয়ে রাখে। তাদের কথা যেন আমার কাছে 'জীবন রক্ষাকারী'। তার বদলে, আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি: 'পিতা ঈশ্বর, আমার সন্তানদের জন্য আমি তোমাকে খুবই ধন্যবাদ জানাই। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে, তোমার চোখে তারা কেউই বিপথগামী নয় বরং তারা তোমাতে পরিপূর্ণভাবে অনুরক্ত। পিতা, আমার সন্তানদের তুমি তোমার পক্ষে পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হিসাবে তৈরী কর।'

এর আগে আমরা এও আলোচনা করেছি, যখন আমরা নিজেরা শক্তিশালী হই তখন আমরা অন্যদেরও যথেষ্ট সাহসী ও শক্তিশালী করতে পারি। আশা করি, এই অধ্যায়ে আমরা আন্তরিকভাবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রেখে তাঁর সিংহাসনের কাছে উপস্থিত হয়ে শক্তি পাবার উপায় পুনঃআবিষ্কার করতে পেরেছি।

আমাদের অনেকেই উপাসনার স্থানে এসে যীশুর সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন, যেখানে শয়তানের প্রবেশাধিকার খুবই কম। তাই, আমি সকল পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করি যেন তারা উপাসনার স্থানে যতটা সম্ভব আসেন। সময়টা খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যাবেলা হতে পারে, যেন আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাথে ভাল সময় তারা কাটাতে পারেন। আমি এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যারা তাঁর কাছে সত্যিই আন্তরিকতার সাথে চায়; তিনি তাদের পবিত্র আত্মা দান করেন। যদি আমরা খাঁটি ও আন্তরিক হৃদয় নিয়ে অবিরত আমাদের প্রভুর কাছে আসি, তাহলে তিনি শুধু যে আমাদের আত্মাকে শক্তিশালী করবেন তা নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক উৎসাহের অলৌকিক ক্ষমতায় অন্যদের উদ্ধার করতে আমাদের যোগ্য করে তুলবেন।

ইব্রীয় ১০:২৩-২৫ পদ

বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের যে আশা আছে, এস, আমরা স্থির হয়ে তার কথা স্বীকার করতে থাকি, কারণ যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য। এস, আমরা একে অন্যের সম্বন্ধে চিন্তা করি যেন আমরা ভালবাসতে ও ভাল কাজ করতে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে পারি। কোন কোন লোকের যেমন অভ্যাস আছে তাদের মত আমরা যেন সভায় একসংগে মিলিত হওয়া বাদ না দিই, বরং খ্রীষ্টের আসবার দিন যতই কাছে আসবে ততই যেন আমরা একে অন্যকে আরও উৎসাহ দিতে থাকি।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎসাহ অলৌকিক কিছু সৃষ্টি করে

উৎসাহ অলৌকিক কিছু সৃষ্টি করে

প্রায় বিশ বছর অথবা তারও কিছু বেশী সময় ধরে মিশন কাজের উদ্দেশ্যে আমাকে বেশ ঘন ঘন ভ্রমণ করতে হচ্ছে। কোন কোন সময় যখন মাসখানেক আমাকে বাড়ীর বাইরে থাকতে হয়েছে, তখন আমি খুবই একা একা বোধ করেছি; বিশেষতঃ যখন আমি আমার প্রিয়জনদের কথা চিন্তা করেছি। তবুও যাহোক, আমার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আমার সন্তানেরা আমার পরিচর্যা কাজে পরিপূর্ণ সমর্থন দিতে কখনও ভুলে যায় নাই। আমি যখন বিমানে উঠি আর আমার বাইবেল খুলি, তখন আমি প্রায় সব সময় বাইবেলে রাখা একটি চিঠির খাম পাই যেটা আমার স্ত্রী এবং সন্তানেরা লিখেছে। এভাবে, আমার পরিবার থেকে দূরে থাকাতে আমি কখনও মনে করি না যে আমি খুব ভাল বাবাদের একজন; তবুও এই চিঠিগুলোতে কখনই আমার কাজের প্রতি তাদের প্রশংসার কোন অভাব দেখি নাই। এই অবাক করা চিঠিগুলো আমাকে গভীর সান্ত্বনা ও শক্তি যোগায় এবং আমি তাদের ফোন করে বলতে বাধ্য হই, 'তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য আমি দুঃখীত কিন্তু তোমাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।'

অল্প কিছুদিন আগে, আমি একটি বই পড়েছিলাম। বইটির নাম 'দি পাওয়ার অব এ পজিটিভ মাদার', লিখেছিলেন ক্যারল ল্যাড নামে একজন আমেরিকান মহিলা পুরোহিত। এতে পারিবারিক বিষয় নিয়েই লেখিকার ছিল বেশী উৎসাহ, যেমন খ্রীষ্টিয় প্রেক্ষাপটে সন্তানদের সাথে বাবা-মায়ের সম্পর্ক। তার এই বইটিতে, তিনি পিতা-মাতার জন্য সাতটি সুপারিশ ব্যাখ্যা করেছেন– কিভাবে একটি শিশুকে মহান ব্যক্তি হিসাবে বড় করে তোলা যায়। এই লেখিকার লেখনিতে একটি সহ শিরোনাম হচ্ছে- "দি পাওয়ার অব এনকারেজমেন্ট", যেখানে তিনি একটি শিশুর জন্য তার পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পাওয়াকে প্রথম ও প্রধান বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। লেখিকা ল্যাড আরও পরামর্শ দিয়েছেন যেন পিতা-মাতারা অবশ্যই তাদের স্ব স্ব সন্তানদের উৎসাহ দিতে ও তাদের জন্য সময় দিতে সব সময় প্রস্তুত থাকেন।

অন্যভাবে বলা যায় যে, পিতা-মাতারা যখন তাদের সন্তানদের উৎসাহ দেবেন, তখন তারা সর্বদা চিন্তা করবেন কোন পদ্ধতিতে তাদের উৎসাহ দেওয়া যায় এবং কোন কথাগুলো বললে তা তাদের প্রিয় সন্তানদের উপরে সবচেয়ে ভাল প্রভাব পড়তে পারে। এমনটি হতে পারে, যদি একটি উৎসাহমূলক ছোট চিঠি সন্তানের বালিশের নিচে অথবা তার টিফিনের কৌটায় অথবা তার পড়ার বইয়ে বা বাইবেলের মধ্যে রেখে দেওয়া যায়। এখানে আমাদের কিছুটা সৃজনশীল হতে হবে। আশা ও সমর্থন জানিয়ে শিশুর জুতোর মধ্যেও একটি চিরকুট রাখলে কেমন হবে? সংক্ষিপ্তভাবে, লেখিকা সব পিতা-মাতাকেই তাদের সন্তানদের উদ্যমী করার জন্য সৌজন্যমূলক আচরণ দেখাতে বলেছেন যেন তারা উৎসাহিত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে মানসিক সমর্থন লাভ করে।

লেখিকা ল্যাড জিম সান্ডবার্গ নামে একজন বেসবল খেলোয়াড়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। সান্ডবার্গ তার ছেলেবেলায় বাবার সাথে বাড়ীর পিছনের মাঠে প্রায়ই বেসবল খেলতেন। দু'জনে যখন বল লোফালুফি করতেন, তখন তার বাবা তাকে কখনও একটি কথা বলতে ভুলতেন না। তিনি বলতেন, 'শোন, তুমি নিশ্চয়ই একজন সবচেয়ে বড় লিগের বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় হতে যাচ্ছ।' কয়েক বছর পরের ইতিহাস- একমাত্র তার বাবার উৎসাহে এই ছেলেটি একজন বিশ্ব সেরা খেলোয়াড় হয়েছিল।

জন স্টট নামে একজন খ্যাতিমান এ্যাংলিকান ঈশতত্ত্ববিদ, যিনি তার লেখার জন্য সুসমাচারীয় ভাবধারার পন্ডিতদের কাছে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। স্টট জীবনে বিয়ে করেন নি। তিনি এমন অনেক প্রচার করেছেন ও এমন অনেক বই লিখেছেন যা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে ভীষণ প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। তার সাক্ষ্যে স্টট বর্ণনা করেছেন, কিভাবে একজন লোকের সহৃদয় প্রচেষ্টার ফলে তার মন পরিবর্তন এবং আত্মিক বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। স্টট বলেছেন, শুরুতে তিনি মোটেও আদর্শ খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না। কিন্তু তিনি একজন পালককে জানতেন, যিনি তাকে সমর্থন দিয়ে সব সময় চিঠি লিখেছেন এবং একটানা সাতটি বছর তার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এইরকম দীর্ঘ সময় ব্যাপী লাগাতার উৎসাহ শেষ পর্যন্ত স্টটের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তিনি

তখন যীশুকে ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই ভাবেই ঈশ্বর একজন শক্তিশালী বিশ্বাসী সেবক উৎপন্ন করেছিলেন।

আরও একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি উৎকৃষ্টতার শীর্ষে থাকার পরেও একজন লোকের উৎসাহ পেয়ে তার প্রতি ধন্যবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন সুইস মনস্তাত্ত্বিক রবার্ট পটার্নওয়ে, যিনি অনেক বইও লিখেছেন। একদিন পটার্নওয়ে তার এক উৎসাহী সমর্থকের কাছ থেকে একটা চিঠি পান, যেখানে লেখা: 'আমি আপনাকে সামনা-সামনি কখনও দেখি নাই, কিন্তু যে বই আপনি লিখেছেন তা আমাকে খুবই সাহস যুগিয়েছে। যদি এই পৃথিবীতে আমাদের দেখা না-ও হয়, তবু আমি স্বর্গে গিয়ে প্রথমে আপনাকে খুঁজব।' এখানে উল্লেখযোগ্য, এই সুইস মনস্তাত্ত্বিক রবার্ট এই ছোট্ট, পরিপূর্ণ ও প্রশংসাসূচক সৌজন্যে ভরা চিঠিতে গভীরভাবে আন্দোলিত এবং উৎসাহিত হয়েছিলেন। একটি অতি সাধারণ চিঠিতে যদি কেউ আপনাকে এমন স্বীকৃতি দেয় তবে তা নিশ্চয়ই আপনাকে নতুন প্রেরণা ও শক্তি দিতে পারে এবং নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পারে।

উৎসাহ, ক্ষমতার যোগানদাতা

তবু যাহোক, আমরা তো দেখতে পেয়েছি, অন্যদের উৎসাহ দিতে এবং প্রশংসা করতে হলে আমাদের নিজেদেরই তেমন যোগ্যতা থাকা উচিত। খুব সহজভাবে বলা যায় যে, অন্যদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে যদি পর্যাপ্ত স্থান না থাকে, তাহলে তাদের মেনে নেওয়া এবং উৎসাহ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্যদের উৎসাহ দেবার ব্যাপারে এটিই সবচেয়ে প্রধান বাধা।

আপনার মধ্যে যদি বিদ্বেষ, বিরক্তি এবং তিক্ততা থাকে, তাহলে আপনি কি আপনার প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে তাকে সত্যিকার সান্ত্বনা দিতে পারেন? আপনি যখন উত্তেজিত, ঈর্ষাপরায়ণ ও পরশ্রীকাতর এবং নিজের ঘাড়েই ভারী চাপ অনুভব করেন, তখন আপনি কি আপনার প্রতিবেশীকে উৎসাহমূলক কথা বলতে পারেন? আপনার জীবনের উদ্বেগভাব, অনিশ্চয়তা ও ভয় কাটিয়ে উঠে আপনার ভাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন? আমাদের হৃদয়ের এরূপ অবস্থা প্রভু আঙ্গুল তুলে এখন আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন।

মনের এই রকম চাপাচাপি অবস্থা থেকে মুক্ত হতে এই পৃথিবীর অনেক লোকই সাময়িকভাবে বিভিন্ন জাগতিক পন্থার উপরে নির্ভর করে। কেউ ব্যায়াম করে, গান শোনে, ছবি দেখে, ভ্রমণ করে, বই পড়ে, ধর্মীয় কাজ কর্ম করে এবং বিভিন্ন সখ অভ্যাস করে থাকে। তবে এইসব প্রতিকারগুলো যেভাবেই হোক, স্থায়ী হয় না এবং এগুলো আবার সমস্যাগুলোর পরিপূর্ণ সমাধানও দিতে পারে না।

ঈশ্বরের লোক হিসাবে অবশ্যই ঈশ্বরের মাধ্যমে এইসব সমস্যার সমাধান আমাদের করতে হবে। প্রথমে, আমাদের হৃদয়কে অবশ্যই ঈশ্বরের সিংহাসনের সাথে যুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের ভেতরকার এইসব নোংরা আবর্জনা শুধুমাত্র ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে আসা পবিত্র অভিষেকের দ্বারাই পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু যদি নম্রতায় যীশুর কাছে আমরা আমাদের সব দুর্বলতাগুলো স্বীকার না করে আমাদের নিজেদের চেষ্টায় এইসব সমাধানের চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এই অবস্থা আরও জটিল করে তুলি। কারণ এতে শুধু লক্ষণগুলো সমাধান করা গেলেও আমাদের সমস্যার মূল কারণের প্রতিকার কিন্তু হয় না। মৌলিক সমস্যা একই রকম থেকে যায়।

দিনের পর দিন ঈশ্বরের সাথে আমাদের গভীর ব্যক্তিগত সহভাগিতা গড়ে তোলা উচিত এবং বিশ্বাস থাকা উচিত যে, ঈশ্বর সত্যিই আমাদের হৃদয়ের এইসব সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারেন। তাঁর উপরে নির্ভর করলেই আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় সমস্যা এবং জাগতিক বিষয় সমূহ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। তখন স্বর্গের অনুগ্রহ এবং শান্তিও আমাদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে। অতঃপর, আমাদের হৃদয় থেকে অন্যদের জন্য প্রশংসা বের হবে এবং আমরা অন্যদের শক্তি ও সাহস দিতে পারব। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের চার্চে, অল্পদিন হলো নতুন জন্ম পেয়েছে এমন একজন বিশ্বাসী প্রায় প্রতিদিনই ভোরের প্রার্থনায় আসে। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন: 'পালকবাবু, যদিও আমার জীবনে নানা সমস্যা, নানা

বিভ্রান্তি আসে, তবু যতবার আমি ভোরের প্রার্থনায় যোগ দেই ততবারই সারাদিন চলবার মত প্রচুর শক্তি লাভ করি।' এক অদৃশ্য শক্তি তাকে শক্তিশালী করে তোলে। এই ব্যক্তি তার জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পুরো শক্তি এভাবে অর্জন করেন, কারণ তিনি তার সকল কাজ শুরু করার আগে প্রতিদিন ভোরে সর্বশক্তিমানের সাথে কথা বলেন। ভোর বেলা প্রভুর কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ না করে একটি দিন কাটানো আমাদের জন্য অসম্ভব। সেজন্য ভোর বেলার প্রার্থনা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইব্রীয় ১০:২৪ পদে এই কথা লেখা আছে, "এস, আমরা একে অন্যের সম্বন্ধে চিন্তা করি যেন আমরা ভালবাসতে এবং ভাল কাজ করতে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে পারি।" এখানে 'উৎসাহ দেওয়া' বলতে এটাই বুঝায়, তা'হল- যেন ভালবাসা দিয়ে এবং ভাল কাজ করে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করি।

নতুন নিয়মের মূল গ্রীক ভাষা 'পারোকজুমস' মানে 'উৎসাহ দেওয়া', যার ভাবার্থ হচ্ছে- 'একজনের জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনা প্রকাশ করতে উৎসাহ দেওয়া।' আমাদের সকলেরই মনের গভীরে এক রকম শক্তি লুকানো আছে, যেন আমরা ভাল কাজ করে এবং অন্তরের সুপ্ত 'আগাপে' ভালবাসার প্রকাশ দেখাতে পারি। কিন্তু প্রথমে এই শক্তি আমাদের জাগতিক চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগের চাপে লুকানো থাকে এবং প্রকাশিত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

এই কারণে পবিত্র আত্মা প্রথম শতাব্দীর ইব্রীয় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে কথা বলেছেন, যেন তারা তাদের চারিদিকের কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও অন্তরে থাকা সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে ও সক্রিয় করে তোলে। ঈশ্বর তো জানতেন যে, আগাপে ভালবাসা দেখানোর যোগ্যতা তাদের রয়েছে। তাই তিনি তাদের উৎসাহিত করতে চেয়েছেন এবং জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এরকম প্রেরণা দেওয়ার কাজকে আমরা 'উৎসাহমূলক কাজ' অথবা 'প্রশংসনীয় কাজ' বলে বর্ণনা করতে পারি।

একজন সদ্য কৈশোর প্রাপ্ত ছেলে বা মেয়ের কথা এখানে উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। এই সময়ে তারা সাধারণতঃ ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে। তারা এও বুঝতে পারে, তাদের পিতা-মাতা তাদের কাছ থেকে কি আশা করে থাকে। এটি তাদের সকলেরই জানা, তাদের পিতা-মাতা 'আদর্শ' সন্তান হিসাবেই তাদের দেখতে চান। তবুও এই পৃথিবীর নানাবিধ চাপ, যেমন- পড়াশোনার চাপ, সঙ্গীদের চাপ এবং বয়ঃসন্ধিকালীন প্রলোভন তাদের এই বয়সের চমৎকার এবং সৃজনশীল গুণাবলী প্রকাশিত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। পিতা-মাতা হিসাবে আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের উৎসাহের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, তাদের প্রশংসা করতে পারি এবং তাদের গুণাবলীর উন্নতি বিধানে সাহায্য করতে পারি। বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম। দম্পতিদের উচিত সব সময় একে অন্যকে উৎসাহিত করা।

সাধারণতঃ দুই ভাবে উৎসাহ দেওয়া যায়: এক হলো কথায়, দুই হলো কাজে। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে পদটি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মোটামুটি চার ধরনের বাক্যের মাধ্যমে উৎসাহের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসাহ হচ্ছে অন্যদের প্রশংসা করা। এমন কি ঈশ্বরও যখন আমাদের সাথে কথা বলেন, তখন তিনি আমাদের ভুল, অযোগ্যতা ও দুর্বলতাসমূহ দেখিয়ে দেবার আগে আমাদের প্রশংসা করেন। প্রকাশিত বাক্য ২ ও ৩ অধ্যায়ে তিনি এই ভাবে এশিয়ার সাতটি মন্ডলীর সাথে কথা বলেছেন। তিনি তাদের ভুল দেখিয়ে দেবার আগে তাদের প্রশংসা করেছেন। এরকমভাবে কথা বলেই ঈশ্বর তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা, আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতে ইচ্ছুক। তাছাড়া, তিনি আমাদের সাথে সান্ত্বনা ও উৎসাহের কথা বলতে চান। আমরা যদি সত্যিই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে থাকি এবং আমাদের বিশ্বাস যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য সান্ত্বনার বাক্য আমাদের মুখ থেকেও একইভাবে বের হয়ে আসা উচিত।

প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহদান

মনে রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– আদি মণ্ডলীর কাছে পৌলের লেখা তেরোটি চিঠির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি মন্ডলীগুলোর বিভিন্ন সমস্যাবলী দেখিয়ে দিতে এবং সংশোধন করে দিতে পারেন। পবিত্র আত্মা পৌলের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন বলেই সমালোচনার মধ্যেও তিনি প্রশংসা করতে ব্যর্থ হন নাই। পৌলের সব ক'টি চিঠির শুরুতেই মণ্ডলীর মহৎ গুণগুলোর জন্য সম্মান জানিয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি মণ্ডলীর কাছে তার নির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন ও সংশোধনের জন্য বিনীত আহ্বানও জানিয়েছেন। যাই হোক, এখনকার নিরপেক্ষ জাগতিক লেখাগুলোর মধ্যেও এইরকম পান্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বালোচনার কাঠামো রয়েছে। এমন কি খবরের কাগজগুলোর পাতায় কোন একটি বিষয়ের সমালোচনা করার আগে উক্ত বিষয়ের ইতিবাচক দিকটি প্রথমেই লেখা হয়। কারণ আমরা জানি, প্রশংসার কথা শ্রোতাদের মনে কর্মশক্তি ও আনন্দ এনে দেয়।

যখন আমরা সৎ এবং পরিশ্রমী পুরুষ ও মহিলা দেখি, তখন আমরা তাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য থেকে খাঁটি জীবন-যাপন করতেই দেখি। আর তখন আমরা তাদের প্রশংসা না করে পারি না। যখন আমরা এই উপযুক্ত লোকদের প্রশংসা করি তখন লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তাদের কর্মশক্তিও বেড়ে গেছে। এই আনন্দ ও কর্মশক্তি কখনও বা চোখের জলে প্রকাশিত হয়ে উঠে। এভাবে চোখের জলে কখনও বা কারও হৃদয়ের বিষ থেকেও তাকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে থাকে। যে চোখের জল ফেলতে পারে, সে সত্যিই একজন চমৎকার মানুষ।

যেহেতু উৎসাহ আমাদের সকলের জন্য নানা উপকার বয়ে আনে, সেজন্য সুযোগ পেলেই আমাদের উচিত প্রশংসা করা। এভাবেই আমি সব সময় লোকদের মধ্যে ভাল গুণ খুঁজি যেন তাদের প্রশংসাও করতে পারি। যদি উৎসাহ দেওয়া আপনার জীবনের একটি অংশ হয়, তাহলে আপনার জীবনও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে, কারণ আপনার আনন্দ ও কর্মশক্তি আপনার মাঝেই উৎপন্ন হয়েছে।

বিশেষ করে, আমার স্ত্রী এবং আমি উভয়েই আমাদের তিনটি সন্তান মানুষ করে তোলার মধ্য দিয়ে এই চমৎকার উৎসাহ দেবার রহস্য উপলব্ধি করতে পেরেছি। একজন পিতা হিসাবে আমি সব সময়ই আমার সন্তানদের প্রশংসা করতে চেষ্টা করেছি। যেমন- তাদের স্কুলের পরীক্ষার ফল ভাল না হলেও আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বকাঝকা করি নাই। যদিও তারা অনায়াসে "এ" গ্রেড পেতে পারত, তবুও তাদের রিপোর্ট কার্ডে "বি" গ্রেড দেখেও আমি তাদের বকাঝকা করি নাই বরং আমি শান্তভাবে আমার মেয়েদের বলেছি, 'চিন্তা করো না! তুমি "বি" গ্রেড পেয়েছো, কারণ পরীক্ষার সময় তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত ছিলে বা অসুস্থ হয়েছিলে। এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিয়ো না, কারণ পরবর্তিতে তুমি নিশ্চয়ই "এ" গ্রেড পেয়ে যাবে। তাছাড়া, এটা তো সত্যি যে, কেউ না কেউ অবশ্য "বি" গ্রেড পাবে, আর কেউ না কেউ "এ" বা "বি প্লাস" পাবে!'

আমার সন্তানেরা আমার কাছ থেকে কড়া কথা শোনার অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তা না শুনে তাদের মুখ সত্যি দেখবার মত হয়েছিল।

কারণ এভাবেই আমি আমার ছেলে-মেয়েদের বড় করেছি। আর তাই তারা তাদের রিপোর্ট কার্ড আমাকে দেখাতে কখনও অনীহা প্রকাশ করে নাই। তারা এটা জানতো, গ্রেড যাই হোক না কেন, প্রশংসা তারা পাবেই। তাই তাদের গ্রেড যা-ই হতো, খুশী মনে তারা তাদের রিপোর্ট কার্ড আমাকে দেখাত। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের "বি" পাওয়াতে আমি মোটেই খুশী ছিলাম না, কিন্তু তবুও আমি তাদের প্রশংসা করতাম, কারণ এর উল্টোটা করা আমার পছন্দনীয় নয়। বেশী বকাঝকা করলে তাদের মধ্যে নিরাশা ও হতাশা আসবে মাত্র।

আজকাল, প্রায় প্রতিদিন সকালে আমি আমার প্রিয়জনদের কাছে ই-মেইল করি, বলি: 'তোমরা কেমন আছ? আমি খুবই দুঃখিত, বাবা হিসাবে বাড়ী থেকে প্রায়শই আমাকে দূরে থাকতে হয়। তবুও আমি কৃতজ্ঞ, তোমরা বেশ ভালভাবে বড় হয়ে উঠছো।' সাধারণতঃ খুবই চমৎকার উত্তর আমি আমার ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে পাই। আর এতে করে আমাদের আদান-প্রদান ও সমর্থন ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠে। আমার স্ত্রীর কাছে আমি বার বার কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসাপূর্ণ বার্তা পাঠাই। আর তিনিও কখনও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে

ভুলে যান না যে, তিনি আমার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি নিয়মিত আমাকে ফোন করেন, আর জানতে চান আমার কোন প্রার্থনার বিষয় আছে কি না, তাহলে যেন তিনি ঐসব বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন।

বিশেষ করে, পালক হিসাবে সব সময় আমার ছেলে-মেয়েদের সামনে প্রতিবেশীদের ব্যাপারে সঠিক আদর্শ আমাকে দেখাতে হয়। আমাকে সব সময়ই আমার ভাই-বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রদর্শন করতে হয়। আসলে সকল খ্রীষ্টিয়ানের প্রতি আমাদের অবশ্যই এমন আদর্শ প্রদর্শন করা উচিত।

খুব একটা সহজ কথা: 'আপনাকে তো আজ বেশ ভাল দেখাচ্ছে', একথা শুনলে যে কোন লোকের মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠবে। তাহলে আপনিও নিশ্চয়ই এমন কথা অন্যকে বলতে পারেন, তাই না? এটি আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার মনে আছে, বেশ কয়েক মাস আগে একজন মহিলা আমার কাছে এসে কিছু বিষয় আলোচনা করেছিলেন, যা মোটেই ভাল বিষয় ছিল না। তিনি বলেছিলেন, 'পালক বাবু, আজকাল মনে হয় আপনাকে কেমন বুড়ো বুড়ো দেখায়।' মন্তব্যটি শোনা মাত্রই আমার মনে হলো, আমি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছি।

আমরা এও দেখতে পাই যে, সুস্পষ্ট সরলতা সব সময় ভাল বিষয় হয় না। আপনি যদি খুবই অসুস্থ কোন লোকের সাথে কথা বলেন, তবে তাকে বলা মোটেই ঠিক নয়, 'আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।' যদি কথাটি সরলভাবেও বলা হয়, তবু তা উৎসাহিত করা বা প্রশংসা করার ঠিক উল্টো দিক। এরকম কথা যে শোনে, কোনভাবে তা তার কোন উপকারে আসে না। সেজন্য অন্যদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

মাঝে মাঝে একটা বিষয় আমাকে বেশ কষ্ট দেয়, যখন পালক হিসাবে আমার সম্পর্কে নানা বিদ্বেষপূর্ণ গালগল্প আমার চার্চের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। কোন কোন সময় এইসব অদ্ভুত আলোচনা আমার কানে আসে। এসব শুনে আমি বেশ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ি। আমি এমন নিরুৎসাহিত হই যে, পরের রবিবার চার্চে প্রচার করতে দ্বিধাগ্রস্থ হই। যদি কেউ কাউকে সম্মান না করে, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, তাহলে কেউই তাদের সামনে প্রচার করতে উৎসাহিত বোধ করবে না। শুধুমাত্র পালকের বা চার্চের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু বিদ্বেষপূর্ণ গালগল্প সব জায়গায় ধ্বংসের সৃষ্টি করে। এইসব খারাপ আলোচনার ঠিক বিপরীত বিষয়টি হলো উৎসাহ এবং সৌজন্য বোধ, যার প্রভাব সকলের জন্য সাহস এবং সুখ বয়ে আনে।

আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, জীব-জানোয়ারের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। যদি আপনি কোন সময় সার্কাস দেখে থাকেন, তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পশু প্রশিক্ষকেরা তাদের পশুগুলোকে প্রতিটি খেলা দেখানোর পরে আদর করে পুরস্কার দেয়। কারণ, বিশেষ করে সৌজন্য বোধ আর উৎসাহ এবং অতি শান্ত ভাবে একটু আদরের স্পর্শ পেলে পশুগুলো আরও মজার মজার খেলা দেখাতে ইচ্ছুক হয়। আমি এও জানি, যার বাড়ীতে কুকুর আছে, তারা খুব দ্রুত এ বিষয়টি বুঝতে পারবে। প্রতিটা খেলা দেখানোর পরে আপনি যদি আপনার কুকুরটাকে পুরস্কার দেন, তাহলে সে তো বার বার ওরকম করে খেলা দেখাতে থাকবে! সুতরাং, পশুরাও তাদের কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ এবং স্বীকৃতি পেতে চায়।

এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, মানুষও তাদের কাজের জন্য সহযোগিতা এবং উৎসাহ আশা করে থাকে। এ কথা আরও বেশী সত্যি, কারণ আমরা তো ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল আমাদের অনেক কথা বলেছে, যেমন- তিনি আমাদের কাছ থেকে প্রশংসা চান; তিনি চান আমরা তাঁর উপাসনা করি, সম্মান করি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হই। এসব অনেক আদেশ শাস্ত্রের বিভিন্ন পদে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে, যেন আমরা তাঁর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক ধরে রাখতে পারি। কেন? কারণ এটাই ঈশ্বরের স্বভাব! তিনি তাঁর সৃষ্টির কাছ থেকে প্রশংসা ও আরাধনা পেতে চান। আর তাই, এটাই তো স্বাভাবিক যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট আমরা মানুষেরাও প্রশংসা, উৎসাহ এবং স্বীকৃতি আশা করি।

প্রায় সব সময়ই আমি আমার ছেলে-মেয়েদের বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। তাদের অন্যান্য জাগতিক বন্ধু-বান্ধবদের মত তারা মদ, সিগারেট ইত্যাদিতে আগ্রহী নয়। এছাড়াও, প্রতি সপ্তাহে চার্চে যাবার জন্য আমি তাদের বেশী করে প্রশংসা করে থাকি। তারা আমার এই সৌজন্যমূলক আচরণে ভীষণ খুশী হয়। যদি দেখি, আমার সন্তানেরা খাবারের এটো থালা-বাটি ধুয়ে দিচ্ছে; তারা যদি বছরে একবারও তা করে, তবু আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে ভুলি না।

প্রিয় পিতা-মাতা, আসুন না আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের সব সময় প্রশংসা করি, সব সময়ই সত্যি কথা বলি। কারণ এটাই তো স্বাভাবিক। যখন তারা প্রতি রবিবার আমাদের সাথে চার্চে যায়, এতে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত এবং তাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত। যেসব তরুণ-তরুণীরা সান্ডে স্কুলে, গানের দলে অথবা ছবি দেখানোর মাধ্যমে প্রচার দলে অংশ নিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর সেবা করে, তারা তো আমাদের প্রশংসা পাবার যোগ্য। যখন রবিবার উপাসনার সময় নাতি-নাতনীরা তাদের দাদু-দিদার সাথে যোগ দেয়, তখন কি ভালই না লাগে!

আমি এর আগে বলেছিলাম, অন্যদের প্রশংসা করতে ও উৎসাহ দিতে সুযোগ খুঁজে নেওয়া আমাদের উচিত। আমাদের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। আপনি যখন আপনার ছেলে-মেয়েদের টিভি না দেখে বা কম্পিউটার গেমস না খেলে পড়াশোনা করতে দেখবেন, তখন তাদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে এবং প্রশংসা জানাতে ভুল করবেন না। পারিবারিক প্রার্থনা বা উপাসনার সময় এবং রাতে খাবারের সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ছেলে-মেয়েদের প্রশংসা করার জন্য একটা নিয়ম তৈরী করেছি। এরকম সময়ে প্রশংসাসূচক কথাগুলো আপনার ছেলে-মেয়েদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। অনেক সময় এটা ভেবে তারা খুশীতে কেঁদেও ফেলতে পারে, যখন তারা দেখে তাদের বাবা-মায়েরা তাদের জন্য কত না চিন্তা করছে।

যেহেতু আমাদের পুরানো সংস্কৃতি বেশ অনেক বছর আগেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের ছেলে-মেয়েদের নব্য সংস্কৃতি বুঝতে চেষ্টা করাই আমাদের উচিত। যেমন- কোরিয়ানদের পূর্বের বংশধরদের সংস্কৃতি কনফুসিয়ান ও বৌদ্ধ মতবাদের আলোকে ব্যাপক প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের ভাবধারায় কারও প্রশংসা করা এবং বাইরের কৃতজ্ঞতা দেখানোর মধ্যে যথেষ্ট কার্পণ্য প্রকাশ পেয়ে থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে, কনফুসিয়ান ও বৌদ্ধ মতবাদ শয়তানের প্রভাবে কাজ করছে, যা অন্য লোকদের ধন্যবাদ প্রকাশে বেশ বাধা সৃষ্টি করে। বাহ্যতঃ তারা মনে করে, এভাবেই তারা বেশী সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বোধ করে থাকে। কিছু কিছু বুড়ো লোকেরা ওকালতি করে বলে, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তবু তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বা প্রকাশ্যে তার স্ত্রীর সৌন্দর্য বা ভাল কাজের প্রশংসা করা উচিত হবে না; কারণ এতে একজন শিক্ষিত লোক হিসাবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

এর ঠিক উল্টোটি হচ্ছে আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের এবং বাইবেলের সংস্কৃতি, যেখানে আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের ঈশ্বর চান যেন আমরা অন্যদের কাছে খোলামেলা ভাবে নিজেদের প্রকাশ করি। সেজন্য, একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে বার বার ধন্যবাদ ও প্রশংসার কথা বলা নিঃসন্দেহে ভাল বিষয়। যেমন, আমার বিষয়ে বলি– আমি এত বার আমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, যা এখন আমাদের জীবনের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। একদিন অথবা দু'দিন তার সাথে কথা না বললে আমার মনে হয় কতদিন না জানি কথা বলি নাই।

সেজন্য, আমাদের অবশ্যই পুরানো কিছু বিষয় ও মন্দ সংস্কৃতি পরিত্যাগ করা উচিত এবং ঈশ্বর প্রদত্ত সংস্কৃতি গ্রহণ করা উচিত। আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি সক্রিয় প্রশংসা এবং সৌজন্য দেখিয়ে আমরা এই কাজটি শুরু করতে পারি। এটিকে আমরা প্রথম ধরনের উৎসাহ দেওয়া বলতে পারি।

সান্ত্বনার মাধ্যমে উৎসাহদান

দ্বিতীয় ধরনের সৌজন্যমূলক উৎসাহ সান্ত্বনা দেবার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রায়শই পবিত্র আত্মাকে "সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর" বলে উল্লেখ করি। ২ করিন্থীয় ১:৩ পদ থেকে একথাটি নেওয়া হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরকে "করুণাময় পিতা" এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর বলেই তুলে ধরা হয়েছে। কারণ আমরা মানুষ অতি সহজে ভয় ও একাকীত্বে মনোবল হারিয়ে ফেলি; তখন সান্ত্বনার মাধ্যমে আমাদের সুস্থ হবার দরকার হয়। কোন কোন সময় প্রশংসা জানানো হলেও তা যথেষ্ট হয় না। আমরা লোকদের সান্ত্বনা প্রদান করব এবং সেই সাথে প্রশংসাও করব। তাদের অবস্থা যতটা কঠিন হবে, সৌজন্যের সাথে ঠিক ততটা সান্ত্বনা যুক্ত করাও আমাদের উচিত হবে। সর্বদা লোকদের নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষীতেই আমাদের সান্ত্বনার বাক্য প্রয়োগ করতে হবে।

কেউ যখন কৃপণতার সাথে তার সৌজন্য এবং সান্ত্বনা প্রকাশ করে; তার মানে, ইতোমধ্যেই তার আবেগ ও অনুভূতি শুকিয়ে গেছে। এরকম ব্যক্তির পক্ষে অন্য লোকদের সম্বন্ধে স্বচ্ছভাবে চিন্তা করার কোন অবকাশ নাই, কারণ তার আবেগ ও অনুভূতি শুকিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে। আত্মিক সম্পদ না থাকার কারণে এই ব্যক্তি যেমন অন্য কারও সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে না, তেমনি জরুরীভাবে তার নিজের আত্মিক শক্তির প্রয়োজনও বুঝতে পারে না। যার ফলে, তার জীবনে কোন ক্ষমতা বা উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয় না।

বেশ অনেক বছর ধরে উত্তর আমেরিকাতে থাকার ফলে আমি কোরিয়ান ও পশ্চিমাদের মধ্যেকার একটি মূল পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। যেহেতু আমি প্রায়ই কোরিয়া এবং উত্তর আমেরিকা যাতায়াত করে থাকি, তাই আমি লক্ষ্য করেছি, পশ্চিমাদের তুলনায় কোরিয়ানরা খুব কমই সৌজন্য প্রকাশ করে থাকে।

এছাড়াও, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, উপাসনার সময় পশ্চিমারা প্রায়ই বেশ হর্ষোৎফুল্ল থাকে। তবে সে তুলনায় কোরিয়ানরা বেশ গুরুগম্ভীর। ঈশ্বরের সামনে আসলে নিশ্চয়ই কিছুটা গুরুগম্ভীর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তবু, ঈশ্বরের উপাসনা করার সময় নিশ্চয়ই হর্ষোৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকা উচিত।

ঈশ্বর যেভাবে আদেশ করেছেন, ঠিক সেভাবে প্রতিটি উপাসনার শেষে অন্যদের সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দিতে আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকা উচিত। যেমন- 'রবার্টকে কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছে; আমি গিয়ে তাকে একটু হাসাতে চেষ্টা করি', অথবা, 'মেরীকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন; তার সাথে আজকে দেখা করতে হবে।' এক নজর দেখলে ঠিকই বলা যায়, কেউ বিমর্ষ আছে কিনা! যদি কাউকে সান্ত্বনা দেবার দরকার মনে করেন, তাহলে তার কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিন। ঈশ্বরের আদেশ মত কাজ করেই তো আমরা আমাদের প্রভুকে খুশী করতে পারি। যার ফলে, আমাদের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে আমরা নিজেরা আরও অনেক বেশী খুশী হতে পারি।

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রভাবে অনেক খ্রীষ্টিয়ান আজ স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক; তারা তাদের নিজেদের মাপকাঠিতে সবকিছুর বিচার করে থাকে। কোন কোন বিষয়ে সামান্য বিরক্তির কারণ ঘটলেই তারা ভ্রূকুটি করে এবং তাদের বিরাগ প্রকাশ করতে ও সমালোচনা করতে দ্বিধা করে না। এরকম লোকেরা যখন চার্চে জড়ো হয়, তখন চার্চ একটি জাগতিকতায় পূর্ণ, ব্যক্তি স্বার্থে পূর্ণ ও একরকম সমস্যাবহুল সংগঠনে পরিণত হতে বাকি থাকে না। এরকমটি হলে, ঈশ্বরের মণ্ডলীর নামে মিলিত না হওয়াই তাদের জন্য ভাল; অথচ সেখানে ঈশ্বরের ভালবাসা চর্চা করাই খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তাদের উচিত ছিল! তবে স্বার্থপরতায় পূর্ণ একদল লোকের সমাবেশে অবশ্যই হৃদয়হীন, শুকনো, নিষ্ঠুর ও বদমেজাজী লোকজন থাকাটাই স্বাভাবিক।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, পাবার চেয়ে দেবার মনোভাবই এক অর্থে খ্রীষ্টিয় ভালবাসা। আমরা যখন আমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসতে চেষ্টা করি এবং তাদের সুখী করি, তখন ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ আমাদের প্রদান করেন। এও প্রমাণ হয় যে, আমরাই প্রথমতঃ পরিপূর্ণ আনন্দের ভাগীদার হতে পেরেছি। এরকম আনন্দ এতই অপরিমেয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না!

প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে উৎসাহদান

তৃতীয় ধরনের খ্রীষ্টিয় উৎসাহদান হচ্ছে অন্যদের চ্যালেঞ্জ করা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা। আজকাল এটি অনেক খোলামেলা উৎসাহ দেবার প্রক্রিয়া বলা যায়। অনেক লোক আছে যারা সৌজন্য দেখানো বা সান্ত্বনা দেওয়া, কোনটারই সত্যিকার গুরুত্ব দেয় না। সে কারণে এই দুই পদ্ধতিতে তাদের পূর্ণভাবে উৎসাহ দেওয়াও যায় না। তখন এই লোকদের চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড় করানো প্রয়োজন হয়। চ্যালেঞ্জ করা মানে, এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে চ্যালেঞ্জ পাওয়া ব্যক্তির মধ্যে তার যোগ্যতা আছে প্রমাণ করার জন্য কার্যকর এক ধরনের ইচ্ছা জেগে ওঠে। এটি অন্য দিকে চিৎকার করে সতর্ক করার মতন বিষয় বা ঘুম ভাঙানোর জন্য ঘন্টা বাজানো বলা যায়। নতুন নিয়মে আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের উদাহরণ দেখতে পাই, যা প্রেরিত্ পৌলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীগুলোকে দিয়েছেন।

রোমীয়, ইফিষীয় ও করিন্থীয় মণ্ডলীগুলোকে সম্বোধন করে পৌল সেখানকার ভাই-বোনদের বেশ অনেক বারই চ্যালেঞ্জের বাক্য বলেছেন। যেমন- তিনি লিখেছেন, "তাহলে ভাইয়েরা, ঈশ্বরের এই সব দয়ার জন্যই আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি.....।" এখানে "অনুরোধ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কাউকে সতর্ক করতে এবং অনুপ্রাণীত করতে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। এটি তাদের জন্য বলা কোন উপদেশমূলক কথা নয়, কিন্তু কিছু কাজ করার জন্য বাধ্যতা বা দৃঢ়তা আনতে চেষ্টা করা।

এই অধ্যায়ের শুরুতে যে শাস্ত্রীয় অংশ দেওয়া হয়েছে, আমরা সেখানে দেখতে পাই যে, ২৪ পদটি আমাদের আদেশ করছে, "যেন আমরা ভালবাসতে এবং ভাল কাজ করতে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে পারি।" আবার ২৫ পদে বলা হয়েছে, "কোন কোন লোকের যেমন অভ্যাস আছে তাদের মত আমরা যেন সভায় এক সাথে মিলিত হওয়া বাদ না দিই, বরং খ্রীষ্টের আসবার দিন যতই কাছে আসবে ততই যেন আমরা একে অন্যকে আরও উৎসাহ দিতে থাকি।" গ্রীক ভাষায় "উৎসাহ" শব্দটি লেখা হয়েছে 'প্যারাকেলেয়', আর ২৫ পদে বলা শব্দটির অর্থ 'ডেকে পাঠানো (আহ্বান করা)' বা 'সনির্বন্ধ মিনতি করা'। এখানে পৌল বিশেষ করে তাদের জন্য চিন্তিত, যারা উপাসনার জন্য একত্রে মিলিত হতে অস্বীকার করে থাকে। তিনি বিশ্বাসীদের সনির্বন্ধ মিনতি জানিয়ে আহ্বান করেছেন যেন তারা একে অপরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তার এই আহ্বান আজকের দিনের জন্যও প্রযোজ্য। যারা উপাসনায় শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে গিয়ে থাকে, ঈশ্বর তাদের আরও বেশী করে তাঁর সামনে আসার জন্য পুনঃ বিবেচনা করতে মিনতি রাখেন। ঈশ্বর চান যেন তাঁর লোকেরা সব ধরনের উপাসনাদলে গভীর ভাবে জড়িত হয় এবং সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

যখন আমার সঙ্গী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে, তখন আমি তাদের নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেই। কিন্তু কোন কোন সময় আসে যখন প্রশংসা করলে বা সান্ত্বনা দিলে কোন কাজই হয় না, তখন তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের প্রয়োজন হয়। এরকম অবস্থার প্রেক্ষীতে, উৎসাহ দেবার সবচেয়ে কার্যকর একটা ধরন হচ্ছে 'কনুই দিয়ে গুঁতা মারা'। ঈশ্বর নিজেই কোন কোন সময় আমাকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন, 'আমার সন্তানদের তুমি কি ঠিকভাবে দেখাশোনা করছ? তুমি কি তাদের স্বাভাবিক আত্মিক বৃদ্ধি দিতে চেষ্টা করছ, না কম চেষ্টা করছ?' এখন, আমি এই কথাগুলো আপনাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে রাখছি কারণ তাঁর আদেশের বাধ্য না হয়ে আমি চলতে পারি না।

যাদের সান্ত্বনা প্রয়োজন, আসুন আমরা তাদের সান্ত্বনা দেই। যাদের খুব বেশী করে উদ্দীপিত করা দরকার, আসুন আমরা তাদের মিনতি জানাই এবং চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি করি। এই কাজটি প্রেরিত্ পৌল করেছিলেন। প্রাথমিক কাটাকাটি বা অপারেশন এলোমেলো হতে পারে, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়,

তাহলে তো ঈশ্বর এইরকম রোগীদের অপারেশন করতে তাঁর নিজের লোকদের অনুমতি দিয়ে থাকেন। বিশেষতঃ যারা কোন হালকা ওষুধ গ্রহণ করতে চায় না। যারা এমনিতে অলস, বাইবেল তাদের প্রতি এরকম চ্যালেঞ্জ রাখতে বলেছে এবং তাদের অনুপ্রাণীত করতে বলেছে। এরকম লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য জানে কিন্তু মানে না এবং বাক্য অনুসারে কাজ করে না; এমন কি ধাক্কা না খেলে নড়াচড়া করে না। তাদেরই সৃষ্ট আরামের স্থান থেকে এই লোকদের বের করে এনে সচেতন করা প্রয়োজন। যদি তারা শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছায় সঠিকভাবে চলতে শেখে এবং তাদের যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে, তাহলে তারা ক্রমশ পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মেনে চলতে সমর্থ হয়ে উঠবে।

সতর্কতার মাধ্যমে উৎসাহদান

খ্রীষ্টিয় উৎসাহদান প্রক্রিয়ার শেষ যে উপায়, তা হচ্ছে মুখোমুখি দাঁড় করানো এবং সাবধান করে দেওয়া, অর্থাৎ সতর্ক করা এবং মৃদুভাবে তিরস্কার করে উপদেশ দেওয়া। যারা প্রশংসা অথবা সান্ত্বনা পেয়েও এতটুকু নরম হয় না; যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে অস্বীকার করে, একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তাদের উৎসাহিত করার এটিই শেষ উপায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃদুভাবে তিরস্কার করে উপদেশ দেওয়াকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ দেওয়া বলে বিবেচনা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ১ থিষলনীকীয় ৫:১৪ পদে পৌল আমাদের মিনতি করেছেন, "যারা অলস তাদের সাবধান কোরো।"

তবুও যাহোক, অন্যদের মৃদু ভর্ৎসনা করে উপদেশ দিতে গেলে কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকিও থেকে যায়। অন্যদিকে, প্রশংসা করা সাধারণতঃ কোন ক্ষতিকর বিষয় নয়, কিন্তু মৃদু ভর্ৎসনা করে উপদেশ দিলে তা সহজেই অনুভূতিতে আঘাত করে থাকে। অনেক সময় সতর্কবাণী বন্ধুত্ব সম্পর্ক সৃষ্টি করে, তবে যে শোনে-যদি সে তা স্বীকার করে এবং মেনে নেয়। আবার অন্য দিকে, তারা আপনাকে তাদের শত্রু মনে করতে পারে এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের হৃদয় বিষে পূর্ণ হতে পারে। সে কারণে, যতটা সম্ভব সাবধান না করাই উত্তম, বরং তা শেষ প্রচেষ্টা হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত।

প্রিয় বন্ধুরা! আমরা যেভাবে সৃষ্ট হয়েছি তাতে উৎসাহ না পেলে আমরা সত্যিই ভালভাবে জীবন-যাপন করতে পারি না। আমাদের পরিবারে, মণ্ডলীর মধ্যে এবং সমাজে যদি উৎসাহের অভাব ঘটে, তাহলে আমাদের জীবন সহজেই খুবই নিঃসঙ্গ ও অসহ্য মনে হতে পারে। এটি তো সত্যিই বাস্তব যে, আজকের দিনে উৎসাহদাতা খুব কমই দেখা যায়। অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ লোক আবেগ জনিত কারণে বা আত্মিকভাবে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাদের সাহায্য করা দরকার। সেজন্য, যে কোন অবস্থায় হোক না কেন, আমাদের যথার্থই এগিয়ে আসা উচিত, যেন আমরা প্রভু যীশুর পদচিহ্ন অনুসরণ করি এবং অন্যদের উৎসাহ দিতে সচেষ্ট হই!

কোন কোন সময় কোরিয়ার রাস্তায় যানজট এতই ব্যস্ততায় ভরে ওঠে যে, গাড়ী চালানো খুবই ক্লান্তিকর হয়। সেজন্য, আমি বাসে চড়তেই বেশী পছন্দ করি। কিন্তু যখনই আমি পাবলিক বাসে যাতায়াত করি, তখনই বাস চালকের দুর্ভাগ্যজনক অভ্যাস লক্ষ্য করি। অবশ্য, আমার এই আবিষ্কার আমি অতি সাধারণ বলে মনে করি না। অধিকাংশ বাস চালক তাদের এই কাজটি খুবই প্রশংসনীয় বলে মনে করে না। এই পেশা তাদের কাছে না হয় রোমাঞ্চকর, না কোন গর্বের বিষয়। যেমন, একজন যাত্রী যখন তাদের কাছাকাছি আসে এবং কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তখন তারা সাধারণতঃ কর্কশ ভাবে উত্তর দেয়। এই অভ্যাস সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক, কারণ বাস চালকদের প্রতিদিনই অনেক যাত্রী বহন করতে হয়। তারা আমাদের সমাজের অনেক রকম আনন্দ এবং উৎসাহ উপভোগ করার সুযোগ হারায়। যদিও, আনন্দ উপভোগ করতে বেশী কিছু লাগে না, শুধুমাত্র কয়েকটি কথাই যথেষ্ট। যেমন, 'আপনার দিনটি ভাল কাটুক। দেখে শুনে পথ চলবেন' এটি বলাই তো যথেষ্ট। অথবা, যদি তারা চিৎকার করে বলে, 'সামনে স্টপেজ, ভূতের গলি, রেলগাড়ী ধরতে চাইলে এখানে নামতে হবে।'

যদি সব বাস চালকেরা এরকম হয়, তাহলে আপনি কল্পনা করুন, সমাজে তাদের কি বিরাট প্রভাব থাকতে পারে? লোকেরা আগ্রহ সহকারে বাসে উঠবে, কারণ এরকম চালকদের সাথে যাতায়াতে বেশ তৃপ্তি

পাওয়া যাবে। তবু যাহোক, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তা এর চেয়ে অনেক আলাদা রকম। বাস্তবে যেটা ঘটে থাকে, তা হচ্ছে- বাস চালক লাল বাতি ডিঙিয়ে বিপদজনক ভাবে গাড়ী চালায়, জোরে জোরে হর্ণ বাজায় আর অন্য বাস চালকদের সাথে খিস্তি করে। যতবার আমি এমনটি দেখি, আমি মনে মনে ঈশ্বরকে বলি, 'ও প্রভু, এইসব লোকেরা জনগণের সেবা করার কাজ করছে, কিন্তু তাদের হৃদয় কতই না বিকৃত। তাছাড়া, সমাজে এর খারাপ প্রভাবও দেখা যায়। আবার এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন খ্রীষ্টিয়ান বাস চালকও রয়ে গেছে!'

কৌতুহল-উদ্দীপক একটি সত্য বিষয় হচ্ছে, উত্তর আমেরিকার এ ধরনের একজন বাস চালকের মাসিক বেতন এবং কোরিয়ায় এরকম একজন চালকের বেতন প্রায় একই রকম। এটি প্রায় এক হাজার বা এক হাজার দু'শো ইউএস ডলার হবে। কিঞ্চিৎ কখনও তা বেড়ে এক হাজার পাঁচশো পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে। তা সত্ত্বেও, আমেরিকা অথবা কানাডার বাস চালকেরা গাড়ী চালানোর সময় যথেষ্ট আনন্দে থাকে। সাধারণতঃ তারা তাদের মত অন্যান্য চালকদের প্রতি যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করে এবং যাত্রীদের প্রতি বেশ নম্রতা প্রদর্শন করে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আরও লক্ষ্য করেছি, সেখানে যারা জনগণের জন্য সেবামূলক কাজে নিয়োজিত, তারা তাদের হাসি ও ইতিবাচক আচরণ দিয়ে সমাজে যথেষ্ট আনন্দ প্রদর্শন করে থাকে। এই লোকদের অবদান অবশ্যই ফেলে দেবার মত নয় এবং তারা সমাজকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে থাকে। কারণ, কথাটি এভাবে বলা হয়ে থাকে, 'হাসি-আনন্দ বেশ ছোঁয়াচে।'

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সকলেরই আচার-আচরণের পরিবর্তন দরকার। বেসরকারী বা সরকারী, আমাদের যে পেশাই হোক না কেন- বাস চালাই অথবা বাসের যাত্রী হই, তবু আমাদের চারিদিকে হাসি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করা উচিত। যদিও আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের খুশী করতে আগ্রহী হয় না, তবুও আমাদের কিন্তু তাদের খুশী করতে হবে। যেমন- আমি যখন ট্রেনে যাতায়াত করি, আমি সবসময় যাত্রীদের সাথে গল্প-সল্প করি। আলাপচারিতায় কোন নির্দিষ্ট উপকরণ থাকে না, কিন্তু আমরা তো সব সময়ই আবহাওয়া নিয়ে বা জনপ্রিয় খেলার খবর নিয়ে কথা বলতে পারি। ঐ লোকেরা হয়তোবা আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য অবাক হয়ে যাবে এবং শিষ্টাচার দেখিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে অথবা কাঠখোট্টা আচরণও করতে পারে। তবুও আমি আপনাকে এভাবে কথা বলতে অনুরোধ করি। যেমন- আমার জন্য কোন কোন সময় এরকম সুযোগ আসে, যখন আমার প্রতিবেশীরা আমার সাথে বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত করে। তখন আমি তাদের খুব কাছাকাছি পৌঁছাতে এবং তাদের জীবনে সামান্য হলেও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ দিতে চেষ্টা করি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কাউকে উৎসাহ দিতে সাংঘাতিকভাবে চেষ্টা করতে হয় না। যাদের ভালবাসতে হবে তাদের উৎসাহ দিতে শত শত দর্শকেরও প্রয়োজন হয় না। খুব ছোট করেই আমরা কাজটি শুরু করতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের দেওয়া উৎসাহ হতোদ্যম লোকদের শক্তি যোগাতে পারে। সামান্য চেষ্টায় অনেক সময় জীবন পরিবর্তিত হয়, জীবনে আশার বীজ রোপিত হয় এবং প্রাণ রক্ষা পায়। এরই ইতিবাচক পরিণতি ক্রমশ বেড়ে উঠে আজকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।

যীশু ঠিক এটিই আমাদের কাছ থেকে আশা করেন যেন আমাদের প্রতিবেশীদের আমরা উৎসাহ দেই। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের থেকে তো খুব দূরে নয়। তারা আমাদের পরিবারের, আমাদের পাড়ার এবং আমাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আছে। তারা আমাদের সাথে বাসে যাতায়াত করে। তারা আমাদের কাজের জায়গায়, এমন কি আমাদের মণ্ডলীতেও রয়েছে। আসুন না, আমরা ঈশ্বরের বাধ্য সন্তান হই, একে অন্যকে উৎসাহিত করি। আসুন না, আমরা একে অন্যকে শক্তিশালী করি এবং খ্রীষ্টের আদর্শে একে অন্যকে গেঁথে তুলি।

হিতোপদেশ ২৫:১১ পদ

সময়মত বলা কথা যেন কারুকাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল।

চতুর্থ অধ্যায়

সময়মত বলা কথা,
কারুকাজ করা রূপার
উপরে বসানো সোনার ফল

সময়মত বলা কথা, কারুকাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ইদানিং তাদের অন্য অংশ উত্তর কোরিয়ার সাথে আলোচনা করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এটা ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমি জানি, কোরিয়া হচ্ছে এই পৃথিবীর এমন একটি দেশ যাদের ভাষা এক কিন্তু তবুও উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া হিসাবে দু'টি দেশে বিভক্ত। কোরিয়া যুদ্ধের পর শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতবাদ এবং চিন্তার মৌলিক পার্থক্য মূলত এই বিভক্তির কারণ। কৌশলগত দিক দিয়ে দুই কোরিয়া পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন, মিলিটারি শক্তিও একে অন্যের বিপক্ষে। এ কারণে আমি সত্যি করেই কষ্ট পাই এবং হৃদয়ে বিহ্বলতা বোধ করি।

নিজেকে কোরিয়ার লোক বলে ভাবতে আমি গর্ববোধ করি, কিন্তু আমার দেশের এই বিভক্তির কারণে আমি বেশ লজ্জা পাই। এই ঘটনা এখন তো নিয়মিত সংবাদ শিরোনাম। ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে, দু'টি দেশ তাদের স্ব স্ব সুবিধা সম্পর্কিত আলোচনা করতে মিলিত হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের 'সানসাইন পলিসির' পক্ষে, কারণ শান্তির জন্য সোচ্চার এটি একটি সক্রিয় নীতি, উত্তর কোরিয়ানদের সাথে বিরোধীতা করতে নয়। যেখানে জাতিগত অথবা ব্যক্তিগত বিরোধীতা থাকে, সেখানে এরকম মৌলিক সংঘর্ষ দেখা যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে, আজকের উল্লেখিত শাস্ত্র পদটির দিকে আপনাদের লক্ষ্য করতে বলছি: "সময়মত বলা কথা যেন কারুকাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল।" একজন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা হচ্ছে নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষাপট বোঝা এবং বিবদমান দলের মধ্যকার টান টান উত্তেজনাকে প্রশমিত করা; ঠিক যেন স্পঞ্জের মত সবকিছু শুষে নেওয়া বলা যায়। এরকম উত্তেজনার মুহূর্তে সময়মত বলা কথা মানে অবস্থা মোতাবেক যথাযথ বাক্য প্রয়োগ, যা বিবদমান দু'টি দলের বরফ সদৃশ কঠিনতাকে ভেংগে ফেলতে পারে। সেজন্য, সময়মত বলা কথাকে "সোনার ফল" বলে পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বন্দ্বের মুহূর্তে তা হচ্ছে শান্তির কথা বলা, অথবা যেখানে ঘৃণা সেখানে ভালবাসা এবং ক্ষমাশীলতার কথা বলা; আর ভয়ের সময়ে সান্ত্বনার কথা বলা। সত্যি করে আমাদের তেমন লোকই দরকার যিনি কঠিন বরফ ভাঙার কাজ করতে পারেন এবং বাধার প্রাচীর উপড়ে ফেলতে পারেন।

এর আগের অধ্যায়ে আমরা খ্রীষ্টিয় উৎসাহদানের চারটি ধরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। খ্রীষ্টিয় উৎসাহদান বলতে প্রশংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, বন্ধুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সতর্কতামূলক সাবধানবাণী বোঝানো হয়েছে। কিভাবে এই বিভিন্ন ধরনের উৎসাহদান ভিন্ন ভিন্ন লোকদের জন্য মানানসই তা আমরা শিখেছি। এই অধ্যায়ে, আমি "সময়মত বলা কথা" সম্পর্কে বলব; বলব কিভাবে আরও নির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে আমাদের উৎসাহ দেওয়ার কাজটি যথেষ্ট উপযোগী করে তোলা যায়।

পবিত্র বাইবেল আমাদের বলেছে, "কারুকাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল" উৎপন্ন করতে হলে সর্বপ্রথম খুবই সতর্কভাবে অবস্থার পর্যালোচনা করতে হবে। তারপর, "সময়মত বলা" কথাটিই বলে ফেলতে হবে, যা সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে এবং লোকদের মধ্যেকার অচল অবস্থার নিরসন করতে পারে। যে কারণেই ঈশ্বর সহজভাবে "সময়মত বলা কথাকে" "সোনার ফলের" সাথে তুলনা করেছেন! এটি আমাদের দেখিয়ে দেয়, কোন বিবদমান দু'টি দলের মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করা কত না গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এখানে ফল বলতে গাছের ফল বুঝায় না, বুঝায় সোনার ফল। তারপর, সাধারণ কোন থালায় করে সোনার ফল উপস্থিত করা হচ্ছে তা নয়, কিন্তু 'চমৎকার করে সাজানো-গুছানো রূপার' থালায় যেন সেই সোনার ফল, অর্থাৎ "সময়মত বলা কথা"। যারা এভাবে শান্তির কথা বলে, সব কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য এবং তারাই হচ্ছে সোনার ফলের মালিক, যারা দামী, সম্মানজনক, অর্থবহ, চমৎকার, আনন্দপূর্ণ কথাবার্তা তাদের চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারে। আসলে তারা শান্তি ছড়িয়ে দেয়। এটি একটি উপমা, যার অর্থ হচ্ছে– শুধুমাত্র একটি বলা কথা একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন আনতে পারে।

এর আগের অধ্যায়ে আমরা যেমন দেখতে পেয়েছি, সমর্থন ও উৎসাহমূলক কথা প্রায়ই শ্রোতা ও বক্তা উভয়কেই তেজোময় করে তোলে। পবিত্র বাইবেলে একটি চমৎকার কথা বলা হয়েছে– "মিষ্টি কথা মৌচাকের মত; অন্তরের জন্য তা মধুর আর তা দেহকে সুস্থ রাখে" (হিতোপদেশ ১৬:২৪ পদ)। শাস্ত্র আমাদের একথা বলেছে, আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ উৎসাহদান, উষ্ণ সান্ত্বনার বাক্য এবং সরলভাবে বলা প্রশংসা বাক্য অন্তরের জন্য মধুর মত এবং দেহ সুস্থ রাখার ওষুধ। হিতোপদেশ ১৫:৩০ পদ আরও বলেছে, "আনন্দে ভরা চোখ অন্যকে আনন্দ দেয়, আর মঙ্গলের খবর হাড়-মাংসকে পুষ্ট করে।" সুসংবাদ, মিষ্টি কথা এবং সমর্থন করে বলা কথা, সবই আমাদের ভালোর জন্য, যাতে আমাদের আত্মিক অস্থি শক্তিশালী হতে পারে।

আমি একটি জাপানি প্রবাদ বাক্য জানি, যা হলো– 'এক ধরনের কথা সারা শীতকাল আপনাকে উষ্ণ করে রাখতে পারে।' এটা কতই না আকর্ষণীয়! জাপানিরা অধিকাংশই যীশুকে জানে না, তবু একজন আর একজনকে উৎসাহ দেবার লাভজনক প্রতিক্রিয়া ঠিকই বোঝে। এক ধরনের কথা ঠিকই শীতের তিনটি মাস আপনাকে উষ্ণ রাখতে পারে! এই প্রবাদ বাক্যটি এখানে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। উৎসাহদানের উপকারিতা সারা পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সংস্কৃতির উর্ধ্বে সহযোগিতামূলক কথাবার্তা, সান্ত্বনা দেওয়া এবং প্রশংসা করা সর্বদাই অন্তরকে উষ্ণ করে রাখে এবং অস্থিকে শক্তিশালী করে তোলে। আবার, কখনও কোন কোন লোক বলে, কোন রকম উৎসাহ ব্যতিরেকে একটি সপ্তাহ বেঁচে থাকা অসম্ভব! প্রত্যেক মানুষই উৎসাহ পাবার আশা করে, কারণ উৎসাহ পাওয়া আমাদের জীবনের একটি প্রধান চালিকা শক্তি।

যে কথা হাড় শুকনো করে

অন্যদিকে, অপ্রয়োজনীয় শব্দাবলী শুধু নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। ঠিক এরকম একটি অবস্থার কথা হিতোপদেশ ১২:৪ পদে বর্ণনা করা হয়েছে: "ভাল ও গুণবতী স্ত্রী স্বামীর মাথার মুকুটের মত, কিন্তু যে স্ত্রী লজ্জার কাজ করে সে তার স্বামীর পচা হাড়ের মত।" ঠিক যেভাবে বাইবেলে লেখা হয়েছে– একজন স্ত্রীলোক যদি ভাল ও গুণবতী হয়, তাহলে সেই স্ত্রীলোক তার স্বামীর গৌরবের কারণ হয়। মহৎ চরিত্রের একজন স্ত্রীলোক জানে কিভাবে তার স্বামীর পিছনে দাঁড়াতে হয়। সে তার স্বামীকে সহযোগিতা করবে এবং এমনকি স্বামীর দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাকে মান্য করবে। আর ঠিক এর উল্টোটি হচ্ছে: একজন মর্যাদাহানিকর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে লজ্জার এবং তার অস্থির ক্ষয়স্বরূপ হয়।

এ প্রসংগে একটু কথা বলি। আমি একটি খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে বড় হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমার বয়স যখন তিরিশের কাছাকাছি, আমি তখন পবিত্র আত্মা গ্রহণ করি যা স্বর্গ থেকে আগুনের মত নেমে এসেছিল। আমি যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে আমার উদ্ধারকর্তা বলে গ্রহণ করি। আমার মনে আছে, আমার মন পরিবর্তনের অল্পদিন পরে, আমি আত্মায় এতো বেশী পরিপূর্ণ ছিলাম যে, রাস্তা-ঘাটে, রেস্টুরেন্টে, দোকানে এবং আরও অনেক জায়গায় সুসমাচার প্রচার না করে থাকতে পারি নাই। আমার নিজের টাকায় আমি হাজার হাজার সুসমাচার পুস্তিকা ছাপিয়েছি এবং হাজার হাজার অডিও ক্যাসেট তৈরী করে বিতরণ করেছি।

একবার বেশ একটা মজাদার ঘটনা ঘটেছিল। আমার তিরিশ বছরের প্রথমার্ধেই লোকেরা আমাকে 'পাস্টর' বলে ডাকতে শুরু করেছিল, কিন্তু আসলে সেই সময় আমি ছিলাম একজন ডিকন মাত্র। শুধু একজন মাত্র সত্যি করে এই স্তুতিপূর্ণ খেতাব পছন্দ করতে পারে নাই; তিনি আমার স্ত্রী। শুধু যখনই কেউ আমার বাড়ীতে ফোন করেছে এবং কৌতুক করে "পাস্টর হোয়াংকে" চেয়েছে, তখন তিনি বিরক্ত হয়ে তাদের ফোন রেখে দিয়েছেন। এটি আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে। প্রথম দিকে, আমার স্ত্রী সত্যিই আমাদের কাছে খুব একজন সহানুভূতিশীল এবং আগ্রহী খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে পরিচিত ছিলেন না। তার মনে ভয় ছিল, হয়তোবা আমি সেমিনারিতে পড়ার জন্য প্রভাবিত হয়ে যেতে পারি।

কিন্তু সুস্পষ্টভাবে, তিনি নিজে যীশুর সাক্ষাৎ পাবার পরপরই যেন সব কিছুর নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তিনি প্রভু যীশুর কাছে পুরোপুরি সমর্পিত হয়েছিলেন। তিনি তার আত্মায় এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে, সত্যিই যীশু আমাদের উদ্ধারকর্তা এবং তিনি আমাদের যথেষ্ট ভালবাসেন।

আমরা আমাদের আগের আলোচনায় ফিরে যাই। কিভাবে একজন 'মর্যাদাহানিকর' স্ত্রী'র বর্ণনা করা যায়? তাছাড়া, 'পচা হাড়ের মত' বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা যখন কোন পার্টিতে অনেক লোক একত্র হই, তখন আমরা 'মর্যাদাহানিকর স্ত্রীদের' দেখতে পাই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, একজন মর্যাদাহানিকর স্ত্রী তার স্বামীকে শ্রদ্ধা না করে বরং তাচ্ছিল্য করে থাকে। যে স্ত্রী অন্যদের সামনে তার স্বামীকে যোগ্য মর্যাদা দেয় না, সেই স্ত্রী অতিরিক্ত উদাসীন এবং বিবেচনাহীন। স্বামীর সাথে ঠাট্টা করতে গিয়ে তিনি উল্টো তার স্বামীকে বিড়ম্বনায় ফেলেন। বাস্তবিকই তিনি তার স্বামীর হাড় 'ক্ষয়' করে ফেলেন, কারণ তিনি তো তার স্বামীকে অনুৎসাহিত করেন এবং স্বামীর জীবনীশক্তিকে চুষে খেয়ে ফেলেন। এখানে বাংলায় প্রচলিত একটা প্রবাদ, "হাড়জ্বালানি" শব্দটি খুবই যথার্থ এবং "পচা হাড়ের মত" কথাটা একই শব্দবোধক।

হিতোপদেশ ১৭:২২ পদ আমাদের বলেছে যে, "আনন্দিত অন্তর স্বাস্থ্য ভাল রাখে, কিন্তু ভাংগা মন স্বাস্থ্য নষ্ট করে।" এখানে স্বাস্থ্য নষ্ট করা বলতে আমরা অস্থির ক্ষয় বা পচন বলতে পারি। বাইবেল অনুসারে 'আত্মার' সাথে 'হাড়ের' ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের হাড় যদি স্বাস্থ্য সম্মত ও শক্ত সমর্থ হয়, তবে আমাদের আত্মাও শক্তিশালী হবে এবং আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে ভালবাসার উষ্ণতা দেখাতে সমর্থ হব।

হিতোপদেশ পুস্তকটিতে তিন ধরনের মৌখিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে 'ভাসাভাসা' বলা কথাবার্তা। ভাসাভাসা বক্তৃতা বলতে মূলতঃ এমন কথা বুঝায় যা সময়মত বা যথাযথ নয়। এর সাথে অসাধুতা, ঠকামি, তোষামোদ, অথবা মন ভুলানো ভাবগুলো জড়িত রয়েছে। এই ধরনের কথাবার্তা এমন সব শব্দাবলী নিয়ে গঠিত, যা জাগতিক কথোপকথনের উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তবু তা বাস্তবিকই আত্মকেন্দ্রিক।

দ্বিতীয় ধরনের বলা কথাবার্তা হচ্ছে 'ধ্বংসাত্মক' কথাবার্তা। আবার, এরকম কথাবার্তাকে 'হাড়জ্বালানি' বা 'অস্থির পচনস্বরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আপনার শরীরে ঠান্ডা জল ঢেলে দেয় এবং যারা শোনে তাদের নিরুৎসাহিত করে ও হতাশ করে। কোন কোন সময় এসব কথাবার্তা অসতর্ক কৌতুক থেকে আরম্ভ হয় এবং যা কি-না অনেক দূর বিস্তৃতি লাভ করে। এই ধরনের কথাবার্তা আমাদের মনের ভিতরে ও আমাদের চরিত্রেও আঘাত করে, ধ্বংস করে, নিরাশ করে এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উৎপন্ন করে। অভদ্র এবং হঠকারী কথাবার্তাও এ ধরনের। তবে বিবেচনা না করে বলা সাদাসিধা ও অকপট কথাবার্তাও কোন কোন সময় ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। যে কোনভাবেই, খ্রীষ্টিয়ানদের এ ধরনের কথাবার্তার ধ্বংসকারী দিক সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে ভুল করা কখনই উচিত নয়। যেমন- হিতোপদেশ ১৫:৪ পদে উল্লেখ করা হয়েছে: "যে কথা মানুষের জীবনে সুস্থতা আনে তা জীবন-গাছের মত, কিন্তু ছলনার কথা মানুষের মন ভেংগে দেয়।"

তৃতীয় এবং শেষ ধরনের কথাবার্তা উপরে আলোচিত দু'ধরনের চেয়ে নাটকীয়ভাবেই আলাদা। এক ধরনের কথাবার্তা আমাদের শোনা দরকার, যেগুলো মানুষের জীবনে সুস্থতা আনে এবং মানুষকে রক্ষা করে। আগের অধ্যায়ে আমরা এ ধরনের কথাবার্তা পড়েছি এবং সেগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে: উৎসাহ দান করা, প্রশংসা করা, সান্ত্বনা দান করা, ভালবাসা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা এবং সতর্ক করে দেওয়া।

বর্তমান কালে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা উৎসাহ দানের আশ্চর্য শক্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে। পন্ডিতেরা দাবী করে থাকেন যে, প্রশংসা পাবার মধ্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক ভালভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। একথা আসলে কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই প্রমাণিত হয়েছে। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শিক্ষকদের প্রশংসায় স্কুলের ছেলে-মেয়েরা লাগাতার নিজেদের প্রস্ফুটিত করতে পারছে। যেমন– 'ছেলেটি তো বেশ স্মার্ট!' অথবা, 'তার মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে!' দেখা গেছে, শিক্ষকদের এ ধরনের প্রশংসা বাক্যের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে বিশ ভাগ বেড়ে গেছে।

সেজন্য, এটাও বলা হয় যে, প্রশংসা কারও বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রভাবিত করে এবং উদ্যমী হতে সাহায্য করে। আমি বিশ্বাস করি যে, পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রশংসা করার এই সূত্র ধরেই গৃহীত হয়েছে। উত্তর আমেরিকার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সাধারণতঃ প্রশংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া, চ্যালেঞ্জ করা এবং উপদেশ দেওয়ার

উপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, যার সাহায্যে তারা ছেলে-মেয়েদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে দিতে পারছেন। ঠিক তেমন করেই খ্রীষ্টিয় উৎসাহদানের ক্ষেত্রেও এই একই বিষয় দেখতে পাওয়া যায়, যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পূর্বাঞ্চলীয়- বিশেষতঃ কোরিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা উৎসাহ দেবার বদলে বরং বকা-ঝকার উপরে গুরুত্ব দেয়। অনেক কুশলী ব্যক্তিবর্গ এখন বলেন, শিক্ষাদানের ক্ষেত্র যদি প্রধানতঃ বকা-ঝকা হয়, তাহলে যারা এই ধরনের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বেড়ে ওঠে তারা স্বভাবতই নেতিবাচক, সমালোচনা মুখর, দোষারোপকারী এবং অপব্যবহারকারী হয়ে থাকে। এছাড়াও, উক্ত ব্যক্তি তার এই নেতিবাচক মনোভাব তার বংশধরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, কারণ তিনি যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন ঠিক তেমন শিক্ষা তিনি তার ছেলে-মেয়েদের দেবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

তা সত্ত্বেও, যারা ইতিবাচক পরিবেশে পূর্ণ প্রশংসা ও সহযোগিতায় বেড়ে ওঠে, তারা অন্যদের প্রতি তাদের সহযোগিতার মনোভাবে, ক্ষমাশীলতায়, দেখাশোনায় এবং উদারতায় যত্নবান হয়। আমার স্ত্রী এবং আমি, আমাদের তিনটি সন্তানকেই এরকম ইতিবাচক পরিবেশে বড় করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সচেতন পিতা-মাতা হিসাবে, সন্তানদের লালন-পালন করার উপর লেখা অনেক বই আমরা পড়ি। যেমন- আমার স্ত্রী সন্তান লালন-পালনের উপরে বাজারে পাওয়া যায় এমন সব বই অধিকাংশই পড়ে ফেলেছেন। তিনি এতো বই পড়েছেন যে, আমি তার হিসাব রাখা অনেক আগেই ভুলে গেছি। এটা আমরা যেমন করে পশ্চিমাদের কাছ থেকে শিখেছি, তেমন করেই আমাদের সন্তানদের উৎসাহ দেবার জন্য এবং ইতিবাচক পরিবেশে তাদের বড় করে তুলতেও সচেষ্ট হয়েছি।

আপনি যদি আমার ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন- তারা কখনও লোকদের অবজ্ঞা করে না, আর খুব কমই অন্যদের সমালোচনা করে থাকে। তাদের মধ্যে সব সময়ই বেশ ইতিবাচক মনোভাব দেখা যায়। পালক হিসাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, আমার মধ্যেও মাঝে মাঝে নেতিবাচক অভ্যাস দেখা যায়। আমার এই এশিয়ান জন্মসূত্রে, আমি অনেক ক্ষেত্রেই কখনও খাবার সময় লোকদের সম্বন্ধে নেতিবাচক কথা বলে থাকি। কিন্তু যখনই আমি তেমন কিছু করি, প্রথমেই আমার ছেলে-মেয়েরা আমাকে বকা দেয়: 'বাবা, তুমি কেন এটা বললে? এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার এতটা নেতিবাচক হওয়া ঠিক না!' এ বিষয়ে তারা সর্বদা আমাকে শিক্ষা দেয়। যখনই তারা বলে তখনই আমি বুঝতে পারি যে, আমার মধ্যে যথেষ্ট নেতিবাচক মনোভাব আছে। আর তাই সাথে সাথেই ছেলে-মেয়েদের কাছে আমি আমার দোষ স্বীকার করি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সেজন্য, আমি লোকদের নেতিবাচক দিকগুলো না দেখে বরং তাদের ভাল কাজগুলোর দিকে দৃষ্টি দেই। আপনিও যদি চেষ্টা করেন, তাহলে আপনিও লোকদের ভিতরে থাকা প্রতিভা ও গুণাবলী খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করতে পারবেন। এইরকম প্রেক্ষাপট আমাকে সুযোগ করে দেয় যেন আমি অন্যদের প্রশংসা করতে পারি; এতে আমার খুব একটা কষ্টবোধ হয় না। তাছাড়া, এভাবে কথা বলা যায়, যখন আমি লোকদের মধ্যে কোন খুঁত দেখি, আমি তখন কোন সমালোচনা বা বিচার করার মনোভাব নিয়ে তাদের দিকে আঙুল দেখাই না; বরং আমি আমার সাধ্য মত ভালবাসার মনোভাব নিয়ে গঠন মূলক মন্তব্য করি যেন তাদের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে।

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সত্যি করে যা একজন লোককে পরিবর্তন করতে পারে, তা বাজে বকাঝকা করে নয়, কিন্তু দয়াশীল হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে। লাঠি দিয়ে লোকদের সাময়িকভাবে পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু সেই পরিবর্তন হয় শুধুমাত্র ভয় পেয়ে, দোষী বলে নয়। আবার কোন কোন সময়, লাঠি ভালোর চেয়ে মন্দই বেশী করে ফেলে। বাস্তবিক, লাঠি উক্ত ব্যক্তির মৌলিক বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পারে না। তবে শুধুমাত্র ভালবাসা দিয়ে কাউকে সত্যি করে পরিবর্তন করা যায়। কারণ ভালবাসা একজন ব্যক্তির ভিতরের অংশকে পরিবর্তন করতে পারে, এমন কি বাইরের চেহারাও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রশংসা এবং উৎসাহের বাক্য যারা শোনে, তাদের সকলের মধ্যে প্রচুর শক্তি বা তেজ উৎপন্ন হয়; তা সে ধার্মিক হোক বা না হোক। যখন লোকেরা অজ্ঞানতাবশত ভুল করে তখনও যদি আপনি তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে উৎসাহিত করেন, তাহলে তারাও ভীষণভাবে উপকৃত হবে। মনস্তাত্ত্বিকগণ একটি উদাহরণ হিসাবে নিচের পরীক্ষাটি করে দেখিয়েছেন। ধরা যাক, ক এবং খ দু'টি দল। তাদের একই মানের ছয়টি প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। প্রথমবার উভয় দলই ছয়ের মধ্যে তিন পেয়েছিল। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকগণ যখনই তাদের ফলাফল ঘোষণা করেছিলেন, তখন তারা সুচিন্তিতভাবেই ক দলকে বলেছিলেন যে তারা ছয়ের মধ্যে পাঁচ পেয়েছে; কিন্তু খ দলকে তাদের সঠিক ফলটি তারা বলেছিলেন। সেজন্য, ক দল এটা বিশ্বাস করেছিল যে, খ দল থেকে তারা ভাল ফল লাভ করেছে; কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয়। পরবর্তিতে ফল ছিল সত্যিই আশ্চর্যজনক! দ্বিতীয় বারে, ক দল সত্যিই ছয়ের মধ্যে পাঁচ পেয়েছিল, কিন্তু খ দল ঠিক আগের মতই ছয়ের মধ্যে তিন। এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসার কথা সত্যি হোক বা না হোক, শ্রোতাদের শোনার ফলে সত্যি করেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বেশ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটাতে পারে।

তিক্ততার মূল

এখন আমরা প্রায় সকলেই উৎসাহ দানের উপকারিতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও নীতিমালা বেশ ভালভাবে জেনেছি। তবে অধিকাংশ লোকের জন্য এরকম ব্যাখ্যা খুব একটা নতুন বিষয় নয়। আমরা হয়তোবা সারা জীবন ধরে কমপক্ষে হলেও একবার "কারুকাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল" এই কথাটি আলোচনা করেছি। যে বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা অবশ্যই ফেলে দেবার মত কোন আবিষ্কার নয়। যদিও উৎসাহদানের শক্তি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট অবহিত করানো হয়েছে, তবুও আমার বক্তব্য হচ্ছে- আমরা প্রায়ই এই জ্ঞান হাতে-কলমে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হই।

এর আগের অধ্যায়টি পড়ে, সম্ভবতঃ আপনিও নিজেকে দোষী এবং সমস্যাগ্রস্থ মনে করতে পারেন। কারণ আপনি তো এখন উৎসাহ দানের উপকারিতা জানেন ও বোঝেন, কিন্তু বাস্তবে তা সহজে অনুশীলন করেন না। আমরা যদি সত্যি উৎসাহ দানের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতাম, তাহলেই হয়তোবা সবচেয়ে ভাল হতো। এতে কমই হতাশা আসতো এবং যেভাবে খুশী সেভাবেই জীবন পরিচালনা করতে পারতাম। কিন্তু আমরা যেভাবে শিখছি সেভাবে অভ্যাস করতে পারি না। কারণ ভালো ভালো উপদেশ এবং পড়াশুনা সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে আমাদের দোষী মনোভাবের সাথে যুক্ত হয়। অনেক সময় এরকম সংকট আমাদের মোকাবেলা করতে হয়।

আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি: কেন আমরা অন্যদের উৎসাহ দিতে বা প্রশংসা করতে পারি না? আবার, যখনই মুখ খুলি তখনই নেতিবাচক কথা বলি; যদিও জানি তা আমাদের বলা উচিত নয়। মূল সমস্যাটা আসলে ঠিক কি? অন্যদের উৎসাহ দিতে আসলে আমাদের বাধাটা কোথায়?

এর উত্তর হচ্ছে: আসলে সমস্যাটা আমাদের 'অন্তরের মানুষ' কে নিয়ে; ঠিক যেভাবে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে (রোমীয় ৭:২২; ইফিষীয় ৩:১৬ পদ)। মার্ক ১২:৩০ পদে যীশু আমাদের "অন্তরের মানুষ" সম্পর্কে বেশ বড় একটি গুপ্ত সত্য প্রকাশ করেছেন। আমাদের "অন্তরের মানুষ" এখানে চারটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিভক্ত, যা এই পদে বর্ণনা করা হয়েছে: "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর (কার্ডিয়া), সমস্ত প্রাণ (সুকে), সমস্ত মন (দিয়ানইয়া) এবং সমস্ত শক্তি (ইসকুস) দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।" যীশু আমাদের আদেশ করেছেন যেন আমরা এই চারটি অংশ দিয়েই ঈশ্বরকে ভালবাসি। কিন্তু অন্য অর্থে, এটি আমাদের "অন্তরের মানুষের" কথা বলছে যা কি না চারটি অংশ নিয়ে গঠিত। অন্তর বা হৃদয় (কার্ডিয়া) কে আবার 'মানুষের আত্মা' বা পিনিউমা এনথ্রোপস বলা হয়, যা আদিপুস্তক ৪১:৮, ৪৫:২৭ পদ; যাত্রাপুস্তক ৩৫:২১ পদ; গণনাপুস্তক ১৪:২৪ পদ; ১ শমূয়েল ১:১৫ পদ; ২ রাজাবলি ২:১৫ পদ; ইয়োব ৭:১১ পদ; ২ করিন্থীয় ২:১৩ পদগুলোতে দেখতে পাই। আর পুরানো গ্রীক ভাষায় আমাদের অন্তরের গভীরের অংশটি হচ্ছে এই 'পিনিউমা এথ্রোপস' শব্দটি। আবার এটিকে যিহূদীদের পবিত্র আবাস-তাম্বুর মহাপবিত্র স্থানের দয়ার আসনের সাথে ও

সাক্ষ্য-সিন্দুকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মনোস্তাত্ত্বিকেরা একথা বলেন যে, আমাদের দেহের 'অবচেতন' একটি অংশ সেখানে বাস করে। ইব্রীয় ১২:১৫ পদে উল্লেখিত "বিষাক্ত তেতো গাছের শিকড়ের মত" ঠিক যা বেড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে, সেখান থেকেই আমাদের যত নেতিবাচক কথা ও আচরণ বের হয়ে আসে। এটা হচ্ছে সেই বিষ, যার কথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি; সেখান থেকেই আমাদের ভিতরকার সব নেতিবাচক বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়।

আত্মিকভাবে পুনরুদ্ধারের প্রথম ধাপটি হচ্ছে, আমাদের মধ্যে যে এই বিষ আছে তা জানতে পারা, মেনে নেওয়া এবং স্বীকার করা। তেতো গাছের শেকড় মানে হচ্ছে ঘৃণা, হিংসা, নৈরাজ্য, হীনমন্যতা, রাগ, উদ্বেগ, মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা, বিষন্নতা, অবজ্ঞা, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বস্ততা, অবাধ্যতা, ক্ষমাহীনতা, বিদ্রোহী মনোভাব এবং ভয় ইত্যাদি জমে থাকা স্তুপ। এগুলোর সবই হচ্ছে আমাদের পিতা-মাতা, ভাই- বোন এবং স্কুলের সাথী; শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহকর্মী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া সারা জীবনের জমা করা সবরকম দুঃখ-কষ্টগুলো।

যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের দ্বারা আমরা পরিষ্কৃত না হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিষ আমাদের অন্তরের খুব গভীরে কোথাও না কোথাও দৃঢ়ভাবে গ্রোথিত থাকে। কোন কোন সময় আমরা হয়তো এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারি না, কারণ এগুলো আমাদের অবচেতন মনে লুকানো থাকে। তবু আমরা জানি, এগুলো সেখানে আছে এবং পরে আমাদের কোন এক অন্ধকার মুহূর্তে এই বিষ প্রচুর পরিমাণে ও ভয়ংকর রূপে বের হতে শুরু করে। বিশেষতঃ যখন কোন কষ্টকর সময় আসে, তখন ঐ তেতো গাছের শিকড়গুলো প্রকাশ পায় এবং আমাদের প্রায় অধিকার করে ফেলে। আর তখন আমরা আমাদের আনন্দ হারিয়ে ফেলি, কাজে এবং কথায় আমরা হয়ে পড়ি হতাশ ও হতোদ্যম। অন্যদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা হই রূঢ়, কঠোর ও অবিবেচক এবং আমাদের কৌতুকেও তীব্র ব্যঙ্গ বা বক্রোক্তি ফুটে ওঠে। এটি সকলের ক্ষেত্রেই এক, এমন কি আমার ক্ষেত্রেও। আমরা সকলেই কমবেশী আমাদের মনের মধ্যে এই বিষ বহন করছি; তবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান থাকে।

এই বিশেষ প্রকারের বিষ আমাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও 'সময়মত কথা বলতে' বাধা সৃষ্টি করে। এটি আবার অন্যদের উৎসাহ দিতেও বাধা সৃষ্টি করে। আমরা যেহেতু প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, এই বিষ জিভের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করতে থাকে। কারণ আমাদের অন্তর তিক্ততায় ভরা থাকাতে বিষে ভরা কথা আমরা না বলে পারি না। অন্তর তিক্ততায় ভরা থাকলে কেমন করে তার কাছ থেকে মিষ্টি কথা আশা করা যায়? আমরা যখন এই বিষ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তখন তার পরিণতি হয় সুস্পষ্ট। আমাদের কথা কাঁটার মত খোঁচা দেয়, সংক্রামিত করে এবং আমাদের সমাজ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সকলকেই ভীষণভাবে ও ব্যাপকভাবে আঘাত করে।

আমরা আগে থেকে দেখতে পেয়েছি, সৃষ্টির শুরু থেকে কেমন করে এই বিষ মানুষের সকল সমস্যার মূল কারণ হয়েছে। তাহলে আমরা কেমন করে এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারি? আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা কিভাবে এই বিষ থেকে রেহাই পেয়ে আমাদের জীবনে উৎসাহের সকল উপকারিতা যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করতে পারি?

পালক হিসেবে সত্যি আমার খুবই দুঃখ হয় যখন দেখি, ঈশ্বরের মণ্ডলীর সহকর্মী খ্রীষ্টিয় ভাই-বোনেরা চার্চের মধ্যে বিষ ছোড়াছুড়ি করছে। আমি ঈশ্বরকে বলি, 'প্রভু, তোমার সন্তানেরা, তোমার একমাত্র পুত্রের দেওয়া মূল্যে তোমার কাছ থেকে অনন্তজীবন লাভ করে কিভাবে এমন তেতো গাছের শিকড়ে পূর্ণ? এই সব দেখে আমার কান্না আসে।' কিন্তু এভাবে আমার ভাইদের মন্দতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও আমি তো জানি, যীশু আমার জন্য মৃত্যুকে বরণ করেছেন এবং আমার পাপের জন্য তিনি কেঁদেছেন। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আমি বিচার করি- তবু আমি তো সমভাবে শাস্তি পাবার যোগ্য!

এই কালের মণ্ডলীগুলো কেন নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে? আপনার মণ্ডলীতে কি ঠিক এরকম কোন সমস্যা আছে? তবু মোটামুটি পুরানোপন্থী যে কোন একটি মণ্ডলীতে গিয়ে দেখে আসুন।

আপনি সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং শান্তি খুব সহজে দেখতে পাবেন না; কারণ মণ্ডলীর নিজস্ব ঐতিহ্য, অন্ধ ধর্মমত এবং নিয়ম-নীতিগুলো আসলে তাদের উপাসনাকে প্রতিমাসক্ত করে রেখেছে। আপনি হয়তোবা দেখতে পাবেন যে, এরকম নিয়ম ও নীতিবদ্ধ উপাসনায় যারা বড় হয়ে উঠেছে, তাদের কাছে ঈশ্বরের চেয়ে বরং মণ্ডলীর নিয়ম-নীতি বেশী ভাল বলে মনে হয়। আবার, এ রকম মণ্ডলীর মধ্যে অনেক বিভক্তি দেখা যায়, যেমন– পালক পালকে ঝগড়া, পালকের বিরুদ্ধে প্রাচীনেরা, ডিকনেরা এবং পালক হয়তোবা মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের বিরুদ্ধে, এরকম আরও কত কিছু! কিন্তু কেন? কারণ তারা 'তেতো গাছের শিকড়ে' তাদের অন্তর পূর্ণ করে রেখেছে। বৈধভাবে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে তাঁর সন্তান হয়েছি, কিন্তু নৈতিকভাবে ও আদর্শগতভাবে আমরা আমাদের ভেতরের তেতো গাছের শিকড় উৎপাটন না করে ঈশ্বরের সন্তানের মত আচরণ করতে পারছি না। মূলতঃ এটিতো আমাদের বড় সংকট, যা থেকে আমরা এক দিনে সুস্থ হতে পারি না।

তিক্ততার মূল সরিয়ে ফেলার উপায়

চূড়ান্তভাবে আমাদের হৃদয় থেকে এই বিষ উপড়ে ফেলার জন্য আমি কয়েকটি উপায় পরামর্শ হিসাবে দিতে চাচ্ছি। প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে যেসব তিক্ততা আছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। একেবারে গোঁড়াতে এটি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি না। যখন আপনি স্বীকার করবেন যে, আপনার অন্তর তেতো গাছের শিকড়ে ভরা, তখনই আপনি ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাবেন এবং তাকে সব কথা বলবেন: 'প্রভু, আমি এই তিক্ততা আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমি সত্যি বুঝতে পারি নাই যে, এগুলো আমি জমা করে রেখেছি। কিন্তু এখন আমি আমার মধ্যে হিংসা, ঘৃণা এবং আরও অনেক নোংরা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। প্রভু, দয়া করে আমাকে এসব থেকে মুক্ত কর।' এভাবে প্রার্থনা করে, আপনি প্রভুর ক্ষমতা ও শক্তির উপরে নিজেকে ছেড়ে দিন যেন তিনি আপনার অন্তর পরিষ্কার করে দেন। এতে আপনার অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত শেকড় কাঁপতে শুরু করবে ও তাদের শক্তি ঢিলে হয়ে যাবে এবং তখনই সব উপড়ে ফেলে নিশ্চিহ্ন করা যাবে।

এখন, আমরা নিজেদের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে আমাদের সমস্যা ও আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি। আমাদের আত্মীয়-পরিজন ও আমাদের বন্ধু-বান্ধবের কাছেও আমাদের ভিতরকার 'তেতো গাছের শিকড়' সম্পর্কে বলি। 'আমরা প্রত্যেকে বলি, আমি দোষে পূর্ণ একজন মানুষ, সহজে হিংসুক বনে যাই। আমাকে দয়া করে ক্ষমা কর।' নম্রতায় আপনার নিজের কাছেই সমস্যার কথা প্রথমে স্বীকার করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে ও আপনার সমাজের কাছেও স্বীকার করুন। এতে করে আপনার ভিতরকার তেতো গাছের শিকড় তুলে ফেলার আগেই তা নড়বড়ে হয়ে যাবে। একজন কঠিন উগ্রমনা ব্যক্তি এই কাজটি করতে পারে না, কারণ তার ভেতরে তেতো গাছের শিকড় আছে যা তিনি হয়তো স্বীকার করতেও চান না। এমনকি ঐ লোকটি অন্যদের দোষ খুঁজে বের করতে আনন্দ বোধ করে। তবে একজন নত-নম্র নিরহঙ্কার লোক তার দোষ অনায়াসে স্বীকার করতে পারে।

আমাদের নিজেদের সমস্যাগুলো যথারীতি স্বীকার করতে হবে এবং আমাদের বুঝতে হবে যে, অন্য লোকেরাও তাদের নিজেদের তেতো গাছের শিকড় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এটিও বুঝতে হবে যে, আমাদের প্রতিবেশীদেরও ঠিক একই দুর্বলতা রয়েছে, যা আমাদের হৃদয়ে আছে। তবুও তাদের সাহায্য করতে, তাদের সুস্থ করতে প্রভুর কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। আপনি যখন তা করবেন, তখন আপনার অন্তর থেকে ঈশ্বরের দয়া ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে তাদের অন্তরে যাবে এবং আপনি তাদের অন্তরের তেতো গাছের শিকড় উপড়ে ফেলতে সাহায্য করছেন। আপনার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, প্রশংসা ও সান্ত্বনা পেয়ে তারা আরোগ্য লাভ করবে এবং তাদের অন্তরের তেতো গাছের শিকড় ক্রমশঃ শুকিয়ে মরে যাবে।

যে শক্তি আমাদের ভেতরকার দুর্বলতা মেনে নিতে ত্বরা করে, তা আবার ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে অন্যদের মধ্যে থাকা তাদের তিক্ততার মূল বুঝতেও সাহায্য করে। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার করার, পুড়িয়ে ফেলার এবং কেটে সাফ করার শক্তি। সেজন্যই, পবিত্র শাস্ত্র পড়তে হবে, মুখস্থ করতে হবে

এবং ধ্যান করতে হবে। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের ঘোষণা শুনি, তখন তা আমাদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে এবং তিক্ততার মূল ধরে নাড়া দেয় ও আমাদের ভেতর থেকে সেসব সরিয়ে দেয়। আমাদের উচিত সরলভাবে উপলব্ধি করা এবং আকাঙ্ক্ষা করা, যেন ঈশ্বরের বাক্য শোনা ও পড়ার মাধ্যমে আমাদের জীবনে এই কাজটি সম্পন্ন হয়।

ঈশ্বরের বাক্য যখন আমাদের অন্তরের গভীরে, অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক ভাষায়- 'কার্ডিয়া' স্পর্শ করে (যেখানে রয়েছে তেতো গাছের শিকড়ের অবস্থান), তখন তা আমাদের আরোগ্য দান করে। আমাদের আশ্চর্য পরামর্শদাতা পবিত্র আত্মা বাক্যের সাথে এক হয়ে এই কাজটি করেন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে যে, ঈশ্বরের বাক্য মানে "আত্মার ছোরা" (ইফিষীয় ৬:১৭ পদ) যা অন্তরের অতি গভীরে প্রবেশ করে এবং সেখানে থাকা তেতো গাছের শিকড় কেটে সাফ করে দেয়। তবে তা কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য পড়াশুনা করলেই আমরা অর্জন করতে পারব না। কারণ বাক্য হচ্ছে আত্মিক খাবার, যা অবশ্যই আমাদের অন্তরের গভীরে পৌঁছাতে হবে, যাকে আমরা বলি ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করা। রাজা দায়ূদ এই অভ্যাস ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন, যা আমরা গীতসংহিতায় দেখতে পাই: "বরং সদাপ্রভুর আইন-কানুনেই তার আনন্দ, আর সেটিই তার দিনরাতের ধ্যান" (গীতসংহিতা ১:২ পদ)।

গীতসংহিতার অনেক পদ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, দায়ূদ তার জীবনের তিক্ততার মূল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে তিনি তা দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবেই তিনি ঈশ্বরের ভালবাসার মানুষ হয়েছিলেন এবং লোকদের কাছে সম্মানিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার ফলেই তিনি-"(তার) সমস্ত অন্তর, (তার) সমস্ত প্রাণ, (তার) সমস্ত মন এবং (তার) সমস্ত শক্তি দিয়ে" ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে পেরেছিলেন (মার্ক ১২:৩০ পদ)। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই ঈশ্বর দায়ূদের জীবনের তিক্ততার মূল উপড়ে ফেলেছিলেন।

অন্যান্য ধর্মীয় আদর্শের তথাকথিত ধ্যান করার পদ্ধতির চেয়ে আমাদের ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করা শুধু হৃদয় শূন্য করে ফেলা নয়, কিন্তু তা হচ্ছে একটি স্থির, বাস্তব ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আমরা যীশুর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করি: "সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন" (যোহন ১:১৪ পদ)। যদি যীশুই সেই বাক্য হয়ে থাকেন, তাহলে পবিত্র বাইবেল ধ্যান করা মানে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলা ছাড়াতো নিশ্চয়ই আর কিছু নয়।

ধ্যান মানে যীশুর সাথে পাশাপাশি হেঁটে চলা (মথি ২৮:২০ পদ)। এটি আবার পবিত্র আত্মার সাথে মনের মধ্যে কথা বলা, যাকে আমরা বলি 'পিনিউমা' (যোহন ৭:৩৮-৩৯ পদ) এবং বাইরে থেকে কথা বলা বলতে আমরা বলি 'প্যারাক্লেটস' (যোহন ১৪:১৬ পদ)। এই হচ্ছে সেই পবিত্র আত্মা, যা কিনা পঞ্চাশত্তমী-পর্বের দিনে উপরের কামরায় পিতর সহ অন্যান্য শিষ্যদের মাথার উপরে নেমে এসেছিল। পবিত্র আত্মা আমাদের ভেতরে থাকা তিক্ততার মূল উৎপাটনের জন্য এসে থাকেন। আবার, আত্মার আগুন আমাদের পুড়িয়ে দিতে পারে (যাত্রাপুস্তক ৩:২ পদ; প্রেরিত্ ২:৩ পদ), আত্মার খাঁটি জল আবার পরিষ্কারের কাজও করে (ইব্রীয় ১০:২২ পদ), আত্মা প্রচন্ড বাতাসের মত আমাদের অন্তরের মন্দতাগুলো তাড়িয়ে দিতে পারে (প্রেরিত্ ২:২ পদ), তারপর কপোতের মত তা আমাদের উপরে নেমে আসতে পারে (মথি ৩:১৬ পদ; মার্ক ১:১০ পদ), যেন আমরা চূড়ান্তভাবে এই পৃথিবীর উদ্বিগ্নতা থেকে, ভয় থেকে মুক্ত হই এবং সান্ত্বনা লাভ করি।

আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা বিনম্রভাবে স্বীকার করি যে, শুধুমাত্র আত্মার খড়গ অথবা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যানের মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মার আগুনে পুড়িয়ে এবং পরিষ্কার করে আমাদের মধ্যেকার তিক্ততার মূল স্থায়ীভাবে নির্মূল করা যায়। গভীরভাবে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ধ্যানে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র আত্মার সাহচর্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। এই অভিজ্ঞতাকে আবার 'পবিত্র আত্মার অভিষেক' অথবা 'পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম' বলে উল্লেখ করা হয়। এটি শুধুমাত্র একবারের বিষয় নয় কিন্তু যতবার আমরা পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে কাজ করতে দেব, ততবারই যে কোন সময় অথবা সব সময়ই আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ

করতে পারব। যখন আমরা প্রতিদিন এভাবে ঈশ্বরের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং পবিত্র আত্মা আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরামর্শদাতা হন, তখনই বলা হয়, আমরা 'পবিত্র আত্মায় পূর্ণ'।

একই সময়ে পবিত্র আত্মার অভিষেক পাওয়া আমাদের সব খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যই বিশেষ অধিকার বা সুবিধা এবং অনুগ্রহ দান। আমরা এই সুযোগ সরল চিত্তে ধ্যানের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারি। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করি, যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে কথাবার্তা বলি, যখন আমরা আত্মিকভাবে সচেতন হয়ে জেগে উঠি, তখন আমাদের অনুভূতি নিখুঁতভাবে ক্রিয়াশীল হয়। আর যখন আমাদের আত্মিক চোখ খুলে যায়, তখন আমরা প্রভুর সিংহাসন ও তাঁর মহিমা দেখতে সমর্থ হই! যেমন- ব্যক্তি হিসাবে যোহন (প্রকাশিত বাক্য ৪-৫ অধ্যায়), পৌল (২ করিন্থীয় ১২:২ পদ) এবং যিশাইয় ভাববাদী (যিশাইয় ৬:১-১৩ পদ) ঈশ্বরের সিংহাসন দেখেছিলেন। পবিত্র লোক হিসাবে, শুধুমাত্র সিংহাসন দেখার অধিকার নয়, কিন্তু পবিত্র ত্রিত্বের অর্থাৎ ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিত্বের সাথে কথা বলা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার অধিকারও আমাদের রয়েছে।

পবিত্র শাস্ত্র বলেছে যে, পিতা ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখে নাই। আমরা শুধুমাত্র তাঁর (ঈশ্বরের) মহিমা দেখতে পারি (যোহন ১:১৮ পদ)। কিন্তু তবু আমরা তো যীশুকে জানতে পারি ও সাক্ষাৎ পেতে পারি; যিনি একজাত ও শুধুমাত্র একই ঈশ্বর, যিনি পিতাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন (যোহন ১:১৮ পদ; গীতসংহিতা ১১০:১ পদ)। যোহন, পৌল এবং যিশাইয়ের মত করে আমাদেরও আত্মিক চোখ দিয়ে পুত্র ঈশ্বরকে দেখবার আশা করা উচিত। কিন্তু তার আগে, অবশ্যই আমাদের আত্মিকতাকে বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই হচ্ছে সেই যীশু যার মধ্য দিয়ে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, যিনি নানা ভাবে বা নানা উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন।

ঈশ্বর, যিনি সকল কিছুরই মালিক; তিনি যে কোন সময় যে কোন আকারে উপস্থিত হতে পারেন। ঈশ্বরকে ছোট একটা বাক্সে ধরে রাখা অবশ্যই আমাদের উচিত হবে না বরং আমাদের বিশ্বাস করা উচিত এবং আশা করা উচিত যে, ঈশ্বর অলৌকিক ভাবে এবং কোন কোন সময় অবিশ্বাস্য উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। যেমন- যীশু একবার যোহনের কাছে হত মেষ-শিশু হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:৬ পদ)। এই মেষ-শিশুর ছিল বেশ এক অদ্ভুত চেহারা। যেহেতু তাঁর ছিল সাতটা শিং ও সাতটা চোখ! তাছাড়া, পরবর্তী দৃশ্যটি কল্পনা করা আমাদের জন্য বেশ কষ্টকর। কারণ এই পুনরুত্থিত মেষ-শিশু এসে পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি গুটানো বই নিয়েছিলেন।

পবিত্র বাইবেল আমাদের একথা বলেছে যে, এই গুটানো বইটি সাতটি সীলমোহর করে আট্‌কে রাখা হয়েছে এবং যেখানে রয়েছে পৃথিবীর শেষ সময়ের রহস্য। এখানে যীশুর উপস্থিতি বেশ অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু এই যীশু, যিনি প্রথম ও শেষ এবং পৃথিবীর সকল ইতিহাসের স্রষ্টা (প্রকাশিত বাক্য ১:৮ ও ১:১৭ পদ), তিনি এই নির্দিষ্ট সময়ে যোহনের কাছে মেষ-শিশু হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন; একমাত্র তিনিই ঐ গুটানো বইটির সীল খুলতে পারেন (প্রকাশিত বাক্য ৬:১ পদ)। এভাবে প্রভু যীশু পাটম্‌স দ্বীপে যোহনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। এখানে একটি মূল বিষয় হচ্ছে, যদিও ৬৫ বছর আগে স্বর্গারোহণের সময় যীশুর চেহারা ছিল ভিন্ন, তবুও এই একই যীশু যোহনের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এর আগে যোহন কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ১:১২-১৫ পদে যীশুকে বর্ণনা করেছিলেন: "যিনি কথা বলছিলেন তাঁকে দেখবার জন্য আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং সোনার সাতটা বাতিদান দেখলাম। সেই বাতিদানগুলোর মাঝখানে মনুষ্যপুত্রের মত কেউ একজন ছিলেন। তাঁর পরনে পা পর্যন্ত লম্বা পোশাক ছিল এবং তাঁর বুকে সোনার পটি বাঁধা ছিল। তাঁর মাথার চুল ভেড়ার লোমের ও বরফের মত সাদা ছিল এবং তাঁর চোখ আগুনের শিখার মত ছিল। তাঁর পা ছিল আগুনে পুড়িয়ে পরিষ্কার করা খুব চক্‌চকে পিতলের মত, আর তাঁর গলার স্বর ছিল জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের শব্দের মত।" এখানে আমরা যীশুর সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত বর্ণনা দেখতে পাই, তাই না?

এখানেই সব নয়। যোহন আরও বর্ণনা করেছেন, কিভাবে যীশু তাঁর ডান হাতটি যোহনের উপরে রেখে বলেছিলেন: "ভয় কোরো না। আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই চিরজীবন্ত। আমি মরেছিলাম, আর দেখ, এখন

আমি যুগ যুগ ধরে চিরকাল জীবিত আছি। আমার কাছে মৃত্যু ও মৃতস্থানের চাবি আছে।" ঠিক এই সময়ে যীশুর উপস্থিতি ছিল দয়া ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ। কিন্তু অন্য দিকে, তিনি যখন পর্গাম মণ্ডলীর কাছে কথা বলেছিলেন, তখন এমন একজনের মত কথা বলেছিলেন, যিনি "ধারালো ছোরার দু'দিকেই ধার আছে তার অধিকারী" (প্রকাশিত বাক্য ২:১২ পদ)। আবার সার্দি মণ্ডলীর কাছে "ঈশ্বরের সাতটি আত্মা এবং সাতটি তারা যিনি ধরে আছেন", তিনিই হচ্ছেন যীশু (প্রকাশিত বাক্য ৩:১ পদ)। তারপরে, ফিলাদিলফিয়া মণ্ডলীর কাছে যীশু "যিনি পবিত্র ও সত্য, যাঁর কাছে দায়ূদের চাবি আছে" (প্রকাশিত বাক্য ৩:৭ পদ) এবং লায়দিকেয়ার মণ্ডলীর কাছে তিনি "ঈশ্বরের সৃষ্টির মূল" (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪ পদ)।

এও স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন, এই একই যীশু, যিনি বিভিন্ন আকারে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি আমাদের সাথে, সব সময় এবং যুগের শেষ পর্যন্ত থাকবেন বলে এক প্রতিজ্ঞা করেছেন (মথি ২৮:২০ পদ)। তিনি আমাদের সাথে আমাদের বাড়ীতে আছেন, আমাদের কাজের জায়গায় আছেন এবং আমাদের মণ্ডলীতে আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু তবুও আবার বলি, সমস্যা আমাদেরই। আমাদের আত্মিক সচেতনতা ও বিশ্বাসের অভাবের জন্যই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে বা অনুভব করতে পারি না, যদিও তিনি সব সময় আমাদের সাথে সাথে আছেন। যে ধরনের প্রার্থনা পবিত্র আত্মার অভিষেক পেতে সাহায্য করে, সেই প্রার্থনা যীশুর উপস্থিতি স্বীকার করতে আমাদের সাহায্য করে থাকে। যীশুর উপস্থিতি যেখানে, পবিত্র আত্মার উপস্থিতিও সেখানে আছে। স্বর্গ সিংহাসনের কাছ থেকে এসে পবিত্র আত্মা আশ্চর্য পরামর্শদাতা হিসাবে আমাদের সাথে থাকেন এবং আমাদের দুর্বলতার সময়ও তিনি আমাদের সাথেই থাকেন, যেন আমরা নিয়মিত যীশুর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি। "কিন্তু যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সেই রকম আকুলতার সংগে পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন" (রোমীয় ৮:২৬ পদ)।

বিশ্বাসের চোখ মেলে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে, আমাদের উপরে পবিত্র আত্মার অভিষেক এসেছে। অবশ্যই আমাদের মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত পবিত্র আত্মার দ্বারা পূর্ণ ভাবে ধৌত ও পরিষ্কৃত হতে হবে। গভীর ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা আমাদের অর্জন করতে হবে যেন আমাদের মুখ, গলা, কাঁধ, বাহু, পাকস্থলি, কোমর, পা এবং পায়ের তলা পর্যন্ত পবিত্র আত্মা প্রবাহিত হন। এটি তখনই সম্ভব, যখন বিশ্বাস করে আমরা এই অভিষেক বরণ করে নেই। এতেই আমাদের ভেতরকার তিক্ততার মূল আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং আমাদের অন্তর পবিত্র আত্মার ফলগুলো ধারণ করতে শুরু করবে।

প্রতিদিন প্রার্থনা দ্বারাই আমাদের অন্তরকে আমরা আস্তে আস্তে ও ক্রমাগতভাবে পরিষ্কার করতে পারি। কারণ, প্রতিদিনই জগতের নোংরামি দ্বারা আমরা কলুষিত হই, তাই প্রতিদিনই আমাদের পরিষ্কৃত হওয়া দরকার হয়। এজন্য, ১ থিষলনীকীয় ৫:১৭ পদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেছেন যেন আমরা "সব সময় প্রার্থনা" করি। (এই পদটির কোরিয়ান অনুবাদ বেশ আকর্ষণীয়: বলা হয়েছে, "অবিরত প্রার্থনা কোরো")। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবীতে আমাদের আত্মিকতা কলুষিত হয়। তাই প্রার্থনার মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিদিন ধূয়ে মুছে পরিষ্কৃত হতে হবে। আবার, আমাদের জীবনে তিক্ততার মূল এমন শক্ত হয়ে বসেছে যে, তা থেকে আরোগ্য লাভ করতে এবং পরিবর্তিত হতে বেশ অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা দরকার হবে। তথাপি এটা ঠিক যে, রাতারাতি কোন কিছুর পরিবর্তন ঘটবে না, তবে কিছু দিনের মধ্যে অবশ্যই ভাল ফলগুলো দেখা দেবে। এটি হচ্ছে প্রতিদিনের চলার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার উপায়। যদি আমরা ধ্যান ও প্রার্থনা সবচেয়ে কার্যকরভাবে করি তবে আমাদের আত্মিক যাত্রাপথে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা সার্থক হবে ।

সেজন্য, প্রেরিত্ পৌল যীশু খ্রীষ্টের নামে তার ভাই-বোনদের অনুরোধ করেছেন যেন তারা "মনকে নতুন করে গড়ে তুলতে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে ওঠে " (রোমীয় ১২:২ পদ)। 'নতুন করে গড়ে তোলার' অর্থ একজনের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন, স্বভাবের অথবা প্রকৃতির পরিবর্তন! আবার, এর অর্থ আমাদের জীবনের ভিত্তিমূলের আমূল পরিবর্তন। আত্মিকভাবে পরিবর্তিত হওয়ার মানে এমন এক অপরিহার্য পরিবর্তন, যা আমাদের আত্মিক জীবনের পটভূমিকে সম্পূর্ণভাবে নবায়ন করে দেয়। এর অর্থ, আমাদের ভিতরকার সমস্ত তিক্ততার মূল উপড়ে ফেলা এবং আমাদের নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করা। কিভাবে আমরা নবায়িত হতে পারি?

পবিত্র আত্মার ফলগুলো দ্বারাই আমরা আমাদের মধ্যেকার তিক্ততার মূলগুলো সরিয়ে ফেলতে পারি। যেমন- আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, 'প্রভু, তুমি আমাদের জীবনে আরও ভালবাসা দাও'। ঈশ্বর তখন আমাদের অন্তরে ভালবাসার বীজ বপন করেন। যদিও জগতে সব রকম উদ্বিগ্ন হবার কারণ রয়েছে, তবুও আমরা যখন আনন্দ চাই তখন ঈশ্বর আমাদের আনন্দিত করতে পারেন। বিশ্বাসের সাথে আমরা যা কিছু চাই, তা সবই বাস্তবায়িত হবে। তাছাড়া, এটা কি বলা হয় নাই যে, "আমরা যা পাব বলে আশা করে আছি তা যে আমরা পাবই এই নিশ্চয়তাই হল বিশ্বাস" (ইব্রীয় ১১:১ পদ)। আমরা যদি সত্যিই আমাদের অন্তরের পরিবর্তন চাই, তাহলে পবিত্র আত্মা এসে সেই পরিবর্তন সাধন করবেন।

যখন আমাদের আত্মিক জীবনে সুস্থতার কাজ লাগাতার ঘটতে থাকে, তখন আমরা অন্য ধরনের পুরুষ ও নারী হয়ে যেতে থাকি। আসুন আমরা ধৈর্য, দয়া, শান্তি এবং আর সব আত্মিক গুণগুলির জন্য সব সময় আকাঙ্ক্ষা করি। প্রার্থনা করি যেন আমাদের 'কার্ডিয়া' একটি খাঁটি অন্তরে পরিবর্তিত হয়। তখন আমাদের অন্তর এমন একটি খাঁটি অন্তর হবে, যেখানে থাকবে না কোন বিষ; যার ফলে আমাদের জিভ্ও খাঁটি হবে এবং প্রতিবেশীদের উৎসাহ দিতে, আরোগ্য করতে ও উদ্ধার করতে পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

জিভের পবিত্রতা

ঠিক এভাবে যদি আমরা আমাদের পরিচালিত করতে পারি, তাহলে যথোচিত কথা বলতে তা আমাদের সাহায্য করবে। ক্রমশ, মানানসই শব্দে সময়মত কথা বলতে আমাদের সামর্থ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মুখ দিয়ে আরও বেশী বেশী করে উৎসাহ এবং সান্ত্বনার বাক্য বের হয়ে আসবে। আমরা আরও বেশী করে ধৈর্যশীল ও আত্ম-সংযমী হতে পারব। পবিত্র আত্মা সব সময় ইচ্ছুক। তাই এখন থেকে খ্রীষ্টিয়ান প্রেক্ষাপটে কথা বলতে আমাদের শক্তি থাকবে। আমরা খুব সহজেই ক্ষমা করতে পারব, প্রতিশোধ নিতে চাইব না বরং সব কিছু মেনে নেব এবং দয়া দেখাব। যদিও এই পদ্ধতি ক্রমশ অগ্রসরমান; তাই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটবে এবং আগের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হিসাবে আমরা আমাদের দেখতে পাব।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আত্মার ফলে পরিপূর্ণ এমন লোকদের সাহচর্য আমরা কি উপভোগ করি না? এভাবে আমাদের অন্তরের বিষ ক্রমশ অদৃশ্য হয় ও সমূলে উৎপাটিত হয় এবং আমাদের অন্তর পবিত্র আত্মার ফল ধারণ করে। তখন আমরা এমন ক্ষমতা সম্পন্ন লোক হতে পারি যে, আমরা অন্যদের জীবন পরিবর্তিত করতে এবং প্রাণও বাঁচাতে পারি। খ্রীষ্টের স্বভাবের মত আমরাও পরিশুদ্ধ হতে পারি, যেন ক্ষমতা সহকারে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষীও হতে পারি। খ্রীষ্টের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে সাক্ষ্য দান করতে হলে শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধতা আনতে হবে। সুসমাচার প্রচার, প্রশিক্ষণ বা শিষ্যত্ব প্রশিক্ষণ খ্রীষ্টের পক্ষে পরিপক্ক সাক্ষী হিসাবে আমাদের তৈরী করতে পারে না। আবার, শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অন্য লোকদের জীবনেও সত্যিকার পরিবর্তন আনা যায় না। যে লোকেরা এই ধরনের প্রশিক্ষণ পায় তারা বুদ্ধিপূর্বক বাক্য প্রচার করতে পারে, কিন্তু যদি তাদের আত্মিক ক্ষমতার অভাব থাকে তাহলে অন্যদের প্রভাবিত করতে তারা সত্যিই পারবে না।

দিনের পর দিন পরিশুদ্ধ হয়ে আমরা যীশুর সদৃশ হব এবং ঈশ্বরের গৌরব ফিরিয়ে আনব, যাতে আমরাও গৌরবান্বিত হই। আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে, আসুন আমরা আরও বেশী করে খ্রীষ্টের গুণ ও স্বভাব অনুকরণ করি, যেন আমরা আত্মিক পরিপক্কতায় সঠিকভাবে পৌঁছাতে পারি। কিন্তু তারপরেও আত্মিক পরিপক্কতা রাতারাতি অর্জন করা যায় না। সাধারণতঃ পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে কারও পক্ষে এই পরিপক্কতা অর্জন করা সহজ নয়। উদাহরণ হিসাবে প্রেরিত্ পৌল ও পিতরের কথা বলতে পারি, যারা প্রায় ষাটের কাছাকাছি এসে চূড়ান্ত পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন। তীমথিয়ের কাছে লেখা পৌলের চিঠি এবং পিতরের লেখা চিঠির খাঁটিত্ব অবশ্য প্রশংসনীয়, যেখানে এই দু'জনেই প্রায় ষাট বছরের দিকে এসেই এই লেখাগুলো লিখেছিলেন। বেশ অনেকগুলো বছরের দুঃখ-কষ্ট, নম্রতা ও পবিত্রতার প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা পিতর ও

পৌলকে পরিশুদ্ধ করেছিল। ফলে, তারা এমন এক লক্ষণীয় স্থানে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখান থেকে সত্যি তারা গৌরবান্বিতও হতে পেরেছিলেন।

যত বেশী করে আমরা যীশুর স্বভাব অনুকরণ করব, তত বেশী করে আমাদের অন্তর (কার্ডিয়া) পরিশুদ্ধ হবে। আমাদের অন্তরের সাথে সাথে জিভ্ও পরিশুদ্ধ হবে। যিনি তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি পরবর্তীতে স্বর্গে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত হবেন। তিনি যীশুর মহিমা প্রতিফলিত করবেন এবং এই পৃথিবীতে তার আত্মিক অগ্রগতির মানদন্ডে ঈশ্বর তাকে স্বর্গরাজ্যে নতুন দায়িত্ব এবং পুরস্কার দেবেন।

নতুন স্বর্গীয় আইনের অধীনে থেকে আমরা নেতা হতে পারব। পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের যোগ্যতা ও পদমর্যাদা সেখানে কোন বিষয় বলে ধরা হবে না, কিন্তু ধরা হবে আমরা কি রকম স্বভাব অর্জন করেছি। আর তাও নির্ভর করবে আমাদের অন্তর, আমাদের জিভ্ ও আমাদের ব্যক্তিত্বকে আমরা কতটা পরিবর্তিত করে নিয়ন্ত্রণ করেছি তার উপর। আমাদের বলা হয়েছে, যেন আমরা পৃথিবীর লবণ ও আলো হতে পারি। লবণাক্ত হতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে আমাদের ভিতরের পরিবর্তন আনা ও পরিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আত্মিক পরিশুদ্ধতার এই ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরা, আমাদের বাইবেল পড়াশোনা, আমাদের উপদেশ, আমাদের সুসমাচার প্রচার, এ সবই মন্দতা থেকে লোকদের মুক্ত করতে এবং অন্ধকার সরিয়ে দিতে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখবে। আর ঈশ্বর তখন আমাদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হবেন।

মার্ক ১:৪০-৪২ পদ

পরে একজন চর্মরোগী যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।" লোকটির উপর যীশুর মমতা হল। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি শুচি হও।" আর তখনই তার চর্মরোগ ভাল হয়ে গেল।

পঞ্চম
অধ্যায়

উৎসাহদানঃ
শুধু কথার চেয়ে
কাজে বেশী সুন্দর

উৎসাহদান: শুধু কথার চেয়ে কাজে বেশী সুন্দর

তিরিশ বছরেরও আগের কথা বলছি। ১৯৬৮ সালে মাত্র ৫০টি ডলার পকেটে নিয়ে আমি আমেরিকাতে উপস্থিত হয়েছিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন, জীবন ছিল কষ্টকর; আর একজন ছাত্র হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য তেমন কিছু করতে পারছিলাম না। ঐ সময়ে, অধিকাংশ কোরিয়ান ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকাতে তাদের আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে রেস্টুরেন্টে বাসবয়ের কাজ করত। একটা রেস্টুরেন্টের বাসবয় মানে, সাধারণতঃ খাবার পর্ব শেষে টেবিলসহ এটো থালা-বাটি-গ্লাস সরিয়ে নেওয়া এবং সেই সাথে প্রধান ওয়েটারকে সাহায্য করা বুঝায়। একটা রেস্টুরেন্টের মানের উপরে নির্ভর করে প্রত্যেক ওয়েটারের সাথে দু'জন করে বাসবয় দেওয়া হয়, যারা টেবিল সাজানো, টেবিল পরিষ্কার করা এবং পানীয় জল সরবরাহ করার কাজও করে থাকে।

অবশ্য বাসবয়ের কাজে ভাল করতে পারলে সুবিধাও ছিল, কারণ একজন বাসবয় হিসাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলেই সাধারণতঃ ম্যানেজার তাকে প্রমোশন দিয়ে ওয়েটার পদ দিত। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, আমেরিকার কোন দামী রেস্টুরেন্টে নিয়মিত ওয়েটার বা ওয়েট্রেস হতে হলে বেশ ভাল ইংরেজি জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। আবার, আমেরিকান সংস্কৃতি সম্পর্কেও অবশ্যই বেশ সুপরিচিত হতে হবে; কারণ টেবিলে খাবার-দাবার সরবরাহ করতে ও খেতে আসা লোকদের সাথে কিছু মৌলিক কথাবার্তা বলতেও তাদের অভ্যস্ত হতে হবে। তারপর, খিদে বাড়ানোর পানীয় (এপেরিটিফ) থেকে শুরু করে, খাবারের শেষ পর্যায়ে মিষ্টি ও ফল (ডেসার্ট) সহ কখন কি দিতে হবে সে সম্পর্কে অবশ্যই পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। এসব অনেক যোগ্যতা প্রদর্শন করেই আমি ওয়েটার হতে পেরেছিলাম।

আমার বেশ মনে আছে, ওই সময় আমার কোরিয়ান বন্ধুরা আমাকে নিয়ে বেশ গর্ববোধ করত, কারণ একজন ওয়েটারের গড় বেতন সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকদের চেয়ে তিনগুণ বেশী। যদিও প্রথম দিকে সব কিছু খুব একটা সহজ ছিল না, তবু প্রথম মাসে, এই ব্যবসায়ে জড়িত প্রায় তিরিশ বছরের প্রাচীন একজন ওয়েটারের ঘনিষ্ট তত্ত্বাবধানে রেখে আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে প্রথমে, আমাকে শুধুমাত্র সতর্কভাবে দেখতে ও শিখতে হয়েছিল কিভাবে একজন ওয়েটার তার কাজ করে ।

একদিন, আমার তত্ত্বাবধায়ক ওয়েটার একটা টেবিলে পাঁচজনকে খাবার পরিবেশন করেছিলেন, যারা কিছু সামুদ্রিক খাবার অর্ডার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, তারা মাত্র ৫% টিপস দিয়ে চলে গেল। (উত্তর আমেরিকার প্রচলিত রীতি হচ্ছে, খাবার পরে টেবিল ছেড়ে যাবার আগে কমপক্ষে ১০% টিপস দেওয়া; তবে সাধারণতঃ ১৫% দেবার নিয়মও চালু আছে)। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমার তত্ত্বাবধায়ক এই অতি কম টিপস পাওয়াতে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। তিনি বাইরে বের হয়ে সরু রাস্তায় গিয়ে ওই লোকদের পিছন থেকে গালি-গালাজ, শাপ-শাপান্ত করতে শুরু করেছিলেন। যেহেতু ওই লোকেরা আগেই চলে গিয়েছিল, তাই বড় কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে খারাপ কথাগুলো আর অভিশাপের কথাগুলো যেন বাতাসে ভাসছিল। যাইহোক, আমি কিন্তু আমার তত্ত্বাবধায়কের এই আকস্মিক পরিবর্তিত আচরণের জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এই অতি ভদ্র, ঘষে-মেজে খাঁটি করে তোলা ওয়েটার মুহূর্তের একটা ঘটনায় কেমন অমার্জিত! এই ব্যক্তির দু'টো চেহারা: একটি তার পেশাদার চেহারা এবং অন্যটি তার ব্যক্তিগত বা বলা চলে তার আসল চেহারা।

আমাদের চারপাশে এমন লোক পাওয়া খুব কষ্টকর নয় যার দুটো বা তিনটে বা অনেক রকম চেহারা রয়েছে! এ ধরনের লোকেরা সাধারণতঃ নম্র, সহনশীল এবং লোকদের সামনে বেশ সহানুভূতিসুলভ আচরণ করে থাকে। কিন্তু যদি পরিস্থিতি কোনভাবে নেতিবাচক হয় তাহলে তার চেহারা ভিন্নরকম হয়ে যায়। এ ধরনের লোকেরা অবস্থার প্রেক্ষীতে আপনাকে রাজার মত অথবা ফকিরের মত বিবেচনা করতে পারে। সবটাই তার ব্যক্তি স্বার্থের উপরে নির্ভর করে।

এর আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা মৌখিকভাবে খ্রীষ্টিয় উৎসাহ নিয়ে বেশীরভাগ আলোচনা করেছি। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে, কথা ও কাজ দু'টো আলাদা বিষয়। কথা বলে উৎসাহ দেওয়া এক বিষয়, আবার কাজের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া আর এক বিষয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন যে, কথার মাধ্যমে ৪০ ভাগ আর বাকী ৬০ ভাগ হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দেওয়া যায়। আমি একজন বিশেষজ্ঞের দাবী শুনেছিলাম, যিনি বলেছিলেন যে, আমাদের ৯৩ ভাগ প্রভাব কাজের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়, আমাদের কথায় নয়।

বিশেষজ্ঞেরা আবার এও দাবী করে থাকেন যে, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান যাদের আছে তাদের কাজের সাথে কথার কোন মিল থাকে না এবং অন্যদের পক্ষে তাদের বিশ্বাস করা কঠিন। এর আগে উল্লেখিত প্রাচীন ওয়েটার, যাকে আমি খুব সম্মান করতাম, কিন্তু যখনই তিনি ক্রেতাদের বিপক্ষে অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন, তখনই তিনি আমার কাছ থেকে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিলেন। নিয়মিত খদ্দেরদের সাথে তার মিষ্টি মিষ্টি তোষামোদের কথাগুলোর সাথে ঐ দিনে তার অমর্যাদাপূর্ণ কথার কোন মিল নাই। এরকম লোকদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকে না। তারা কি বলে সেটা কোন বিষয় নয়, কিন্তু আমরা তো কখনও জানতে পারব না তারা কখন তাদের আচরণ বদলে ফেলবে। মিষ্টি কথা বলে তারা তো আমাদের দিয়ে তাদের স্বার্থ বেশ ভালভাবে উদ্ধার করবে, কিন্তু যখন কোন কিছু পছন্দসই হবে না তখন তারা অনায়াসে আমাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবে। অন্য কথায়, তারা হচ্ছে বিপজ্জনক আত্মবিরোধী।

এরকম আত্মবিরোধী লোকদের সামনাসামনি হওয়া কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। এরা এমন লোক যাদের কাজ নাটকীয়ভাবে তাদের কথার চেয়ে ভিন্নধর্মী। এই স্ববিরোধী মনোভাব এক দিকে অসাধুতা এবং অন্য দিকে তাদের মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি করে থাকে। এই অধ্যায়ে, আমি ভিন্ন আঙ্গিকে খ্রীষ্টিয় উৎসাহদানের বিষয়টি আলোচনা করতে ইচ্ছা করছি। কারণ, কথার চেয়ে কাজ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্ব বহন করে; তাই আমি এদিকে দৃষ্টি দিতে চাচ্ছি। আমরা কিভাবে কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদের উৎসাহ দিতে পারি, যেখানে আমাদের কথা ও কাজ একইরকম হবে।

স্পর্শের মাধ্যমে উৎসাহদান

এই অধ্যায়ের শুরুতে বাইবেলের যে পদটি তুলে দেওয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার ভাবে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের প্রভু যীশু মুখে আদেশ করার সাথে সাথে স্পর্শের মাধ্যমে আরোগ্য কাজটি সাধিত করেছেন। যেমন- যীশু একজন কুষ্ঠরোগীকে তাঁর হাত দিয়ে স্পর্শ করেছেন। তিনি তো অনায়াসে শুধু মুখের কথায় এই লোকটাকে সুস্থ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি মূলতঃ লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়েছেন এবং তাকে স্পর্শ করেছেন। যীশুর স্পর্শ মাত্রই তাঁর কাছ থেকে ঐশী আরোগ্যদায়ী শক্তি খুবই কার্যকরভাবে বের হয়ে কুষ্ঠরোগীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, কোন কোন সময় উৎসাহদানের শক্তি আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে খুব ভালভাবে ফুটে ওঠে।

বিগত শতাব্দীতে, কমিউনিষ্ট ব্লকের লোকেরা তাদের কমরেড ঐক্যতার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য অনুরাগের সাথে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে গলায় চুমু দিত। আমি লক্ষ্য করেছি, মুসলমান দেশগুলির লোকেরা একে অন্যের প্রতি খুবই উষ্ণতা ও অনুরাগ প্রদর্শন করে থাকে। একই রকম ভাবে, ল্যাটিন আমেরিকার লোকজন একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করে না। দৈহিক স্পর্শের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভ্রাতৃত্ব ও নিজেদের সাধারণ অভিন্নতাকে পুনঃ নিশ্চিত করে। দৈহিক স্পর্শ বলতে জড়িয়ে ধরা, হাত ধরে ঝাকুনি, চুমু দেওয়া ইত্যাদি বুঝায় এবং এগুলো মুখে বলা কথার শক্তি আরও বৃদ্ধি করে।

কিন্তু মানুষেরা যেখানে একত্রিত হয়, পরিবারের লোকেরা যেখানে একত্রিত হয়, সেখানে দৈহিক অনুরাগের স্পর্শ খুবই প্রয়োজন হয়। একজন স্বামীকে অবশ্যই তার স্ত্রীর প্রতি নম্র, ভদ্র, যত্নশীল হতে হয়। মৃদু স্পর্শ এবং হাসি দিয়ে তার ভালবাসা দেখানো উচিত। একজন তার স্ত্রীকে ভালবাসে- তা কিন্তু শুধু মুখের

কথায় সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। তাকে অবশ্যই অনেকভাবে কাজ করে দেখাতে হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলতে পারে না, 'আমি তোমাকে ভালবাসি', আর পরপরই সশব্দে দরজা আটকে বাইরে চলে যাবে। এরকম ভাবে কথায় ও কাজের মধ্যে অমিল থাকলে তিনি প্রিয় স্বামী হিসাবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবেন।

মার্ক সুসমাচার ১ অধ্যায়ে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে যীশু আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। শিমোনের শাশুড়ীর কাছে গিয়ে যীশু শুধু কথা বলেন নাই, কিন্তু হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করেছিলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ, যীশু তার হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। আমরা আশ্চর্য হই, কারণ যীশু নিজে ঈশ্বর হয়ে তিনি যে শুধু পিতরের শাশুড়ীকে সাথে সাথে সুস্থ করেছেন তা-ই নয়, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি কাজও করে দেখিয়েছেন। কুষ্ঠরোগীর প্রতি তিনি ঠিক একই কাজ করেছিলেন। সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে, মুখে "শুচি হও" বলার আগে যীশু হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে স্পর্শ করেছিলেন।

এরকম আরও কিছু ঘটনা রয়েছে যেখানে যীশু কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে অলৌকিক কাজ করেছেন। মার্ক ৫:৪১ পদে যীশু যায়ীরের মেয়েটির হাত ধরে বলেছিলেন, "টালিথা কুম্" (যার মানে, 'খুকি, তোমাকে বলছি, ওঠো")। এতে ঐ বারো বছরের মেয়েটি অলৌকিক ভাবে মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিল। আবার, মার্ক ৭:৩৩ পদে আমরা দেখি, যীশু একজন বয়রা ও তোত্লা লোককে আরোগ্য করেছিলেন। পবিত্র বাইবেল অনুসারে, যীশু ঐ লোকটিকে ভীড়ের মধ্য থেকে একপাশে নিয়ে গিয়েছিলেন ও তার দুই কানের মধ্যে তাঁর আঙ্গুল দিয়েছিলেন। তারপর তিনি থুথু ফেলে তার জিভ্ ছুঁয়েছিলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "খুলে যাও"। সাথে সাথে লোকটির কান ও জিভ্ খুলে গিয়েছিল এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শুরু করেছিল।

এই ঘটনাগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি, যীশু অসুস্থদের স্পর্শ করা মাত্রই ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ সংঘটিত হয়েছিল। আমরা কি চিন্তা করতে পারি, কেন স্পর্শ দ্বারা তিনি এই অলৌকিক কাজগুলো সাধন করেছিলেন?

আমরা যখন অন্যদের উৎসাহ দেই, তখন আমাদের অন্তর খুলে যায় এবং আমাদের ভেতরের শক্তি বের হয়ে আসে। যখন কথা বলে উৎসাহ দিতে গিয়ে আমরা অন্যদের স্পর্শ করি, তখন এই শক্তি আমাদের ভেতর থেকে বের হয়ে যাকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে তার ভেতরে যায়। তার মানে, এই একই নীতি আমাদের কৃত কাজেও আরোপিত করা যায়। আমি যখন কোন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হাত বাড়িয়ে দেই, তখন সাথে সাথে আমি তার মনের অবস্থা বুঝতে পারি। অনেক সময় আমি এই অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেছি যে, লোকেরা তাদের অন্তর খুলে দিতে চায় না, কারণ কোন সন্দেহ বা উদ্বেগ তাদের খোঁড়া বানিয়ে রেখেছে; তাই তারা আমার হাতের স্পর্শে পুরোপুরি উপকার পায় না। এছাড়া, তারা তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজও সম্পন্ন করতে দেয় না।

তাই, যখন আমি আমার ভাই-বোনদের জন্য প্রার্থনা করি, আমি তাদের প্রায়শই সুপারিশ করি যেন তারা তাদের অন্তর খুলে দেয়, সমস্ত উদ্বেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ও মনকে হালকা করে। একজন ব্যক্তি যদি সরলভাবে তার অন্তরের দরজা খুলে না দেয়, তাহলে পবিত্র আত্মা যে সেখানে কাজ করবে তা আমরা কিভাবে আশা করতে পারি ? যারা বেশী বুদ্ধিমান, দার্শনিক মনোভাবের অথবা খুঁতখুঁতে তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটে! পবিত্র আত্মা সহজে তাদের মধ্যে কাজ করতে পারে না। আবার ঠিক এর বিপরীতে, একজন সচেতন ব্যক্তি, যে নাকি অনুভূতির সাথে একই সুর ও তালে সমন্বিত, সে সাথে সাথে তার কাজে পবিত্র আত্মার আগুনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এরকম লোকেরাই হচ্ছে, "অন্তরে যারা গরীব", আর "স্বর্গ রাজ্য তাদেরই"। তারা যখন কাঁদে বা কাঁপে ও স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলে তখন আমরা তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার প্রভাব দেখতে পাই।

হস্তার্পণের ফল লাভ করতে হলে একজন লোকের দু'টি বিষয়ের প্রয়োজন হবে। প্রথমতঃ তাকে নম্র হতে হবে এবং সমস্যা সমাধান হবেই এমন আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। আবার, একটি নির্দিষ্ট পবিত্র আত্মার দান পাবার জন্য তিনি অনুরোধ করতে পারেন। এছাড়া, আরও একটি মূল বিষয় হচ্ছে বিশ্বাস। যিনি হস্তার্পণ করেন, তার উপরে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে এবং ভাবতে হবে, 'এই ব্যক্তি সর্বশক্তিমানের সেবক;

নিশ্চয়ই তার হস্তার্পণের ফলে আমার সমস্যার সমাধান হবে।' বিশ্বাস হচ্ছে এমন একটি পদার্থের মত, যা উৎসাহদানকারীর এবং উৎসাহিত হতে চাওয়া ব্যক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করে। বিশ্বাস দু'জনের মধ্যে থাকা সীমানার বেড়া খুলে দেয় এবং একটা সেতু স্থাপন করে।

যখন বিশ্বাসে হস্তার্পণ কাজ সাধিত হয় তখন উৎসাহদানকারীর কাছ থেকে উৎসাহ প্রাপ্ত লোক যে কোন বা অনেক আত্মিক দানও পেতে পারে। যেমন- জ্ঞানের কথা, বুদ্ধির কথা, বিশ্বাস, রোগ ভাল করবার ক্ষমতা, আশ্চর্য কাজ করবার ক্ষমতা, নবী হিসাবে ঈশ্বরের বাক্য বলবার ক্ষমতা, ভাল ও মন্দ আত্মাদের চিনে নেবার ক্ষমতা, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা ও বিভিন্ন ভাষার মানে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কারণ দু'টি পক্ষের মধ্যেই এক আত্মিক যোগাযোগ হয়। এখানে যে হস্তার্পণ করছে, তার জন্য এই কাজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে অনেক লোকই ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হিসাবে দাবী করে থাকে, কিন্তু বেশ অনেক সংখ্যক পালক আছেন যাদের চরিত্রগত সমস্যা রয়েছে। গীর্জায় যাতায়াতকারী হিসাবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা কোন মতেই তাদের সাথে আত্মিক সংস্পর্শ না রাখি। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, যেন আমরা তাদের দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ না করি এবং তাদের হস্তার্পণও গ্রহণ না করি। তাদের নেতিবাচক আত্মিকতা গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। সেজন্য, কোন হস্তার্পণ গ্রহণ করার আগে আমাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আমরা সতর্কভাবে ঐ ব্যক্তির আত্মিক অবস্থা, মানসিকতা এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করে দেখব, যিনি সত্যি আমাদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হতে পারেন। এছাড়া, হস্তার্পণ কাজটি অবশ্যই একজন পরিচর্যাকারীর একচেটিয়া অধিকার নয়। একজন গর্ভবতী মহিলা তার গর্ভে থাকা সন্তানের জন্য তার পেটে হাত দিয়ে আশীর্বাদ যাচঞা করতে পারেন। এই আশীর্বাদ কখনই বিফলে যাবে না। এই আশীর্বাদ ঐ সন্তানের জন্য সারাটি জীবনব্যাপী টিকে থাকবে।

একটি শিশু তার মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে একজন চমৎকার পূর্ণবয়স্ক ও বিশিষ্ট লোক হতে পারে। কারণ শিশুর গড়ে ওঠা জন্মগ্রহণ করলেই শেষ হয়না (বরং তা আরম্ভ মাত্র); এ ক্ষেত্রে মায়ের আত্মিক অবস্থা ঐ শিশুর শিশুকাল থেকে বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত সরাসরি প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে, মায়ের ভাল বা মন্দ চারিত্রিক ও আত্মিক গুণাগুণের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য, মায়ের উচিত তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিশ্বস্তভাবে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত রাখা। আপনার সন্তানদের ভালভাবে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে: আপনি প্রতিদিন সকালে সন্তানকে জড়িয়ে ধরে আদর করবেন! মা ও বাবা, উভয়ের জন্যই এই উপদেশ; এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

এই কাজটি আমি ও আমার স্ত্রী করেছি। প্রতিদিন সকালে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাবার আগে আমরা তাদের জড়িয়ে ধরেছি এবং সংক্ষেপে প্রার্থনা করেছি। প্রতিদিন দুপুরে, যখন তারা স্কুল থেকে ফিরে আসত, তাদের মা আবার তাদের জড়িয়ে ধরে আদর করতেন। এছাড়া, আমি সব পিতা-মাতাকে অনুরোধ করতে চাচ্ছি যেন তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় বিশেষ সতর্ক থাকেন এবং তাদের প্রতি মনোযোগ দেন। তাদের কাছে মাত্র একটা অসতর্ক কথা বললে তা ভীষণ ক্ষতিকারক হতে পারে। 'আপনি ব্যস্ত', এ কথাটি একটা অযুহাত মাত্র। আমি এখানে একটা ইঙ্গিত দিতে চাই। যেহেতু, প্রায়ই আমরা মন্দভাবে কথা বলে থাকি, সেজন্য একটা ভাল বুদ্ধি হচ্ছে, কোন কথা না বলে শুধুমাত্র তাদের আদর করে জড়িয়ে ধরা। আপনি যখন দেখবেন, তারা তাদের ঘরে বসে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে; ভাল বা মন্দ কোন সমালোচনা করার আগে একটু সময় নিয়ে তাদের পিঠ চাপড়ে দিন। বিশেষ করে ঘুমাবার সময়, একেবারে শেষ মুহূর্তে তাদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করুন, তাহলে আপনার প্রার্থনা ঘুমের মধ্যেও তাদের কানে বাজতে থাকবে।

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমার মা আমার ঘুমাবার সময় প্রার্থনা করতেন। তারই ভালবাসায় আমি বড় হয়ে উঠেছি এবং এজন্যই আজকের আমি এ রকমটি হতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমার মায়ের প্রার্থনা আমার এই ভবিষ্যত পালকীয় জীবনকে ঘিরে রেখেছে, আর আমার বোনের ভবিষ্যতকে ঘিরে রয়েছে তার পরিচর্যাকারী স্বামীর প্রার্থনা।

আমরা যদি কাউকে সম্মান, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দেখাতে চাই, তাহলে কখনও বা খুবই সাধারণভাবে সেকহ্যান্ড করাটাও আশীর্বাদের কারণ হতে পারে। তা না হলে তো এরকম শুভেচ্ছাও গতানুগতিক হয়ে যাবে।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের অনেক উপায় আছে। একজন মিষ্টি হাসি দিয়ে প্রশংসাসূচক কথা বলে, আবার কেউবা ঋজুভাবে হাতে চাপ দিয়ে সম্মান দেখায়।

হাসপাতালে গিয়ে আমরা ঠিক এমনটি করতে পারি। অনেক হাসপাতালের বন্ধ দরজাগুলো আমাদের মত একজন পরিদর্শনকারীর সাহচর্য প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কারণ হাসপাতালে এমন অনেকেই থাকে, যারা অবর্ণনীয় কষ্ট ও একাকীত্বে সময় পার করে। অনেক রোগী আছে যাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে। পালক হিসাবে আমি যখন রোগীদের বিছানার পাশে যাই, তখন আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করার সময় তাদের হাত চেপে ধরি। যদি তাদের হাত ধরতে না পারি, তাদের পা চেপে ধরে প্রার্থনা করি। কখনও বা আমি তাদের ক্ষতস্থানে হাত রাখি, যেন আমার আরোগ্যদায়ী শক্তি তাদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। এ রকম সময়ে রোগী যীশুর ভালবাসার উষ্ণ স্পর্শ এবং আমার ভেতরে থাকা আত্মার আরোগ্যদায়ী শক্তি খোলামেলা অনুভব করে। আবার, যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে যাই, তখনও আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারের লোকদের বার বার সান্ত্বনার কথা না বলে আরও অনেক কিছুই করতে পারি। আমরা তো তাদের জড়িয়ে ধরতে পারি, তাদের সাথে সাথে কাঁদতেও পারি। আমার প্রতিবেশীদের সান্ত্বনা দিতে আমি এমনই করে থাকি। কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদের উৎসাহ দেওয়ার কাজটিকে আমি প্রথম উপায় বলে মনে করি।

শোনার মাধ্যমে উৎসাহদান

কাজের মধ্য দিয়ে অন্যদের উৎসাহ দেবার জন্য খুব মনোযোগী এবং ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে পারাটা আরও একটি উপায়। বেশী বেশী কথা বললেই আমরা বেশী উৎসাহ দিচ্ছি, এটা ভাবাও একটা ভুল ধারণা। আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা খুব একটা সত্যি নাও হতে পারে। অবস্থার প্রেক্ষিতেই একজন শ্রোতা অনেক বেশী করে উৎসাহ পেতে পারে।

যাকোব **১:১৯** পদ এ কথা বলছে যে, "তোমরা প্রত্যেকে শুনবার জন্য আগ্রহী হও, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে কথা বলতে যেয়ো না বা রাগ কোরো না।" যাহোক, আমাদের তো বলার জন্য একটি মুখ আর শোনার জন্য দু'টি কান আছে, তাই না? খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের জন্য পরামর্শ, আমাদের উচিত দ্রুততার সাথে অন্যদের জন্য একটি কান খোলা রাখা এবং কথা বলার আগে দু'বার করে চিন্তা করা। বিশেষতঃ গর্ব করতে অথবা নেতিবাচক কথা বলতে চেষ্টা না করাটাই আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

অনেক সময় আমরা এমন লোকের সামনে পড়ে যাই, যারা কখনই 'ন্যায় সঙ্গতভাবে' কথা বলে না। এ ধরনের লোকেরা অন্যদের আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না; বিশেষ নির্দিষ্ট অবস্থা তুচ্ছ করে, পারিপার্শ্বিকতা ভুলে যায় এবং তাদের নিজেদের গল্প বলতেই ব্যস্ত হয়ে থাকে। এটা তো 'যথাযথ' কথা বলা প্রমাণ করে না। আগের অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি, যা আসলে শ্রোতাদের কানে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দেওয়ার সামিল বলা যায়। এই 'অযথা' বাক্যবাগীশদের জন্য কি দরকার? তাদের দরকার ভাল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সাথে জড়িত থেকে প্রজ্ঞায় পরিচালিত হওয়া। এভাবেই তাদের জীবনকে প্রতিফলিত করা উচিত। এতে আমাদের বলার তেমন কোন কিছু থাকবে না। আমরা নিশ্চয়ই এটাও চাই না যে একজন শুধু কথা বলতে থাকুক; যদিও তা শুনতে কেউ পছন্দ করে না। এভাবে আমরা নিজেদের বিহ্বল করতেও চাইব না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও আমাদের যদি এরকম অভ্যাস থেকে থাকে, তবে আমাদের কষ্ট হলেও উচিত প্রভুর চরণে তা সমর্পণ করা এবং আমাদের এরকম আচরণের পরির্বতন করার জন্য ও জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। অন্যথায় আমাদের এই ধরনের বলা কথাবার্তার জন্য আমাদের চারপাশের লোকেরা অস্বস্তি বোধ করবে।

অন্যদিকে, অন্যদের কথা শোনা অভ্যাস করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেকেই কথা বলতে এতই অভ্যস্ত যে, কারও কথা শোনা একেবারে অনভ্যস্ত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার স্ত্রী যেমন আমাকে বলে: 'তুমি লোকদের কথা মোটেও শুনতে চাও না; তুমি খালি শিক্ষা দিতেই চাও।' এ বিষয়ে আমি সত্যি দোষী, আর তাই আমি ঈশ্বরের নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করি। আমি জানি, আমি এমন একজন লোক যে কথা শোনার চেয়ে কথা বেশী বলে থাকি। তাই আমি বক্তৃতা দেবার চেয়ে শ্রোতা হতে প্রাণপণ চেষ্টা করি।

আমি একবার জো বেইলি নামে একজন আমেরিকান লেখকের লেখা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, যিনি একটা ভীষণ দুঃখজনক গাড়ী একসিডেন্টে তার তিন সন্তান হারানোর ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বইটিতে বেইলি তার ছেলেদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সকলেই একের পর এক সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে; প্রায় কয়েক'শ দর্শনার্থী বেইলির কাছে এসে সহানুভূতির কথা বলছে, বলছে আশ্বাস বাণী। কিন্তু তিনি নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র একজনের কথায় শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। একজন ভদ্রলোক তার কাছে এসে কোন কথা না বলে শুধু তার হাত টেনে ধরে তার সাথে প্রার্থনা করেছিলেন। এই একটি কাজে জো এত বেশী উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, তিনি ঐ আগন্তুককে বাকী অনুষ্ঠানে সব সময় তার পাশে দাঁড়াতে বলেছিলেন। শত শত দর্শনার্থীর মুখে বলা কথাগুলো শুধুমাত্র জো'র মধ্যে বোঝার মত চেপে বসেছিল। কিন্তু এই একজন আগন্তুক জো'র কাছে এসে তার হাত দু'টি ধরেছিলেন। আসলে তিনি কাজের মধ্য দিয়ে জো বেইলিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের কথা চিন্তা করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, অনেক অনেক কথা বলা সব সময় কার্যকরভাবে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিতে পারে না।

একজন আদর্শ শ্রোতার আচার-আচরণ সম্পর্কে আমি আপনাকে আরও কিছু বলছি। যেমন- আপনি জানেন, এই মুহূর্তে আপনি একজন শ্রোতার ভূমিকায়; এখন আমার কথা শুনছেন। প্রথমতঃ যোগাযোগ যখন মুখে মুখে ও ব্যক্তিগত, তখন চোখে চোখে দৃষ্টি রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমরা কথা বলি, তখন অনেক লোক মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে এবং অনেকে আবার চোখ বন্ধ করে রাখে। এ ধরনের আচরণ বক্তার উদ্যমী মনোভাব নষ্ট করে দেয় এবং নিরুৎসাহিত করে (বক্তার জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকা রূঢ় ও বাজে অভ্যাস)। কারণ, আগেই আমার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে; যে কথা বলে তার দিকে মনোযোগী হতে আমি শিখেছি। এখন আমি যে কোন আলাপে অনায়াসে শ্রোতার কথায় মনোযোগী হতে পারি। এটা আশা করা ঠিক নয় যে, আমরা বক্তার সব কথাই বুঝতে পারব। কিন্তু আশা করা যেতে পারে, আমরা মনোযোগ দেব এবং চেষ্টা করব যেন বক্তা নিরুৎসাহিত না হন। একজন শ্রোতা হিসাবে বক্তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকানোর বিষয়ে আমাকে নিশ্চিত হতে হবে, যেন তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় যে আমি তার কথা শুনছি। তাহলে, আমি তো তার কৌতুক শুনে হাসতে পারব এবং তার হাসির কথা শুনে হাসতেও পারব।

এসবই ভাসা ভাসা মনে হতে পারে, তবু তা অপ্রতিরোধ্য এবং নীরবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য খুবই শক্তিশালী ব্যবস্থা। এর গুরুত্ব কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। আপনি যখন অন্যদের কথা শোনেন, তখন নিশ্চিতভাবে তাদের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। এই সময়টা কিন্তু তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে হবে না অথবা এক পাশে তাকিয়ে থাকলেও হবে না। আশেপাশে লোকজন চলাফেরা করলে সেদিকে মনোযোগী হবেন না; তা করলে আপনি বক্তাকে সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত করছেন। তার দিকে পুরো মনোযোগ দিন। এভাবে কিন্তু বক্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও হয়।

এ কারণেই শোনার প্রতি মনোনিবেশ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শোনার ব্যাপারে যদি আমাদের খারাপ আচরণ প্রকাশ পায়, তাহলে আমাদের ছেলে-মেয়েরাও আমাদের নকল করবে। তার ফলে, পরবর্তীতে তারাও এই নেতিবাচক অভ্যাসের কবলে সমস্যাগ্রস্ত হবে। একটি ঐক্যতান সদৃশ পরিবার তৈরীতে পিতা-মাতাকেও ভাল শ্রোতা হতে হয়, আর ছেলে-মেয়েরাও ভাল উৎসাহদাতা হয়ে উঠতে পারে।

বাবা হিসাবে আমি নিশ্চিত হতে চাই, আমার ছেলে-মেয়েরা গীর্জাতে গিয়ে সঠিক আচরণ করছে। যদিও তারা মনোযোগী, তবু আমি তাদের অনুরোধ করি যেন তারা শান্তভাবে থাকে, সঠিকভাবে বসে এবং পালকের দিকে চোখ রাখে। আমি তাদের আরও বলি, যদি প্রচার ভাল না লাগে তাও যেন তারা বিরক্তি প্রকাশ না করে বা ভ্রূকুটি না করে। প্রচারক বিরক্ত হতে পারে এমন কিছুই অনুমোদনযোগ্য নয়, কারণ তা আমাদের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের পরিপন্থী। এ ধরনের খারাপ আচরণ দিয়ে আমরা অন্যকে নিরাশ করতে পারি।

আমি যখন নিজে প্রচার করি, তখন আমার সামনে বসা দর্শকদের আমি লক্ষ্য করার সুযোগ পাই। আমি তাদের মধ্যে বেশ বৈচিত্র দেখতে পাই! কাউকে দেখি বেশ উৎফুল্ল, কেউবা বেশ ভাব-গম্ভীর। আবার অনেকে অপেক্ষায় রয়েছে কত তাড়াতাড়ি প্রচার শেষ হবে। এমন কিছু মুখও আমি দেখি, যারা বলে- 'প্রভু,

আজকের বলা কথায় কি শোনা ও বোঝা দরকার, তা তুমি বলে দাও।' আপনার চোখের মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনার আচার-আচরণ প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন যেন আমরা সব দিক দিয়ে উৎসাহদাতা হই। তাই, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের দেহের অংগ-ভংগী নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আবার বলছি, একটি উপাসনাদলের অংশ হিসাবে আমাদের অবশ্যই বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। আমি এও লক্ষ্য করেছি, আমার প্রচারের সময় অনেকে নোট নিয়ে থাকে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে একথা আমি বলতে পারি, একজন বক্তার জন্য তা সত্যিই উৎসাহজনক। কল্পনা করুন, আপনার বলা প্রত্যেকটি কথা একজন নোট করে নিচ্ছে। একজন বক্তা হিসাবে আপনি বেশ শক্তি অনুভব করবেন, যখন দেখবেন যে উপাসনার সময় আপনার বলা কথা বেশ গুরুত্ব দিয়ে কেউ একজন নোট করছে। এমন একটি উদাহরণ আমরা তো সহজে অনুসরণ করতে পারি। একটা কলম আপনার সাথে রাখুন এবং যখনই কোন সভা-সমিতি বা বাইবেল স্টাডি দলে যোগ দেবেন তখনই আলোচনা নোট করে নিতে পারেন। এভাবে বক্তার উপরে আপনি এক বিস্ময়কর ছাপ রাখতে সক্ষম হবেন, যিনি আপনার প্রচেষ্টার জন্য খুবই প্রশংসা করবেন। ঠিক তার উল্টোটিও ঘটে, যদি কোন ব্যক্তি তার হাত দু'টো ভাঁজ করে বক্তার দিকে ভ্রুকুটি করে তাকায়, তাহলে কেউই তাকে পছন্দ করবে না। আপনার ছেলে-মেয়েদের এটি শিখতে সুযোগ করে দিন।

সব রকম অবস্থায় আদর্শ উৎসাহদানকারী হতে আমাদের সব সময় সচেষ্ট হওয়া উচিত, যেন আমাদের সন্তানেরা উত্তরাধিকার সূত্রে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। আমাদের কচি কচি ছেলে-মেয়েদের পরিণত বয়স্ক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের খুবই চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ ছেলে-মেয়েদের বুঝবার ভাল জ্ঞান থাকে না, তাই তাদের সব কিছুর প্রতি ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের দৈহিক আচার-আচরণও এর বাইরে নয়।

অনেক সময়, কম সংখ্যক হলেও অনেকে প্রচারের সময় পত্রিকা পড়ে। আমি কাউকে কাউকে ছবি আঁকতে, গান বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে বা অন্য কোন বই নাড়াচাড়া করতে দেখি। আমার সন্তানেরা গীর্জায় এসে যখন এমন বিক্ষিপ্ত আচরণ করে, পত্র-পত্রিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে অথবা এদিক সেদিক তাকায়, তখন আমি তাদের ছোট্ট করে একটা চিমটি দেই। তারা সাথে সাথে বুঝে ফেলে যে, এতে আমার সম্মতি নাই; তখুনি তারা বক্তার দিকে মনোযোগী হয়।

মায়েদের জন্য একটা পরামর্শ দিচ্ছি। আমি মনে করি, উপাসনা চলা কালে গীর্জাঘরে কচি শিশুদের নিয়ে আসা যথাযথ নয়। কচি শিশুদের দেখাশোনার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকা দরকার, প্রয়োজন অনুসারে সেখানে তাদের দেখাশোনা করা যেতে পারে। উপাসনার সময় কাউকে গীর্জাঘরের মধ্য দিয়ে হাঁটা চলা করতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তা অন্যদের মনোযোগী হতে বাধা সৃষ্টি করে। যদি কেউ এরকম বিরক্তি প্রকাশ করে ও উপাসনার পবিত্রতা নষ্ট করে, তা অবশ্যই অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে না। অনেক মা তাদের বাচ্চার কান্না সহ্য করে থাকে, কারণ সেটাই স্বাভাবিক। বাচ্চা শিশুরা কাঁদবেই, কিন্তু তার মানে উপাসনার সময় এরকম কান্নাকাটি গ্রহণযোগ্য নয়। এই মায়েদের আমি সোজাসুজি দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মনে করি।

গীর্জায় গেলে বেশ কিছু মৌলিক ভদ্রতা-শিষ্টতা অবশ্য পালনীয়। প্রার্থনা ও প্রচারের সময় চুপ করে থাকা এগুলোর মধ্যে একটি। উপাসনার সময় কোন ক্রমে অসতর্কভাবে শব্দ করা বা জোরে জোরে কথা বলা ভদ্রতা নয় এবং উৎসাহজনকও নয়। একটি বিষয় অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, এ ধরনের আচরণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এতে ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান জানানো হয়। দ্বিতীয়তঃ এরকম আচরণ বাদ দিতে হবে, কারণ তা যেমন বক্তাকে বিরক্ত করে, তেমনি অন্য শ্রোতারাও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এরকম বিষয় নিয়ে উৎসাহ দেবার বদলে বরং ঠিক তার উল্টো বিষয়, অর্থাৎ অনুৎসাহিত করা হয়।

আমি এখন আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। মাঝে মাঝে আমাকে বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়, ঠিক যেমন সারা পৃথিবীতে অধিকাংশ পালকদের করতে হয়। কিন্তু সরলভাবে বলি, কোন কোন বিয়ের অনুষ্ঠান বাজারের হৈ চৈ এর চেয়েও বেশী হট্টগোলপূর্ণ হয়। এতে মনে হয়, কিছু লোক বিয়েতে আসে ঠিক

বিবাহিত দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে নয়; বরং না আসলে তাদের সামাজিক সম্মান থাকবে না এই ভয়ে, অথবা দম্পতিকে কিছু উপহার দিয়ে ঐ পরিবারের সাথে একটা ভাসা ভাসা সম্পর্ক ধরে রাখার জন্য হতে পারে। এ ধরনের আচরণ ও সরলতার অভাব আসলে এসব উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো হট্টগোলে পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। আমি দেখেছি, বিয়ের অনুষ্ঠানে বাচ্চারা কান্না-কাটি করছে, লোকেরা একে অন্যের সাথে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু আমি এরকম অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে একেবারে কড়াকড়ি শর্ত দেই। অল্প কিছুদিন আগে, একটা হোটেলে আমি একটি বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলাম এবং সেখানে, প্রথমেই আমি শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিয়ের মত পবিত্র অনুষ্ঠান ভাব-গম্ভীর পরিবেশে পালন করতে উপদেশ দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু করি। আমি অনুরোধ করেছিলাম যেন তারা সব দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়, লোকদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ করে এবং বাচ্চাদের শান্ত করে রাখে। এর ফলে আমি এই বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলো যথাযথভাবে এবং সম্মানের সাথে বলতে ও বলাতে সমর্থ হয়েছি।

বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি যে, উৎসাহদাতার গ্রহণযোগ্যতা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে বিষয় আগে আলোচনা করেছি, তা হল: স্পর্শের মধ্য দিয়ে প্রথমতঃ উৎসাহ দেওয়ার কাজটি করতে পারি এবং দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে শোনার মধ্য দিয়েও আমরা উৎসাহ দেওয়ার কাজটি করতে পারি।

আতিথেয়তার মাধ্যমে উৎসাহদান

স্পর্শ এবং শ্রবণ ছাড়াও তৃতীয় আর একটি উৎসাহ দেবার উপায় হচ্ছে আতিথেয়তার কাজ। আমাদের কাছে আসা অতিথিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও আলোচনা এক রকম উৎসাহ দেবার পদ্ধতি। অন্য কথায়, আমরা বলি আতিথেয়তা করা। বিশেষ করে, "কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে একে অন্যকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ" করা (১ পিতর ৪:৯ পদ)।

পবিত্র বাইবেল আতিথেয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। এই গুণটি একজন তত্ত্বাবধায়কের (পরিচারক বা প্রাচীন) অবশ্যই থাকতে হবে (১ তীমথিয় ৩:২ পদ)। মণ্ডলীতে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিদের বাড়ীর দরজা অতিথিদের জন্য সব সময় খোলা থাকা উচিত। এমন কি অজানা-অচেনা হলেও, অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে পরিবারগতভাবে আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদের এক কাপ চা দিলে তারা অনুভব করতে পারবে যে, আপনি তাদের ভালভাবে গ্রহণ করেছেন। কারণ আতিথেয়তা এমন একটি বিশেষ উপায় যা আমাদের একে অন্যের মাঝে থাকা যে কোন বাধার প্রাচীর সরিয়ে দিতে পারে।

প্রায় এক যুগেরও বেশী সময় ধরে আমাদের মণ্ডলী এবং সেমিনারিতে কোরিয়ায় প্রবাসী শ্রমিকদের স্পনসর করে আসছে। আমরা তাদের খাবার দেই, থাকার জায়গা দেই এবং আত্মিক শিক্ষা দেই, তবে কোন কিছুর বিনিময়ে নয়।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের সাথে গড়ে দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত থাকে। প্রতিদিন তাদের সাথে থেকে তাদের শিক্ষা দেওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয়। আমাদের মধ্যে নানা সমস্যা দেখা যায়। কারণ তারা তো আমাদের অতিথি এবং তাদের রয়েছে নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ। তাই আমাদের কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। যদিও আমরা তাদের বিনা পয়সায় সেবা করে থাকি, তবুও কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রী নালিশ করতে পছন্দ করে। আমাদের কর্মচারীদেরও শিখতে হয়েছে, কিভাবে দানশীলতার মনোভাব ধরে রাখতে হয় এবং দ্বিতীয় কোন চিন্তা না করে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। সব শেষে, যখন তারা পাশ করে তখন সব ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাদের সদাশয় আচরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা অনেকে চোখের জলে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে আসে।

আর ঠিক এমন একটি স্থানে পৌঁছাতে আমাদের কর্মচারীদের সকলকেই কোন কিছুর প্রত্যাশা না করে, এমন কি ধন্যবাদেরও আশা না করে তাদের সময় এবং শ্রম দিতে হয়েছে। এই সদাশয় আচরণ শুধুই সদাশয়তা, যেখানে প্রাপকের কোন মূল্যই ধরা হয় না। তারপরও, আমরা আমাদের আতিথেয়তা করে যাই এবং একথা মনে করি যে, কিছু দেওয়া মানে অন্যদের উৎসাহিত করা ও তাদের সান্ত্বনা দান করা। যারা অতিথি সেবা করে তাদের জন্য অসংখ্য আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞার কথা পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে।

আমি যখন আমাদের এই পরিচর্যা ক্ষেত্রের দিকে ফিরে তাকাই তখন দেখি যে, অসংখ্য অতিথিদের দান ছাড়া অন্য কোনভাবে এই এমি বাইবেল কলেজ টিকে থাকতে পারত না। বিগত সাতটি বছর ধরে অনেক ব্যক্তির আর্থিক এবং আত্মিক সাহায্য এই কলেজকে গেঁথে তুলতে সাহায্য করেছে।

আমি তাদের প্রতি চির-কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের এই দালান গেঁথে তুলতে তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। কারণ এই কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। যারা তাদের রান্নার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, খাবার-দাবার ও কাপড়-চোপড় দিয়ে স্কুলকে সাহায্য করেছে, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি অবশ্য তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করছে এবং যারা তাদের দানের অংশবিশেষ আমাদের পরিচর্যাকাজের জন্য দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, আমার মন্ডলীর ভাই-বোনদের সহযোগিতা ছাড়া কিছুই টিকে থাকতে পারত না। যে পুলপিটে দাঁড়িয়ে আমি প্রচার করি তা একজন প্রাচীন দান করেছেন। পিয়ানোটিও একজন বিশ্বস্ত পরিচারক দিয়েছেন। আমাদের কলেজের প্রভাষকেরা পেশাদার ভাবে কাজ করেন, কিন্তু তেমন কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না।

তারপরেও, আর্থিক লাভ ছাড়া যারা তাদের সময় দিচ্ছেন, যেমন- কেউ স্বেচ্ছায় এসে তাদের রান্নার দক্ষতা দিয়ে সাহায্য করছেন, শ্রমিকের কাজ করে সাহায্য করছেন অথবা শিক্ষকতা করছেন। এ সবই তো সহজ-সরল ও অকপট বদান্যতা। দানশীল খ্রীষ্টিয়ান হৃদয়ের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত তাদের কাজের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। আমার এই ভাই-বোনেরা এত বছর ধরে যে বদান্যতা প্রদর্শন করেছে তার তালিকা তৈরী করা আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু আমি শুধুমাত্র উদাহরণ হিসাবে এগুলো উল্লেখ করছি।

কিছুদিন আগে, আমাদের স্কুলের অতিথি প্রভাষক, নাইজিরিয়া থেকে আগত পাস্টর যশূয়া আমাদের মন্ডলীর একজন তরুণের কথা বললেন। এই তরুণ তাকে যে কোনভাবে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তরুণটি এখন তার ডান হাত সদৃশ, তার সত্যিকারের একজন উৎসাহদাতা। এখন তিনি ঈশ্বরের দেওয়া সব দায়িত্ব পালন করতে আরও শক্তিশালী বোধ করছেন। আমি বিশ্বাস করি, ঐ তরুণের ভাল কাজগুলোর জন্য ঈশ্বর তার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রেখেছেন।

এছাড়াও, যতবার চার্চে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হয়েছে, আমি দেখতে পেয়েছি যে, তরুণেরা পরিশ্রম সহকারে অনুষ্ঠানের ছবি তুলছে এবং পরে ঐসব ছবি দেয়ালে টাংগিয়ে দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের ভাল কাজের জন্য প্রশংসা না করে পারি না। এদের কেউ কেউ নতুন বিশ্বাসী এবং কেউ হয়তোবা আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। তারপরও, তারা এতটুকু প্রতিবাদ না করে মন্ডলীর জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এটা আমার চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের দাতাদের এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ধন্যবাদ, কারণ এ পর্যন্ত পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী আমাদের স্কুল থেকে ডিগ্রী লাভ করেছে এবং তারা পৃথিবীর অনেক স্থানে মিশনারি এবং পালক হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এখন আমাদের এমি বাইবেল কলেজে বারোটি দেশের প্রায় ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার সদিচ্ছা নিয়ে পড়াশোনা করছে।

এই সবই সম্ভব হয়েছে মাত্র গুটি কতক লোকের আত্মত্যাগের ফলে, যেন অনেক লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্বাদ পেতে পারে। যেসব লোক তাদের অর্থ, সময়, ত্যাগের বিনিময়ে এই কাজগুলো করছে, তারা তো ঈশ্বরের কাজের জন্য এক একজন উৎসাহদানকারী। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের আমি উৎসাহ দিতে চাচ্ছি, যেন তারা শুধু সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিত থাকতে পেরেই সন্তুষ্ট না হন, কিন্তু অন্যদের জন্য কিছু করেন এবং সাধ্যমত সক্রিয় সাহায্য করেন।

মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার মাধ্যমে উৎসাহদান

চতুর্থ ধরনের উৎসাহ দেবার কার্যকর উপায় হচ্ছে, অন্যদের ভাল করতে ঈশ্বরের কাছে বিনতি প্রার্থনা করা। আমাদের মন্ডলীতে নিয়মিত প্রার্থনা সভা হয়, যেখানে আমরা একসাথে নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি ও সেই সাথে অন্যদের মঙ্গলের জন্যও প্রার্থনা করি। অন্যদের জন্য বিনতি প্রার্থনা করা খ্রীষ্টিয়ান জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু আমাদের জীবনে আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্যও আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। আমরা আমাদের জন্য এককভাবে প্রার্থনা করতে পারি, কিন্তু দলবদ্ধভাবে একসাথে বিনতি প্রার্থনা করার মধ্যে উপকারিতা রয়েছে। আমরা একসাথে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে প্রার্থনা করতে পারি এবং আমাদের আত্মিক শক্তিকে একত্র করতে পারি। অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে- এ রকম প্রার্থনায় আমাদের শক্তি কোনভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এর উল্টোটাও হতে পারে। তবে আমরা বিশ্বাসে পরিপক্ক এমন খ্রীষ্টিয়ানদেরও দেখি, যারা অন্যদের জন্য নিয়মিত বিনতি প্রার্থনা করতে সমবেত হয়।

আমরা কেন ছোট ছোট দলে একত্র হই? এর অন্যতম কারণ, আমরা একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করতে পারি, কারণ আমরা জানি যে, অন্যের জন্য বিনতি প্রার্থনা একে অন্যকে শক্তিশালী করে তোলে। আপনার নিজের দু'টি হাত একত্র করে প্রার্থনা করার চেয়ে অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা হচ্ছে- যখন খ্রীষ্টিয়ান ভাই ও বোনেরা একে অন্যের হাত ধরে, একে অন্যের প্রার্থনার বিষয় নিয়ে বিনতি প্রার্থনা করে এবং একে অন্যকে উৎসাহিত করে।

আমি সাধারণতঃ প্রতিদিন সকালের প্রার্থনায় লোকের উপস্থিতি প্রয়োজন বোধ করি না। তবুও আমি সুপারিশ করি, আপনারা সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে একবার কি দু'বার সকালের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আপনার অংশগ্রহণ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করবে এবং শক্তি যোগাবে। আপনাকে দেখে আপনার খ্রীষ্টিয়ান ভাই-বোনেরা খুশীও হবে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমি জানি আমার মণ্ডলীতে কোন কোন সদস্য-সদস্যা প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে ইতস্তত করে থাকে। তারা বলে যে, তারা নিজে নিজে প্রার্থনা করতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একজন অবশ্যই তার নিজের ঘরে ঢুকে পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে প্রার্থনা করতে পারে, যেখানে ঈশ্বর একমাত্র শ্রোতা। কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, একত্রে প্রার্থনায় অংশ নিলে আমরা অন্য বিশ্বাসীদেরও শক্তি যোগাতে পারি। একবার কল্পনা করে দেখুন, ভাই-বোনেরা এক সাথে প্রার্থনা সভায় যোগ দিচ্ছে দেখে একটি ছোট দলের নেতা কতই না খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অন্যদের উৎসাহ দেবার জন্য ও শক্তি যুগিয়ে দেবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। অতি দুঃখের বিষয়, আজকের যুগের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের কঠিন প্রভাবে আমরা অনেকেই অন্যদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ না করে শুধুমাত্র নিজেদের প্রতিই দৃষ্টি রাখি। তা সত্ত্বেও, আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা অন্যদের উৎসাহ দেবার মধ্য দিয়ে সত্যিই একটি চমৎকার সমাজ গঠনে সচেষ্ট হতে পারি।

একথা মনে রাখবেন যে, প্রতি রবিবারে উপাসনা প্রস্তুত করতে কিছু লোক তাদের সময় ও চেষ্টাকে কাজে লাগায়। আমরা হয়তো তাদের অঙ্গীকার, তাদের সদাশয়তা এবং আত্মত্যাগী মনোভাব প্রথমে দেখতে পাই না; তবে তাদের চেষ্টার ফল দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, এমন একটি চমৎকার উপাসনা পরিচালনা, যা সত্যি ঈশ্বরের চোখে নিখুঁত। এ রকম উপাসনায় যোগদানকারী প্রত্যেকেই খুবই উৎসাহ পায়। আবার কোন কোন মণ্ডলীতে উপাসনার পরে আমরা সহভাগিতার প্রীতিভোজে মিলিত হই। আমাদের বোনেরা যদি উপাসনার পরে এই খাবার তৈরী করে থাকে, তাহলে তাদের বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঐ প্রীতিভোজে মিলিত হওয়া উচিত। এখানে বলা উচিত যে, খাবার যারা তৈরী করে, তাদের জন্য খুবই উৎসাহজনক হয় যদি গীর্জার পরে আমরা প্রীতিভোজে উপস্থিত থাকি। অনেকে বলে, 'আমি খুবই ব্যস্ত, এখনই অন্য একটা কাজে যেতে হবে।' দয়া করে এরকম না করে আমাদের ভাই-বোনদের সাথে সহভাগিতার

প্রীতিভোজে মিলিত হোন। যারা রান্না-বান্না করেছে তাদের ধন্যবাদ দিন, তাদের হাত ধরে প্রশংসার বাক্য বলুন। এরকম কোন অবস্থায় উৎসাহ দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং এটিও এক ধরনের উদাহরণ।

এই অধ্যায়ের মূল বিষয়টি এখন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করছি। প্রথমে আমরা শিখেছি যে, মৌখিকভাবে উৎসাহ দেওয়াই যথেষ্ট নয়, কিন্তু বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়েও উৎসাহ দিতে হয়। আমরা দেখেছি, সাধারণতঃ চার রকম ভিন্ন ভিন্ন উৎসাহ দেবার উপায় আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে সহজে অভ্যাস করতে পারি: যেমন- দৈহিকভাবে স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে, ধৈর্য ধরে শোনার মধ্য দিয়ে, আতিথেয়তা করার মধ্য দিয়ে এবং মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে। এই ভিন্ন ভিন্ন উৎসাহ দেবার ধরণ একই রকমভাবে আমাদের প্রতিবেশীদের শক্তিশালী করতে পারে।

যারা অন্যদের উৎসাহ দেয়, ঈশ্বর তাদের জন্য কি কি আশীর্বাদ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন? প্রথমতঃ তাদের নিজেদের যখন উৎসাহ পাবার প্রয়োজন হবে, তখন ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে সরাসরি অথবা অন্য কারও মাধ্যমে তাদের উৎসাহ যোগাবেন। দ্বিতীয়তঃ আমরা যখন অন্যদের উৎসাহ দেই, তখন আমরা উৎসাহিত হওয়া ব্যক্তির কাছ থেকে সম্মান ও অনুরাগ পেতে পারি। এই লোকেরা সব ক্ষেত্রেই আমাদের উপস্থিতি বেশী পছন্দ করবে, কারণ আমরা তো তাদের জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনি। তৃতীয়তঃ একজন উৎসাহদানকারী ব্যক্তি তার জীবনের সবরকম দান ও আশীর্বাদগুলো তার বংশধরদের জন্য রেখে যায়। আবার বলছি, সত্যিকার বিদ্যা শিক্ষালাভ ফাঁকা বুলিতে ভরা নয়, কিন্তু স্বচ্ছ এবং দৃশ্যনীয় উদাহরণ। এমন কিছু আদর্শ বাবা-মায়ের কাছ থেকে প্রদর্শিত হয়, যা ছেলে-মেয়েরাও অনুসরণ করতে শুরু করে। এ সবই আমাদের অভ্যাসে পরিণত করা উচিত। আর এই যে বিভিন্ন ধরনের উৎসাহদান প্রক্রিয়া আমরা দেখেছি, তা শুধু আমাদের মাথার মধ্যে রাখলে চলবে না। এসবই আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এবং পরিবারের মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

যদি আমরা উৎসাহ দেওয়ার কাজটি আমাদের জীবনের সব অবস্থার সংগী করে নিতে পারি, তাহলে অন্য লোকদের দ্বারা আমরা সম্মানিত হব এবং স্বর্গে আমাদের ঈশ্বরের কাছেও স্নেহভাজন হব। স্বর্গে ঈশ্বর আমাদের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব দেবেন, কারণ আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের উৎসাহ দিয়েছি। যারা এই পৃথিবীতে অসহায়, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের এবং একাকী, আমরা তাদের সান্ত্বনা দিয়েছি এবং উদ্যমী করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর যে লোকেরা উৎসাহ পায় তারাও অনুগ্রহে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। আপনি যখন দেখবেন, আপনার কথায় ও কাজে অন্য লোকেরা উদ্যমী হয়ে উঠেছে, তখন তা আপনার জীবনে শান্তি ও আনন্দ বয়ে আনবে।

আমি এটি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর চান যেন আমাদের এইরকম উৎসাহদানকারী জীবন থাকে। আমি এও আশা করি, যেন আমরা সকলেই এ রকম জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হই। আমরা যখন নিয়মিতভাবে খাঁটি ও সরল ভালবাসায় একে অন্যকে উৎসাহিত করব, তখনই তো ঈশ্বরের রাজ্য এখানে, এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আমরা যখন আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যে এ রকম উৎসাহ দেবার কাজ অভ্যাস করি, তখন আমরা বলি 'ইভানজেলিজম' বা সুসমাচার প্রচার। আর যখন অন্য দেশে গিয়ে এই কাজ করি, তখন আমরা বলি 'ওয়ার্ল্ড মিশন্স' বা বিশ্ব প্রচার মিশন ক্ষেত্র।

প্রেরিত্ ৪: ৩৬-৩৭ পদ

যোষেফ নামে লেবির বংশের একজন লোক ছিলেন। সাইপ্রাস দ্বীপে তাঁর বাড়ী ছিল। তাঁকে প্রেরিতেরা বার্ণবা, অর্থাৎ উৎসাহদাতা বলে ডাকতেন। তাঁর এক খন্ড জমি ছিল; তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে প্রেরিত্দের পায়ের কাছে রাখলেন।

ষষ্ঠ
অধ্যায়

উৎসাহদাতা বার্ণবা

উৎসাহদাতা বার্ণবা

বিশ বছরের বেশ আগেই ঈশ্বর আমাকে সেমিনারিতে পাঠিয়েছিলেন। এই সময়টা ছিল ৮০ দশকের প্রথম দিকে, যখন ঈশ্বর ঐ থিয়োলজিক্যাল সেমিনারিতেই আমাকে সুস্পষ্ট করে বুঝতে দিয়েছিলেন যে, আমি উত্তর আমেরিকার আরামদায়ক জীবন-যাপন ত্যাগ করতে চলেছি। আমি যখনই সময় পেয়েছি, ঈশ্বরের নির্দেশ ক্রমেই মিশন ক্ষেত্রগুলো পরিদর্শনের জন্য প্রেরিত্ হয়েছি। কোরিয়ার বিভিন্ন মণ্ডলীগুলো এবং মিশন ক্ষেত্র থেকে আমি যখনই প্রচার করতে সুযোগ পেয়েছি, তখনই আমেরিকা বা কানাডা থেকে সোজা কোরিয়াতে চলে এসেছি। তারপর, সেখান থেকে ভারত, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড বা কম্বোডিয়া গিয়েছি।

আমি যখন এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়েছি, তখন আমার পরিচর্যা কাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রথমেই যেটা অনুভব করেছি, তা হচ্ছে 'সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা'। পৃথিবীর বড় একটা সম্পদশালী দেশ থেকে গরীব ও ক্ষুধা কাতর দেশগুলিতে যাওয়া এবং ঐসব দেশের লোকদের সাথে থাকা খুবই কঠিন কাজ। প্রথমতঃ সপ্তাহ খানেক একটা উন্নয়নশীল দেশে থাকা আমার জন্য যথেষ্ট কষ্টকর হয়েছিল। আমাকে বিভিন্ন রীতি-নীতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল এবং সবচেয়ে অস্বাভাবিক ছিল খাবার-দাবার। তাই আমি বলতে পারি না যে, এই সব দেশে ভ্রমণ করতে আমার খুব আনন্দ ছিল।

আমার হৃদয়ের গভীরে ছিল ঈশ্বরের প্রতি নালিশী মনোভাব: 'প্রভু, এত জায়গা থাকতে তুমি কেন আমাকে এখানে পাঠিয়েছ?' ভারত ছিল আমার সবচেয়ে কম পছন্দনীয় স্থান। যদিও আমি ভারতে যাওয়া যতটা সম্ভব বাদ দিতে চেয়েছি; আর যতবার সেখানে গিয়েছি ততবারই আর যাব না বলে মনে মনে ঠিক করেছি, কিন্তু ঈশ্বর শক্ত হাতে আরও প্রশিক্ষণ নিতে বার বারই সেখানে আমাকে পাঠিয়েছেন।

ভারত থেকে ফিরে আসার পথে, আমি সাধারণতঃ কিছু সময়ের জন্য কোরিয়ার সিউলে থামি। যেহেতু আমি তো আমার নিজের দেশের বাইরে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি, সেজন্য সিউলে আমার তেমন কোন থাকবার জায়গা ছিল না। যদিও কোরিয়াতে আমার আত্মীয়-স্বজন ছিল, কিন্তু সেখানে কয়েকদিন থাকাটা খুব একটা সুখের অনুভূতি ছিল না। তাই যতবার সিউলে আমার যাত্রা বিরতি হয়, ততবার আমি প্রার্থনা করি: 'প্রভু, এই সপ্তাহে আমি সিউলের কোথায় থাকতে যাচ্ছি?' আর ঈশ্বর কোন সময়ের জন্যই তাঁর দাসের প্রয়োজনে মুখ ফিরিয়ে থাকেন নাই। ঠিক সময়ে আমি যথার্থই একটি থাকার জায়গা পেয়ে গেছি।

কোরিয়াতে বেশ কিছু লোক আছেন, যারা সব সময় চাইতেন যেন আমি তাদের ওখানে প্রভুর বাক্য প্রচার করি। তারা স্বেচ্ছায় কয়েক দিনের জন্য আমার আতিথেয়তাও করতেন। আপনি নিশ্চয়ই এটা কল্পনা করতে পারেন, আমার আতিথেয়তা করা তাদের জন্য কতই না কষ্টকর ছিল; ঠিক যেমন আমিও সতর্ক থাকতাম পাছে তাদের বিরক্ত করে না ফেলি। সেজন্য তাদের সাথে থাকাটাও আমার কাছে অস্বাচ্ছন্দ্য মনে হতো।

আমি বিশ্বাস করি, বিদেশ-বিভূঁইয়ে বেশ অনেক সময় অন্যান্য লোকদের বাড়ীতে থাকাটা আমার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা। এভাবে থেকেই আমি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি যখনই সিউলে এসেছি, তখনই আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আমাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো। যেমন- 'সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে তুমি কি কর?' সেই সময়ে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। তাই সিউলে যখনই চট্ জলদি কোন গাড়ির প্রয়োজন হতো, তখনই আমি আমার বন্ধুদের কাছে সাহায্য চাইতাম। তারা এসে তাদের বিলাসবহুল গাড়ীতে আমাকে তুলে নিত। এভাবে সব দিক দিয়ে, সঠিক সময়ে, কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে ঈশ্বর আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। এমনকি, সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিরাও স্বেচ্ছায় আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। কোন কোন সময়, লোকদের সাথে সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে তারা বুঝতে পারত যে, আমি একজন পালক। তারা তখনই আমাকে সাহায্য করতে চাইত। মাঝে মধ্যে কেউ আবার আমার যাতায়াত ভাড়া বা থাকার খরচও মিটিয়ে দিত। আবার কেউ কেউ তাদের গাড়ী নিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অতিথি করে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেত, অথবা তারা আমার জন্য মোটেল রুম ভাড়া করে রাখত। প্রায় পনেরো বছরেরও বেশী সময় ধরে আমি সারা পৃথিবী এবং কোরিয়া

ঘুরে বেড়িয়েছি। বিভিন্ন স্থানে থেকেছি, খেয়েছি বিভিন্ন রকম খাবার-দাবার। এই রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাকে অনেক নম্র করেছেন। যেমন- একটা নির্দিষ্ট রাতে আমার বোঝার কোন সুযোগ একেবারেই ছিল না, কোথায় গিয়ে রাত কাটাব। ঈশ্বরের নির্দেশক্রমেই আজ এখানে থাকতে হবে, কিন্তু আগামীকাল আবার অন্যত্র যেতে হবে। তাই যে কোন রকম থাকবার জায়গা পাওয়া গেলেই বিনা প্রতিবাদে তাই আমাকে মেনে নিতে হতো। এভাবেই ঈশ্বর আমাকে অবনত করেছেন। তবু যাহোক, অল্প কিছু লোক বার বার আমাকে সাহায্য করেছে। আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এভাবে থাকতে থাকতে আমি বেশ ভালভাবে বুঝেছি, কিভাবে যীশু এই পৃথিবীতে তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন। বাইবেলে আমরা দেখেছি, ঈশ্বর হয়েও তাঁর থাকার কোন ঘর-বাড়ী ছিল না। তিনটি বছর তিনি জনসাধারণের মধ্যে বাস করেছেন। অধিকাংশ সময় তিনি ইস্রায়েল দেশের উত্তরাঞ্চলে কফরনাহূম শহরে থেকেছেন। তিনি যখন যিহূদীদের সাতটি ধর্মীয় উৎসব পালন করতে যিরূশালেমে যেতেন, তখনও তাঁর থাকার জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না (অবশ্য তখন তাঁর জাগতিক পিতা-মাতা উত্তরাঞ্চলের নাসরতে বাস করছিলেন)।

কিন্তু যতবার তিনি যিরূশালেমে আসতেন, তিনি একটি জায়গায় অর্থাৎ বৈথনিয়া শহরে যেতেন। এই শহরটি ছিল যিরূশালেমের কাছেই। তিনি সেখানে মরিয়ম, মার্থা ও লাসারের পরিবারের সাথে দেখা করতে যেতেন। যীশুর পরিচর্যা ক্ষেত্র যদিও ছিল যিরূশালেমে, তবু তিনি রাতে ফিরে লাসারদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং থাকতেন। তা সত্ত্বেও যীশু কিন্তু প্রায়শই একরকম ছন্নছাড়া জীবন কাটাতেন। তিনি যেন পৃথিবীতে একজন অচেনা অতিথির মত ছিলেন।

সেজন্য এ কথাটি আশ্চর্যজনক নয় যখন যীশু বলেছিলেন, "শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখীর বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখবার জায়গা কোথাও নেই" (মথি ৮:২০ পদ)। তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা বলা যায়। কারণ একমাত্র যিহূদা ইষ্কোরিয়োত ছাড়া আর সকলেই গালীলের উত্তর অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। যিহূদা ইষ্কোরিয়োত যিহূদা অঞ্চলের লোক ছিলেন। যীশু যখন যিরূশালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন, তখন তাঁর শিষ্যেরাও তাঁকে অনুসরণ করে যিরূশালেমে যেতেন। সেজন্য, তাদেরও থাকার কোন জায়গা ছিল না। এখানে একটা প্রশ্ন আমি নিজেকে সব সময় জিজ্ঞাসা করি: 'আচ্ছা, যীশুর সাথে যিরূশালেমে গিয়ে শিষ্যেরা কোথায় থাকতেন? এক মাসের জন্য হলে তারা কোথায় ঘর ভাড়া করতেন?' এটাই বাস্তব, যীশু ও তাঁর শিষ্যদের নিরিবিলিতে প্রার্থনা করার জায়গাও ছিল না। যিহূদী উপাসনা ঘর বা মন্দির ছাড়া তাদের তো কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। কিন্তু তারপরেও, অনেক সময় যিহূদী কর্মকর্তা ও ধর্মীয় নেতাদের বিরোধিতার কারণে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উঁচু পাহাড়ে বা মাঠে গিয়ে প্রার্থনা করতে হতো।

মৃত্যু থেকে যীশুর পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে স্বর্গে চলে যাবার ঠিক আগে, প্রভু যীশু তাঁর অনুসরণকারী প্রায় ছয়শো জন শিষ্যের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ প্রদান করেছিলেন: "তোমরা যিরূশালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর" (প্রেরিত ১:৪ পদ)।

কিন্তু এই ছয়শো লোক পরে আর একসাথে ছিল না। তাদের অধিকাংশই যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে বিশেষ করে, মাত্র একশো কুড়িজন একটা নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে অপেক্ষারত ছিল। প্রথমতঃ তাদের জন্য ঐ ঘরটির স্থান যথেষ্ট বড় ছিল না। কিন্তু তবু, বার্ণবার ভক্তিমূলক সেবাকাজের জন্য ধন্যবাদ না দিলেই নয়। তিনি ঐ একশো কুড়িজনের একজন, যার জন্য সব শিষ্যদের একটা স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য ঘর পাওয়া গিয়েছিল এবং তা প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছিল।

আজকের দিনের ভাষায় বার্ণবাকে আমরা অভিবাসী বলতে পারি, কারণ তিনি তো যিরূশালেম অথবা যিহূদীয়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন না। আসলে তিনি ছিলেন ভূমধ্যসাগরের একটা দ্বীপ সাইপ্রাস থেকে আগত অভিবাসী যিহূদী। বংশের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন লেবীয়। এই লেবীয়রাই ঈশ্বরের সেবা করার জন্য মনোনীত ছিল। যিহূদীদের সাতটি ধর্মীয় উৎসব পালন করার জন্য বার্ণবা সাইপ্রাস থেকে যিরূশালেমে আসতেন। এই সাতটি ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে: উদ্ধার পর্ব, খামিহীন রুটির পর্ব, প্রথমে তোলা ফসলের পর্ব,

পঞ্চাশত্তমী পর্ব, শিংগাধ্বনির পর্ব, পাপ ঢাকা দেবার পর্ব এবং কুঁড়ে-ঘরের পর্ব। প্যালেস্টাইনে তার কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিল। এদের মধ্যে মার্কের মা মরিয়ম (মেরি) ছিলেন তারই বোন। অর্থাৎ বার্ণবা হচ্ছেন মার্কের মামা।

পবিত্র বাইবেল অনুসারে, যিরূশালেমে মরিয়মের একটা বড় বাড়ী ছিল। এই মরিয়ম বা বার্ণবা কেউই যীশুর পুনরুত্থানের আগে পর্যন্ত তাঁকে জানতেন না। কিন্তু যীশুর পুনরুত্থানের পর তিনি যখন চল্লিশ দিন ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তখনই বার্ণবা ও মরিয়ম মন পরিবর্তন করে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিলেন। যীশু যখন স্বর্গের দিকে উঠে যান, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের এই আদেশ দিয়ে যান, "তোমরা যিরূশালেম ছেড়ে যেয়ো না, বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর" (প্রেরিত্ ১:৪ পদ)। যাইহোক, বার্ণবা এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে, যিরূশালেমে এত লোক একত্রিত হবার মত বড় কোন জায়গা নাই। তাই তিনি তার বোনের নিজস্ব দালানের অংশকে কাজে লাগানোর চিন্তা করেছিলেন।

বার্ণবা, একজন পরিপূর্ণ খাঁটি মানুষ

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বার্ণবার আসল নাম ছিল যোষেফ। কিন্তু বাইবেল অনুসারে প্রেরিতেরা তাকে বার্ণবা ডাকতেই পছন্দ করতেন। গ্রীক ভাষায় এ নামের অর্থ "উৎসাহদাতা" (প্রেরিত্ ৪:৩৬ পদ)। তার এই গ্রীক নামাকরণের মধ্য দিয়ে মনে হয় তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সবসময় অন্যদের উৎসাহ দিতেন ও সহযোগিতা করতেন। বার্ণবা সব সময়ই অন্যদের উৎসাহ দিয়ে শক্তিশালী করতেন এবং তার কাজের মধ্যে ইতিবাচক কর্মশক্তি প্রকাশ করতেন।

আমার জানা একজন প্রাচীন সম্পর্কে একটি খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু প্রাসংগিক ঘটনা আমি আপনাদের বলছি। এই প্রাচীন 'খ্রীষ্টিয়ান একাডেমি' নামে একটা রিট্রিট সেন্টারের ম্যানেজার। এই সেন্টারটি আমেরিকার নিউ জার্সি অঞ্চলে বেশ পরিচিত। তার স্ত্রী একজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। বেশ কয়েক বছর আগে এই দম্পতি যখন সিউলে এসেছিলেন, তখন তারা আমাকে হোটেলে এসে তাদের সাথে দেখা করতে বিশেষ অনুরোধ করেন। টেলিফোনে কথা বলার পরে আমি হোটেল লবিতে পৌঁছালাম যেখানে তারা আগেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা একে অন্যকে শুভেচ্ছা বিনিময় করা মাত্রই প্রাচীন ভদ্রলোক বললেন: 'পালক বাবু, একজন স্বর্গদূত আপনার পরিচর্যাকাজের জন্য আমাকে এই বিশেষ দান দিতে বলেছেন।' তারপর তিনি একজন বিশেষ স্বর্গদূত সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে এই বিষয়ে আরও পরিষ্কার জানতে চেয়েছিলাম। একটু পরে আমি বুঝতে পারলাম, প্রাচীন ভদ্রলোক আমার মণ্ডলীর একজন পরিচারিকার কথা বলছেন। কিন্তু 'স্বর্গদূত' শব্দটি ব্যবহার করায় আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। তবু আমি নম্রভাবে এই দানের কারণ জিজ্ঞাসা করে বুঝতে চেয়েছিলাম, এতে অতিরঞ্জিত করে কিছু বলা হয়েছে কি না। তিনি আমাকে উত্তর দিয়েছিলেন, তিনি আমার মণ্ডলীর এই পরিচারিকাকে প্রায় দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে চেনেন এবং তাদের কাছে এই পরিচারিকা স্বর্গদূত ছাড়া অন্য কিছু নয়! পরে অবশ্য আমি জেনেছি, নিউজার্সিতে বেশ অনেক লোকই এই পরিচারিকাকে স্বর্গদূত বলে থাকে। কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণ ভাল এবং বিশ্বস্ত। এই সাথে আমি এও বুঝতে পেরেছিলাম যে, তিনি বার্ণবার মত করেই অন্যদের উৎসাহ দিতেন। সেই সময় থেকেই নিউজার্সির এই দম্পতি আমাদের পরিচর্যা কাজের জন্য প্রার্থনা করছেন ও অর্থ যুগিয়ে আসছেন। আর এই যে পরিচারিকার কথা আমি আলোচনায় তুলে ধরেছি; তিনি স্বর্গদূতের মতই অনেক লোককে সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন। তিনিই এই দম্পতিকে তারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সাহায্য করতে অনুপ্রাণীত করেছিলেন।

এখন আমরা বাইবেলের বিষয়ে ফিরে যাই। বার্ণবার মনে এরকম চিন্তা এসেছিল যে, নিশ্চয় তার বোনের বাড়ীটা প্রভুর শিষ্যদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই সাথে সাথে তার বোনের সঙ্গে শিষ্যদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলেন। এভাবেই 'মার্কের চিলে কোঠার কামরাটি' একশো কুড়িজনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। আমরা 'মার্কের চিলে কোঠার কামরাটির' কথা বলছি, যেটা মরিয়মের ছেলের নামেই রাখা; তবে বাইবেলে নির্দিষ্টভাবে মার্কের মা মরিয়মের বাড়ী বলেই উল্লেখিত (প্রেরিত্ ১:১২ পদ)। ঐ সময়ে

তুলনামূলকভাবে এমন একটা কামরা অবশ্যই এতগুলো লোকের সমবেত হবার জন্য নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল (প্রেরিত্ ১:১৫ পদ)। তবুও বার্ণবা ও মার্কের পরিবার অত্যন্ত সদাশয়তার সাথে প্রথম যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের এই কামরাটি দিয়েছিলেন যেন তারা তাদের প্রথম পবিত্র উপাসনার স্থান হিসাবে তা ব্যবহার করতে পারে। আর আমরা জানি- এখান থেকেই খ্রীষ্টিয়ানদের ইতিহাসের শুরু হয়েছিল। এরকম চমৎকার ও ত্যাগী মনোভাবের কারণেই ঈশ্বর বার্ণবা ও মার্কের পরিবারকে প্রচুর আশীর্বাদ করেছিলেন।

পঞ্চাশত্তমী দিনের পরে যিরূশালেম মণ্ডলীর অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান ভীষণ তাড়নার মুখে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়েছিল (প্রেরিত্ ৮:১-২ পদ)। কিন্তু প্রতিবারই যখন তাদের একত্রে মিলিত হবার দরকার হোত, তখন তারা বার্ণবার পরিবারের 'মার্কের চিলেকোঠা' বলে পরিচিত কামরাতে সমবেত হতো (প্রেরিত্ ১২:১২ পদ)। (আমরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য মার্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানি। তিনিই মার্ক সুসমাচারের লেখক)।

পবিত্র বাইবেলে এমন অনেক ঘটনার কথা রয়েছে, যেখানে মার্কের এই কামরাটি শিষ্যরা তাদের প্রয়োজনের সময় সমবেত হবার জন্য ব্যবহার করত। যেমন- এক সময়ে রাজা হেরোদ হিংসার বশে বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতন করেছিলেন এবং যীশুর একজন শিষ্য যাকোবকে মেরেও ফেলেছিলেন। তখন আবার ঐ রাজার আদেশে পিতরকে ধরে জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। ঠিক এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ সময় মার্কের এই কামরায় খ্রীষ্টিয়ানেরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করছিলেন। তারপর, যখন ঈশ্বরের স্বর্গদূত পিতরকে অলৌকিকভাবে জেলখানা থেকে মুক্ত করেছিলেন, তখন প্রথমেই পিতর মার্কের ঐ চিলেকোঠার কামরায় ছুটে গিয়েছিলেন, যেখানে তার খ্রীষ্টিয়ান ভাই-বোনেরা মিলে তার জন্য প্রার্থনা করছিলেন ও অপেক্ষারত ছিলেন (প্রেরিত্ ১২:১২পদ)। আমরা আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে এই স্থানটিকে "প্রার্থনা কেন্দ্র" বলতে পারি।

কিন্তু সবচেয়ে আগে, একজন মাত্র মহৎ প্রাণ ব্যক্তি বার্ণবার কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। তার সদাশয়তা ও সুবিবেচনার ফলেই ঈশ্বর তাঁর হাত বাড়িয়ে অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পেরেছিলেন।

বলা যায়, আমরা তো সকলেই ঈশ্বরের দাস-দাসী। কিন্তু ঈশ্বরের দাস-দাসী হিসাবে যে বিষয় আমাদের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে- যখন অবিশ্বাসীদের মতই বিশ্বাসীদের মধ্যে আত্ম-গরিমা দেখা যায়। একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে, স্বার্থপরতা এমন একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয় কিন্তু শয়তানের কাছ থেকে আসে। পালক হিসাবে এই বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনার মধ্যে টেনে নেয়। আমরা খ্রীষ্টিয়ানেরা মণ্ডলীর জন্য বাজার-সদাই করি এবং তখন ধর্মীয় উপদেশে কোন সতর্কবাণী থাকলে আমরা চোখ বন্ধ রাখি এবং বিশেষ গা লাগাই না। আমাদের এ জগতের প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে আমরা এমন করি। বেশ ভাল ভাল প্রচার উপদেশ শুনেও না শোনার ভান করে থাকি। কিন্তু আমাদের প্রভু সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যেন আমরা স্বার্থপর না হই; তা সত্ত্বেও অন্যদের চেয়ে আমরা আমাদের জাগতিক ইচ্ছা ও লক্ষ্য পূরণের জন্য জোর চেষ্টা করে থাকি। এ বিষয়টি সত্যিই আমার হৃদয়ে বেশ কষ্ট সৃষ্টি করে।

বার্ণবা, একজন ভাল মানুষ

লেখা আছে, বার্ণবা একজন "ভাল লোক ছিলেন এবং তিনি পবিত্র আত্মাতে ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন" (প্রেরিত্ ১১:২৪ পদ)। পবিত্র বাইবেল প্রথমে বার্ণবার ভাল স্বভাবের কথা বলেছে এবং পরে তার বিশ্বস্ততা ও আত্মিকতার ইতিবাচক বিষয় উল্লেখ করেছে। তার অন্য কোন গুণাবলীর কথা না বলে তার ব্যক্তিত্বের কথাই আগে বলা হয়েছে। এই কথা এক বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। সুনির্দিষ্টভাবে বার্ণবা একজন ভাল লোক ছিলেন, তার মানে- পবিত্র আত্মা তার মধ্যে থেকে অতি চমৎকারভাবে তাঁরই করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করেছিলেন। প্রথমে একজন মানুষ ভাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে পবিত্র আত্মা তার মধ্যে কাজ করতে সুযোগ পাবেন।

এ কারণেই যখন আমি কোন ব্যক্তির দিকে তাকাই, তখন প্রথমেই তার আত্মিকতা মাপতে চেষ্টা করি না, অথবা তার বিশ্বাসের গভীরতাও দেখি না, বরং তার ব্যক্তিত্বকে দেখি। আমি এখন একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপস্থিত হয়েছি ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং জেনেছি যে, ব্যক্তিত্ব আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি একজন ভাল চরিত্রের অধিকারী হয়, তাহলে পবিত্র আত্মা বেশ সহজে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং তার মধ্যে কাজ করতে পারে যেন সে আত্মিক ফল উৎপন্ন করে। বার্ণবার মত একজন ভাল লোক তথাকথিত "খারাপ লোকের" চেয়ে খুব সহজে পরিবর্তিত হতে পারে এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ বার্ণবার মধ্যে কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য বা হিংসার মনোভাব ছিল না, বরং তার ছিল এক বিশাল অন্তর এবং সদাশয় আত্মা।

বার্ণবা সদৃশ সাদাসিধা ও নির্ভেজাল একজন ভাল লোক আজও আধুনিক পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায়। অনেকেই তার মত লোকদের গুরুত্ব বা মূল্য দিতে চায় না, কারণ তারা যা করে তার বদলে তারা কিছুই প্রত্যাশা করে না। এ জগতের সাথে তাল মিলাতে তারা বেশ কষ্টবোধ করে থাকে কিন্তু আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি বেশ প্রসারিত এবং তারা যেখানেই যান সেখানেই শান্তির অনুসন্ধান করেন। যেমন- লেখা আছে যে, "তার (বার্ণবার) এক খন্ড জমি ছিল; তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে প্রেরিত্দের পায়ের কাছে রাখলেন" (প্রেরিত্ ৪:৩৭ পদ) যেন এই টাকা গরীবদের কাজে ব্যবহার করা যায়।

এরই ফলে, ঈশ্বর বার্ণবাকে আদি মণ্ডলীর নেতা করেছিলেন। তিনি প্রায় পৌলের সমকক্ষ বলা যায়। এমন কিছু ঈশতত্ত্ববিদ আছেন যারা যুক্তি দেন যে, ইব্রীয়দের কাছে লেখা চিঠি বার্ণবার লেখা। সোজাসুজি, বার্ণবা কিন্তু পৌলের মত বিশিষ্ট ও ঐশী শক্তির অধিকারী ছিলেন না। বার্ণবার বোন মরিয়ম ছিলেন আদি মণ্ডলীর মহিলা নেতা এবং প্রার্থনা কেন্দ্রের প্রধান। আর ঈশ্বর যিরূশালেমের মেরির ছেলে মার্কের প্রতি খুব গভীর ভালবাসা দেখিয়েছিলেন। পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণীত হয়ে এই মার্কই 'মার্ক সুসমাচার' লিখেছেন। মার্ক আবার পিতরের সবচেয়ে ভাল শিষ্য ছিলেন। যদিও পিতর ছিলেন অশিক্ষিত, বলা যায় গ্রীক ভাষায় অক্ষরজ্ঞানহীন, তবু পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণীত হয়ে এবং মার্কের সহায়তা পেয়ে তিনি দু'টি চিঠি লিখেছিলেন।

মার্ক ছিলেন পিতরের ডান হাত। তাই, পিতর তার লেখা চিঠিতে মার্ককে তার [আত্মিক] ছেলে হিসাবে উল্লেখ করেছেন (১ পিতর ৫:১৩ পদ)। মার্কের জীবনে বড় আশীর্বাদ ছিল তার বিশ্বাস, যা তার মামা এবং মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এমনকি প্রেরিত্ পৌলও মার্ককে তার 'ছেলে' বলে সম্বোধন করেছেন এবং তার জীবনের শেষ লগ্নে এসে শহীদ হবার অল্প কিছুদিন আগেও তিনি মার্কের সাহচর্য কামনা করেছিলেন। কারণ মার্ক ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ এবং পরিচর্যা কাজের সাহায্যকারী (২ তীমথিয় ৪:১১ পদ)। মার্ক ছিলেন পৌলের ছেলে, একজন বন্ধু এবং একজন অতি উত্তম সাহায্যকারী। পরবর্তীতে মার্ক উত্তর আফ্রিকাতে মিশনারি হিসাবে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি ছিলেন প্রথম যুগের কপটিক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা। আজও মিসরে এই মণ্ডলীর অস্তিত্ব রয়ে গেছে।

এই কারণেই, একজন উৎসাহদাতার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বার্ণবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তার সমস্ত পরিবারের উপরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর উৎসাহদাতা বার্ণবার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- অন্যদের ভাল করতে তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সাথে তার ব্যক্তিগত অধিকার এবং সুযোগকে উৎসর্গ করে দিতেন। বার্ণবা যদিও বারোজন শিষ্যের একজন নয়, তবুও অন্যদের সেবা করার জন্য জাগতিক সম্পদ ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে তার ভক্তি ঐ বারোজনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার ছিল একটি উষ্ণ হৃদয় অর্থাৎ তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি অন্যদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে কোন বাধাই মানেন নাই। (লোকেরা দাতা হিসাবে তাকে পছন্দ করত; কারণ কার কি আছে বা না আছে সে বিষয়ে চিন্তা না করেই তিনি দান করতেন)।

পবিত্র বাইবেলের প্রেরিত্ ৫ অধ্যায়ের দু'টি চরিত্র খুবই নিখুঁতভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। বার্ণবার চরিত্রের ঠিক উল্টো দিকটি তাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। তারা হলো- অননীয় এবং সাফীরা। অননীয় এবং সাফীরা তাদের জমি বিক্রী করে প্রেরিত্দের কাছে টাকা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা হৃদয়ের নম্রতায় কাজটি করে নাই, বরং জমি বিক্রীর কিছু টাকা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছিল এবং এমন গর্বভাব করেছিল যেন সব টাকাই তারা দিয়েছে। কেউ যখন গর্বভরে লোক দেখানোর জন্য তার ভাল কাজগুলো করে এবং অন্য একজন নীরবে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবার মনোভাব নিয়ে করে, তখন এই দু'টির মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। দু'হাজার বছর আগে ঠিক এমন পার্থক্য অননীয় ও বার্ণবার মধ্যে ছিল, যা আজও আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে।

ধার্মিক ও উৎসাহদানকারী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্বার্থত্যাগ করেই নিজেদের সুখ অনুভব করে থাকে। তারা দান করতে আনন্দ পায়, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই প্রত্যাশা করে না, এমনকি তা নিয়ে গর্ববোধ করে না। অন্যদিকে, যে যত বেশী দান করে থাকে, তার মধ্যে তত বেশী নম্রতা দেখা যায়। কিভাবে তা সম্ভব? এটা তখনই সম্ভব হয় যখন একজন ঈশ্বরের উপরে স্থির বিশ্বাসে তার হৃদয় ধরে রাখে। একজন ধার্মিক ব্যক্তি জাগতিক ও দৈহিক বিষয়ের উর্ধ্বে তার দৃষ্টি ধরে রাখতে পারে। সে মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে বা প্রশংসিত হতে চায় না, কিন্তু বিশ্বাসে তাদের আত্মিক দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে মেলে দেয় এবং ভবিষ্যতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাবার দিকে মনোযোগ দেয়।

যারা আমার উৎসাহদাতা

প্রায় বিশ বছরেরও বেশী হয়ে গেল আমি পালকীয় কাজ করছি। একটি বিষয় আমি চূড়ান্তভাবে বলতে পারি, যে খ্রীষ্টিয়ানেরা বিশ্বস্তভাবে ও নিয়মিতভাবে দশমাংশ দেয়, তারা মণ্ডলীতে কখনও কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। এখানে আমি তেমন কিছু ইঙ্গিত করতে চাচ্ছি না; শুধুমাত্র আমি যা দেখেছি তা-ই বলছি। আমি এও লক্ষ্য করেছি, যার দান যত বড় হয়, সেই দাতা তত বেশী নম্র হয়ে থাকে। এর ঠিক উল্টোটা আমি দেখেছি। যারা যত কম দান করে তারা তত বেশী মণ্ডলীর বাৎসরিক বাজেটের সময় দোষ ধরে থাকে। প্রায় সব মণ্ডলীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য, তা এশিয়াতে বা উত্তর আমেরিকাতে যেখানেই হোক না কেন, অধিকাংশ সমস্যা এরাই সৃষ্টি করে। তাছাড়া, আরও চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, তারা আবার সেমিনারিতেও এসব শিক্ষা দেয়। পরিচর্যা ও নম্রতার ক্ষেত্রে কেন এমন পারস্পরিক সম্বন্ধ? আমি এও বিশ্বাস করি, যেখানে স্বার্থত্যাগ ও ভক্তি যত বেশী, আত্মিক বৃদ্ধি সেখানে তত বেশী হয়, পক্ষান্তরে নম্রতাও তত বেশী বৃদ্ধি পায়।

আমার মণ্ডলীতে বেশ অনেক ভাই ও বোন আছে, যারা সক্রিয়ভাবে সেবাকাজে উৎসর্গীকৃত। বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের ও তরুণ-তরুণীদের পরিচর্যার কাজে যারা জড়িত, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বাস্তবিকই, আমাদের মণ্ডলীর সান্ডে স্কুলে মাত্র একজন শিশু ছিল। কিন্তু পরিচর্যা ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে অনেক ছেলে-মেয়ে যোগ দিতে শুরু করেছিল। এখন আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেশ অনেক; আর প্রভুর বাক্য প্রচার করার জন্য রয়েছে বেশ অনেকগুলো কার্যক্রম। ছেলে-মেয়েদের এবং তরুণ-তরুণীদের পরিচর্যা কার্যক্রম এখন আমাদের মণ্ডলীতে দ্রুত বেড়ে ওঠা চমৎকার পরিচর্যা ক্ষেত্র। এই ছেলে-মেয়েরা সকলেই আমার নাতি-নাতনি সমতুল্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই আমার ছেলে-মেয়ের মত। যখন দেখি, তারা একত্রে প্রার্থনা ও গান করে ঈশ্বরের উপাসনা করছে, এমনকি যখন তারা নিজেরা কথাবার্তা বলে তখন তাদের দেখতে ভক্তিপূর্ণ মনে হয়। এরকম সুন্দর দৃশ্য আমার কাছে অতি চমৎকার ও উৎসাহজনক। আমি তাদের জন্য সব সময় ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও, মহিলা পরিচর্যা কার্যক্রমের জন্য এবং বিশেষ করে উপাসনা আরাধনা দলের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। তারা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে থেকেও তাদের পরিচর্যা কাজ ভালভাবে করছে। একথা আমি আগেও বলেছি, তাদের ত্যাগী মনোভাব সত্যিই আমার কাছে উৎসাহজনক। আর আমাদের উপাসনা আরাধনা দল তাদের কাজের বিনিময়ে কিছুই প্রত্যাশা করে না, এমনকি তারা কোন টাকা পয়সা বা শ্রোতাদের কাছ থেকে কোন রকম প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাও চায় না। আসলে তারা তো মানুষের স্বীকৃতি পাবার অপেক্ষা করে তাদের গান-বাজনা করে না।

কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যারা মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি চায়। লোকেরা তাদের কাজের বা সেবার জন্য স্বীকৃতি না দিলে তারা হতাশ হয় এবং দোষারোপ করে। এই বিষয়টি আমাদের কাছে একথা প্রকাশ করে যে, এইসব লোকেরা অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাবার জন্য সেবা কাজ করে। আর ঈশ্বরের সেবা করতে গিয়ে যে কারণে তারা স্বীকৃতি পেতে চায়, তা হচ্ছে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস না রেখে তারা মানুষের উপরে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের উপরে অবশ্যই আমাদের আস্থা রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে

যে, লোকেরা আমাদের বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রমী কাজের প্রতি লক্ষ্য না রাখলেও আমাদের প্রভু তা দেখছেন। আমাদের সব সেবা কাজের হিসাব স্বর্গরাজ্যের বইটিতে লেখা হচ্ছে।

অবশ্যই বিশ্বাসে আমরা প্রভুর সেবা করব। আমাদের কাজ সম্পর্কে অন্য লোকেরা কি বলল না বলল তাতে কিছুই যায় আসে না। যার এ রকম বিশ্বাস আছে সে নম্র এবং বিচক্ষণ হয়, কারণ সে তার কাজের হিসাব ঈশ্বরের কাছে দেবে; কোন মানুষের কাছে নয়। সে শুধু ঈশ্বরকে দেখে, কারণ ঈশ্বরের কাছেই তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে এবং এতে ঈশ্বরের শান্তি তার হৃদয়ে থাকবে। যদিও তার চারপাশে হৈ চৈ এবং অন্ধকার ঘিরে থাকে, তবু তার হৃদয়ে থাকে শান্তি ও আনন্দ। যে তার বিশ্বাস মানুষের উপরে না রেখে ঈশ্বরের উপরে রাখে, প্রতিবেশীদের সাথে তার কোন রকম বিবাদ থাকে না। অন্যদিকে, এরকম বিশ্বস্ত লোকেরা অন্যদের উৎসাহ দেয় এবং শক্তির যোগান দেয়।

আমার মণ্ডলী সম্পর্কে এমন অনেক কিছু আছে, যার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। এমন অনেক লোক আছে যারা তাদের নানা সমস্যার মধ্যে স্বাধীনভাবে আমাদের পরিচর্যায় সাহায্য করে। তারা তাদের প্রার্থনা, তাদের প্রচেষ্টা, তাদের সময়, তাদের টাকা-পয়সা, তাদের সুযোগ-সুবিধা, তাদের আত্মোৎসর্গ সবই প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ও এভাবেই অন্যদেরও উৎসাহদান করে এবং শক্তিশালী করে। তাদের তালিকার শুরুতে প্রথমেই আমার সহকারী পালকের কথা বলতে হয়। তিনি কোন খরচ-খরচা না নিয়ে মণ্ডলীর সকল প্রশাসনিক দিক দেখাশোনা করেন। একজন প্রধান পরিচারক, যিনি আমাদের মণ্ডলীর শুরু হবার পর থেকেই আরোগ্যদায়ী কাজের পরিচালনা দিয়ে আসছেন। আরও একজন প্রাচীন নিজের খরচে এসে ইংরেজি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং একজন বোন কোন রকম টাকা-পয়সা ছাড়াই পিয়ানো বাজিয়ে থাকেন। এক সপ্তাহের নোটিশ বোর্ড লক্ষ্য করলে আমি দেখতে পাই যে, সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিষের একটা লম্বা তালিকা রয়েছে তার সবই বিশ্বাসীদের দান। তারা যে সব জিনিষপত্র দান করেন তা অনেকের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু অনেকের কাছে তা সত্যিই বিশেষ উৎসাহজনক। আমি আমার এই সব ভাই-বোনদের দয়ালু হৃদয়ের প্রশংসা না করে পারি না, যাদের দয়ার মনোভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। আমাদের গীর্জাঘর যিনি ফুল দিয়ে সাজান, সেই পরিচারিকাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রতি সপ্তাহে তিনি নতুন নতুন ফুলের তোড়া দিয়ে ফুলদানি সাজিয়ে দেন বলে তা সব সময়ই টাটকা ও তাজা দেখা যায়। এইসব ভাই ও বোনেরা মহানুভবতায় ও ভালবাসায় যে পরিচর্যা কাজগুলো করে, কোন স্বীকৃতি পাবার জন্য তারা তা করে না।

অনেক লোকের নাম আমি এই অধ্যায়ে লিখতে পারলাম না, বিশেষতঃ যাদের পরিচর্যা কাজ সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান সমাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সেই সাথে, যারা ইলেকট্রনিক ও অডিও-ভিজুয়াল যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করেন, তারা সকলেই তাদের কাজের দ্বারা আমাকে শক্তিশালী করেন। তাদের সাহায্য ছাড়া এরকম কোন কাজই সম্ভব করা যেতো না। তাই, আরও একবার আমি তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

এইতো অল্প দিন আগে, একজন পাকিস্তানী ভাই মোজেস মাঝ রাতে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করল: বলল, কেউ যেন তাকে এয়ারপোর্টে এসে নিয়ে যায়। কারণ তার প্রচুর মালপত্র ছিল এবং বাইরের আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ।

সংবাদ পাবার একটু পরে, আমাদের মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য মণ্ডলীর গাড়ীটা নিয়ে ইনছন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেল। এই এয়ারপোর্ট সম্পূর্ণ আলাদা আর একটি শহরে অবস্থিত। মাঝরাতে ঝর ঝর করে বৃষ্টি পড়ছিল, আর আমাদের মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য ঘন্টাখানেক গাড়ী চালিয়ে মোজেসকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের এই বাহনটি নিয়ে আমি কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারণ, রাস্তার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, তাছাড়া আবহাওয়া ছিল খারাপ এবং রাত ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন! সেজন্য, সকালে উঠে প্রথমে আমি দেখতে চেয়েছিলাম, গাড়ীটা ফিরে এসেছে কি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ওটা যথাস্থানেই আছে এবং মোজেস নিরাপদে ফিরে এসেছে। যদিও এই ঘটনাটি একটি ছোট্ট বিষয়, তবু তা আমার হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করেছিল। কারণ একজন বিদেশী ভাইয়ের প্রতি মন্ডলীর সদস্যদের এই পরিচর্যা ছিল আমার কাছে ভীষণ দামী।

যারা বিশ্বস্তভাবে দশমাংশ দেয়, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাদের এই দান আমাদের বিশ্বব্যাপী মিশন কাজের উদ্দেশ্য সার্থক করার ভিত্তি। আমাদের প্রভু তাঁর লোকদের অনুরোধ করেছেন যেন তারা সঠিক প্রয়োজনের সময়ে দশমাংশ দেয় এবং এভাবে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারে অংশগ্রহণ করে। এখানে, তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই, যারা কখনও আমাদের উপাসনা ও অন্যান্য কার্যক্রম বাদ দেন না। কারণ, তাদের উপস্থিতি উপাসনা প্রস্তুতকারী ভাই-বোনদের অনেক উৎসাহ যুগিয়ে দেয়। ঈশ্বর কখনও এই ভাল ভাল কাজগুলোর কথা ভুলে যান না।

পালক হিসাবে বেশ কষ্টকর একটি বিষয় আমাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। উপাসনাকারী কোন কোন লোক সব সময় চেয়েছে যেন লোকেরা তাদের প্রশংসা করে, চিনতে পারে ও স্বীকৃতি দেয়। এই ধরনের লোকেরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসে শিথিল; তারা ঈশ্বরের স্বীকৃতি এবং তাঁর রাজ্যের বিষয় বাদ দিয়ে মানুষের স্বীকৃতি পেতে চায়। পালকের জন্য সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন এ বিষয়টি বেশ একটু মন্দভাবে অগ্রসর হয়। কারণ এরকম প্রত্যেকটি লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও দেখাশোনা করাও পালকের দায়িত্ব, অথচ তাদের অবস্থা ও আচরণ প্রতি সপ্তাহেই পরিবর্তন হয়। তাদের আত্ম-স্বীকৃতি পাবার ইচ্ছা পূরণে ও তাদের সন্তুষ্ট করতে সব পালকদেরই প্রচুর সময় ও প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এতে পালকেরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। তারা ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করেন, 'ও প্রভু, এই লোকদের নিয়ে আমি কি করি?'। এ কারণে, সাধারণত পালকদের সঠিক বয়সের তুলনায় তাদের বেশ বুড়ো দেখায়। মণ্ডলীতে এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের আচার-আচরণে পালকদের প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে। মণ্ডলীতে এ ধরনের সমস্যা দেখা গেলে সদস্য-সদস্যাদেরই নেতা হিসাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনবর্গ, প্রধান পরিচারকগণ ও অন্যান্য পরিচারক-পরিচারিকার পদগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা অবশ্যই ঐরকম আত্ম-কেন্দ্রিক লোকদের দেখাশোনা করে পালককে সহযোগিতা করতে পারেন। তারাই মণ্ডলীতে ঐসব লোকদের প্রভাবকে সীমিত করে রাখতে পারেন, অর্থাৎ তাদের নেতিবাচক প্রভাবকে 'নিরপেক্ষ' করতে পারেন। মণ্ডলীর সাধারণ নেতারা এই দায়িত্ব নিয়ে পালকদের বেশ উৎসাহিত করতে ও শক্তি যোগাতে পারেন।

পরিচর্যা কাজে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিশেষতঃ পালকদের জন্য তা প্রাণ শক্তি বলা যায়। কিন্তু যদি মণ্ডলীর নেতারা তাদের মণ্ডলীতে গড়ে ওঠা নেতিবাচক প্রভাব 'সীমিত ও নিরপেক্ষ' করতে ব্যর্থ হন, তাহলে পালকেরা তাদের উদ্যম সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। যেহেতু শয়তান পালকদের দুর্বল করে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে; ফলে পালকদের আত্মিকতা হ্রাস পায়।

সেজন্য, মণ্ডলীর প্রাচীন-প্রাচীনা ও পরিচারক-পরিচারিকাদের অবশ্যই বার্ণবার আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। যেমন- কেউ যদি পালক সম্বন্ধে কোন নেতিবাচক কথা বলে, তাহলে তারা পালক সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন। অন্যদিকে, যদি তারা এরকম সমালোচনা মেনে নেন এবং সাথে কিছু যুক্ত করেন, তাহলে তারা তো তাদের স্বর্গীয় পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন। যেহেতু তারা উৎসাহদাতা হিসাবে এবং শান্তির সপক্ষে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু এরকম মণ্ডলী একেবারেই আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না।

সেজন্য, আমি পাঠক-পাঠিকাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যেন তারা তাদের পালকদের দেখাশোনা করেন ও সহযোগিতা করেন। এভাবে তারাও ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস-দাসী হিসাবে বেড়ে উঠতে পারেন। মণ্ডলীর আত্মিক নেতা কে এবং নেতৃত্বদানে তার সাহায্যকারীই বা কে তা জানা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এই একই নিয়ম সব জাগতিক সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা কোন কোম্পানি, সরকারী সংস্থা, রাজনৈতিক দল অথবা বেসরকারী সংস্থা ইত্যাদি যে কোন সংস্থাই হোক না কেন! এখানে একটি বিষয় আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, মণ্ডলী পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে– পরিচারক-পরিচারিকাদের ও প্রাচীন-প্রাচীনাদের অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী থাকতে হয়। পালকেরা এতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করতে পারবেন।

প্রথমতঃ তারা অবশ্যই বাধ্য হবেন, কিন্তু যেন ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হন। তারা অবশ্যই পালককে হুকুম করবেন না বা প্রভাবান্বিতও করবেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পালকেরা সরাসরি

ঈশ্বরের কাছ থেকে নিয়োগ পাওয়া সেবক বা পরিচর্যাকারী। পালকদের যোগ্যতা যাই হোক না কেন, তবুও তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের মানসিক উন্নতিতে সাহায্য করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

যে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের পালকদের আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে এবং পরিপক্ক হতে সাহায্য করে, তারা তো বার্ণবা, কালেব ও যিহোশূয়ের মত এক একজন উৎসাহদাতা। তাদের মত লোক মণ্ডলীর জন্য অমূল্য সম্পদ। এ কারণেই আমি সব সময় এ রকম সাহায্যকারী পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। সর্বোপরি, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের মণ্ডলীতে বার্ণবার মত উদার চরিত্রের লোকদের পাঠান (প্রেরিত্ ১১:২৪ পদ)। এ ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হবে বা শিক্ষিত হতে হবে, তা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আবার বিশ্বাস ও আত্মিক পরিপক্কতার চেয়ে ব্যক্তিত্বের মান কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঈশ্বর পালকদের যে আদেশ দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ করতে তাদের দরকার বার্ণবার মত লোকদের। এই অনেক 'বার্ণবা' শুধু যে তাদের চারপাশের লোকদের শক্তিশালী করবে তা নয়, কিন্তু তারা প্রত্যেকের কাছে, এমনকি অবিশ্বাসীদের কাছেও শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারবে।

বিগত বিশ বছর ধরে আমি অনেক 'বার্ণবার' মাধ্যমে প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করেছি। শুধু তাদেরই কারণে আজ আমি ঈশ্বরের রাজ্যের পরিচর্যা করার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি।

আমি তাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ, যারা নম্রতার সাথে বিনা পয়সায় সেবা কাজ করছে। তারা তাদের গৌরবের জন্য নয়, কিন্তু প্রায় নেপথ্যে থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য পরিচর্যা কাজ করছে। আমি স্বর্গে গিয়ে প্রথমেই তাদের খুঁজব। আর বাস্তবিক পক্ষে, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কাজ করতে গিয়ে বার্ণবার মত লোকদেরই আমরা বেশী করে মনে করব। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আসুন না আমরা বার্ণবার মত হতে চেষ্টা করি, যিনি অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের শক্তি যুগিয়েছেন ও নিজেও সম্মান লাভ করেছেন। তাহলে আমরাও প্রভুতে বিশ্বাসী ভাই ও বোনদের কাছে সম্মান পাব এবং স্মরণীয় হয়ে থাকব। এমন লোকেরাই তো যীশুকে ভালবাসে এবং সব গৌরব তাঁকেই প্রদান করে ও তাঁর নতুন আদেশ (যোহন ১৩:৩৪ পদ) অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালন করে।

প্রেরিত্ ১১:১৯-২৬ পদ

স্তিফানকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচারের দরুন যারা ছড়িয়ে পড়েছিল তারা ফৈনীকিয়া, সাইপ্রাস ও সিরিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত গিয়ে কেবল যিহূদীদের কাছেই ঈশ্বরের বাক্য বলল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন আন্তিয়খিয়াতে গিয়ে গ্রীক ভাষায় কথা বলা লোকদের কাছেও প্রভু যীশুর বিষয়ে সুখবর প্রচার করতে লাগল। এরা ছিল সাইপ্রাস দ্বীপ ও কুরীণী শহরের লোক। ঈশ্বরের শক্তি তাদের উপর ছিল বলে অনেক লোক প্রভুর উপর বিশ্বাস করে তাঁর দিকে ফিরল। এই খবর যিরূশালেমের মণ্ডলীর লোকদের কানে গেলে পর তারা বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়াতে পাঠিয়ে দিল। ঈশ্বর যে কিভাবে আন্তিয়খিয়ার লোকদের দয়া করেছেন বার্ণবা এসে তা দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তারা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুর কাছে বিশ্বস্ত থাকে সেইজন্য তিনি তাদের সকলকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। বার্ণবা একজন ভাল লোক ছিলেন এবং তিনি পবিত্র আত্মাতে ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন। তখন প্রভু অনেককেই তাঁর নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এর পরে বার্ণবা শৌলের খোঁজে তার্ষ শহরে গেলেন, আর তাকে খুঁজে পেয়ে আন্তিয়খিয়াতে আনলেন। বার্ণবা আর শৌল এক বছর পর্যন্ত মণ্ডলীর লোকদের সংগে মিলিত হয়ে অনেক লোককে শিক্ষা দিলেন। আন্তিয়খিয়াতেই খ্রীষ্টের শিষ্যদের খ্রীষ্টিয়ান নামে প্রথম ডাকা হল।

সপ্তম
অধ্যায়

বার্ণবা, পৌলের বিশ্বস্ত সমর্থক

বার্ণবা, পৌলের বিশ্বস্ত সমর্থক

যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা যিরূশালেম ছেড়ে যেয়োনা, বরং আমার পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা তোমরা আমার কাছে শুনেছ তার জন্য অপেক্ষা কর" (প্রেরিত্ ১:৪ পদ)। প্রায় একশো কুড়িজন খ্রীষ্টিয়ান (প্রেরিত্ ১:১৫ পদ) মার্কের চিলেকোঠায় জড়ো হয়েছিলেন এবং পবিত্র আত্মার দান পেয়েছিলেন। এই প্রাথমিক সদস্য-সদস্যাদের মাধ্যমেই সুসমাচার খুব দ্রুত যিরূশালেমে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেকে বিশ্বাস করেছিল। তাই বলা যায়, যিরূশালেম মণ্ডলী মার্কের চিলেকোঠায় জন্ম নিয়েছিল। একবার ঠিক পঞ্চাশত্তমী ঘটনার পর, যিরূশালেমে তিন হাজার লোক (শুধুমাত্র পুরুষ সংখ্যা গোণা হয়েছিল) মন পরিবর্তন করেছিল (প্রেরিত্ ২:৪১ পদ)। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঠিক তার পরেই, পাঁচ হাজার লোক নতুনভাবে প্রভুকে গ্রহণ করেছিল (প্রেরিত্ ৪:৪ পদ)। এই সময় যিরূশালেম মণ্ডলী নিঃসন্দেহে অনেক বড় হয়েছিল এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিয়ে বিশ হাজারেরও বেশী হয়েছিল।

তবে বিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়তে থাকা সত্ত্বেও, যিরূশালেমের খ্রীষ্টিয়ানেরা যীশুর দেওয়া আদেশ পালন করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। প্রেরিত্ ১:৮ পদে যীশু বলেছিলেন: "তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর যিরূশালেমে, সারা যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে"। তারপর থেকে সময় পার হয়ে যাচ্ছিল অথচ প্রথম বিশ্বাসীরা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত না গিয়ে বরং তাদের নিজেদের অঞ্চলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবন-যাপন করতে শুরু করেছিল। যিরূশালেমের মণ্ডলী বাড়ছে এটাই ছিল তাদের লক্ষ্য এবং এভাবে তারা নিশ্চল হয়ে থেকেছিল। এটা এমন একটি বিষয়: প্রভুর আদেশ জানা সত্ত্বেও যেন দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ হাজার খ্রীষ্টিয়ান চীন, উত্তর কোরিয়া অথবা জাপানি লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে অনীহা প্রকাশ করছে।

প্রেরিত্ ৬ অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রেরিতেরা যিরূশালেম মণ্ডলীতে সাত জন পরিচারক নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্তিফান, যিনি "বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ" ছিলেন (প্রেরিত্ ৬:৫ পদ)। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলেছে যে, অন্যান্য ভাই-বোনদের মত স্তিফান যিরূশালেমে থাকা স্থির না করে প্রভুর আদেশ অনুসারে শমরিয়া অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (প্রেরিত্ ৬:৮-১৫ পদ)। আমরা জানি, পরবর্তীতে তিনি হয়েছিলেন প্রথম মহান শহীদ (সাক্ষ্যমর)।

স্তিফান যখন শহীদ হন, তখন তার কাছাকাছি একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন (প্রেরিত্ ৭:৫৮ পদ), যার নাম হচ্ছে শৌল। এই শৌল পরবর্তীতে হয়েছিলেন মহান প্রেরিত্ পৌল, যিনি দামেস্কের রাস্তায় যীশুর দেখা পান এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হন। তারপর তিনি তার সমস্ত জীবন সারা পৃথিবীব্যাপী সুসমাচার প্রচার করতে উৎসর্গ করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শৌল শুধু যে স্তিফানকে পাথর মারতে অনুমোদন দিয়েছিলেন ও বিশ্বাসীদের অত্যাচার করেছিলেন তা-ই নয়; যারা স্তিফানকে পাথর মারছিল তিনি তাদের কাপড়-চোপড়ও দেখাশুনা করেছিলেন।

পৌলের মন পরিবর্তন

পরিচারক স্তিফানের শহীদ হবার পরে, ঈশ্বর যিরূশালেম মণ্ডলীর উপর ভীষণ তাড়না এনেছিলেন। তারা চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল (প্রেরিত্ ৮:১-২ পদ)। প্রেরিতেরা বাদে আর সকলেই তখন যিহূদিয়া ও শমরিয়া প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এক পর্যায়ে মণ্ডলীও বিভক্ত হয়েছিল (প্রেরিত্ ৮:৩ পদ)। যদিও যিরূশালেম মণ্ডলী যথেষ্ট বড় মণ্ডলী হিসাবে বেড়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা যীশুর মহান আদেশ পালন করে নাই। তাই ঈশ্বর তাড়নার মাধ্যমে প্রথম যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের অন্যত্র যেতে বাধ্য করেছিলেন। পবিত্র বাইবেল আমাদের বলেছে যে, তারা যেখানেই গিয়েছিল সেখানেই প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিল (প্রেরিত্ ৮:৪ পদ)। এই সময় একটি ছোট দল আন্তিয়খিয়াতে গিয়েছিল এবং গ্রীকদের প্রভাবান্বিত করেছিল (প্রেরিত্ ১১:২০ পদ)।

আবার অন্যরা কেউ কেউ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে চলে গিয়েছিল। একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, দামেস্ক এবং আন্তিয়খিয়াতে যারা গিয়েছিল তারা সকলেই সাধারণ খ্রীষ্টিয়ান এবং তারা ছিল যিরূশালেম মণ্ডলীর আসল অংশ। ঈশ্বর তাড়নার মাধ্যমেই এইসব সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানদের দু'টো বিদেশী শহরে পাঠিয়েছিলেন যেন তারা সেখানে গিয়ে সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে পারে।

যাইহোক, এটা কিন্তু মনে করা স্বাভাবিক যে, দামেস্কে পৌঁছে ঐ খ্রীষ্টিয়ানেরা বেশ উদ্যোগ সহকারে এবং জোরেসোরে প্রচার কাজ করেছিল। হতে পারে, তারা বাজারে বাজারে চিৎকার করে প্রচার করেছিল অথবা কোন বাজনা বাজিয়ে গানও করেছিল। যেভাবেই হোক না কেন, ঐ অঞ্চলের যিহূদীরা কিন্তু এক 'নতুন মত' প্রচার করতে দেখে বিগড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, এই ধর্মমত আগেই যিরূশালেমে বেশ অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। তারা আবার, যিরূশালেমের যিহূদী নেতাদের কাছেও এই তথ্য জানিয়েছিল। অন্যদিকে, সুসমাচারে বিশ্বাসীরা দৃঢ়তার সাথে যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছিল তা যিহূদীদের কাছে তাদের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধীতা মনে হয়েছিল। তাছাড়া, পরদেশে বাসকারী ঐ অঞ্চলের যিহূদীদের কাছে তাদেরই মত যিহূদীদের দ্বারা এই 'ভ্রান্ত মত' দৃঢ়তার সাথে প্রচার করা যেন বেশ লজ্জার বিষয় বলেই তারা মনে করেছিল।

যিরূশালেমের যিহূদী নেতারা এই নতুন প্রচলিত ধর্মমত দ্রুত নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। তাই যিহূদী ধর্মে উদ্যোগী একজন তরুণ যুবক স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছিল কারা এই নতুন মতের অনুসারী, যেন তারা পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেই হোক না কেন, তাদের সকলকে যিরূশালেমে বেঁধে নিয়ে আসা যায় (প্রেরিত্ ৯:২ পদ)। এই যুবকের নাম শৌল, যিনি পরে পৌল বলে অভিহিত হয়েছিলেন। বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে দামেস্কের রাস্তায় তিনি এক স্বর্গীয় আলোর মুখোমুখি হন। তিনি আসলে মহিমা ও উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরা পুনরুত্থিত যীশুর দেখা পান। প্রভু যীশুর উজ্জ্বল দীপ্তি আক্ষরিক অর্থেই তাকে হত-বিহ্বল করেছিল এবং তাকে তিন দিন অন্ধ করে রেখেছিল।

প্রভু শৌলকে বলেছিলেন, "এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে" (প্রেরিত্ ৯:৬ পদ)। এরই মধ্যে যীশু দর্শনের মাধ্যমে দামেস্কে বসবাসকারী অননিয় নামে একজন ব্যক্তিকে বললেন, "সোজা নামে যে রাস্তাটা আছে তুমি সেই রাস্তায় যাও। সেখানে যিহূদার বাড়ীতে শৌল বলে তার্ষ শহরের একজন লোকের খোঁজ কর। সে প্রার্থনা করছে...." (প্রেরিত্ ৯:১১ পদ)। যীশুর নির্দেশ পেয়ে অননিয় যিহূদার বাড়ীতে গিয়ে শৌলের সাথে দেখা করলেন এবং তার উপরে হাত রাখলেন। আর তখনই শৌল দেখবার শক্তি ফিরে পেলেন ও বাপ্তিস্ম নিলেন। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে শৌল হয়েছিলেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। সেজন্য শৌলের পক্ষে আর যিরূশালেমে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ সেখানে যিহূদীদের কাছে তিনি বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত হবেন।

এরকম অবস্থায় শৌল বাধ্য হয়ে আরবে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে তিনি ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করেছিলেন এবং যীশুর সাথে তার আত্মিক সম্পর্ক গভীর করে তুলেছিলেন। দামেস্কে ফিরে আসার আগে এভাবেই তিনি একজন নিভৃত ভ্রমণকারী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি দামেস্কে ফিরে আসলেন, তখন সেখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা যিরূশালেমে যাবার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন যেন প্রেরিত্দের সাথে তার সহভাগিতা গড়ে উঠে এবং তাদের সাথে কথা বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি সত্যিই একজন পরিবর্তিত মানুষ। এভাবে উৎসাহিত হয়ে তিনি যিরূশালেমে গেলেন যেন পিতর ও অন্যান্য প্রেরিত্দের সাথে দেখা করতে পারেন। কিন্তু যিরূশালেমের অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান, এমন কি প্রেরিতেরাও পৌলের সাথে দেখা করতে অনিচ্ছুক হয়েছিলেন। পৌলের মন পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ কাজ করছিল। যেহেতু, মাত্র কিছুদিন আগেও তিনি উৎসাহের সাথে খ্রীষ্টিয়ানদের তাড়না করেছিলেন (গালাতীয় ১:১৭-১৮ পদ)।

পৌলের দশ বছরের প্রশিক্ষণ

মূলত, প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য যেমন যীশুর এক মহাপরিকল্পনা ছিল, ঠিক তেমনই ছিল পৌলের জন্যও। তিনি পৌলকে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে দেখেছিলেন যিনি মধ্যপ্রাচ্যে, এশিয়া মাইনরে ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারকারী হতে যাচ্ছেন। সত্যি করেই পৌল ছিলেন একজন ঈশ্বরের লোক, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা একজন ব্যক্তি। তবুও লোকেরা পৌলকে সেভাবে চিনতে পারে নাই। এমনকি মণ্ডলীর ধর্মীয় নেতারা পর্যন্ত তার প্রৈরিতিক অধিকার মানতে চান নাই এবং তার সাথে সহযোগিতা করতেও অস্বীকার করেছিলেন। তার অবস্থান সত্যিই বেশ প্রতিকূল হয়েছিল। নতুন করে যোগ দেওয়া ব্যক্তি হিসাবে তিনি খ্রীষ্টিয়ান সমাজের সহানুভূতি অর্জন করতে পারেন নাই। অন্যদিকে, তার পুরানো যিহূদী বন্ধুরা শত্রুভাবাপন্ন হয়েছিল এবং তাকে মেরে ফেলতেও চেষ্টা করছিল।

এরকম একটি সময়ে খ্রীষ্টিয়ান সমাজ যখন পৌলের সাথে চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছিল এবং যিহূদী নেতারা দেখাচ্ছিল মৃত্যুভয়; ঠিক সেই সময় বার্ণবা নামে একজন ব্যক্তি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পৌল সম্পর্কে সবই জানতেন। তিনিই তাকে নিয়ে গিয়ে প্রেরিত্ পিতর ও প্রেরিত্ যাকোবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন (গালাতীয় ১:১৮-১৯ পদ)। পিতর ও যাকোব নিতান্তই অনিচ্ছা নিয়ে পৌলের সাথে দেখা করেছিলেন; এমন কি যদিও ধর্মান্ধ যিহূদীদের কারণে যিরূশালেমে তার অবস্থান ছিল বিপদজনক, তবুও তারা তাকে রক্ষা করতেও চেষ্টা করেন নাই। পৌলের কয়েকজন বন্ধু তাকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাকে মেরে ফেলতে সুযোগ পাবার আগেই পৌল যিরূশালেম থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় তিনি মাত্র পনেরো দিন যিরূশালেমে থাকতে পেরেছিলেন।

পরবর্তীতে, পৌল তার নিজের দেশ অর্থাৎ তার্ষ শহরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে প্রায় সাতটি বছর নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়েছিলেন। তাই একথা বলা যায় যে, যীশু খ্রীষ্টের সাথে দেখা হওয়ার পর, তিনি প্রায় জন-বিবর্জিত হয়ে একা একা জীবন কাটিয়েছিলেন। অন্যদিকে তার জাগতিক বন্ধুরা, যারা তাকে আগে থেকে জানত তারা তাকে একজন ব্যর্থ মানুষ হিসাবেই দেখেছিল। কারণ তিনি নিজে পুরোপুরি জাগতিকতাকে অস্বীকার করে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। যাইহোক, এই সাতটি বছর তার্ষ শহরে থাকতে থাকতে আত্মিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পৌলের আত্মিক জীবন ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠেছিল। এমন কি তিনি "তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত" যাবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসন অবস্থিত (২ করিন্থীয় ১২:২ পদ)।

প্রায় ৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় দামেস্কের রাস্তায় যীশুর সাথে পৌলের দেখা হয়। তাহলে ৩০ বছর বয়সের সময় তিনি যীশুর দেখা পান। ৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যখন অননিয়কে ডেকে পৌলের সাথে দেখা করতে বলেছিলেন এবং পৌল সম্বন্ধে কিছু বিষয় তার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, তখন ঈশ্বর বলেছিলেন- পৌল মাতৃ জঠর থেকে অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তাঁর মনোনীত (প্রেরিত্ ৯:১৫ পদ)। যাইহোক, পৌলের জীবনের তিরিশটি বছর যীশুর বিষয়ে অজ্ঞ রাখাও ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল। তাছাড়া, তাকে বিশ্বাসীদের সক্রিয় তাড়নাকারী করাও নিশ্চয় তাঁরই পরিকল্পনা। তথাপিও পৌলের সারা জীবন ব্যাপী ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা সে সম্পর্কে কেউই সচেতন ছিল না।

তার মন পরিবর্তনের পর, পৌল আরব দেশে চলে যান এবং তিন বছর সেখানে থাকেন। তারপর তিনি দামেস্ক হয়ে যিরূশালেমে আসেন এবং ১৫ দিন সেখানে থাকেন (গালাতীয় ১:১৭-১৮ পদ)। তারপর তিনি কৈসরিয়া থেকে জাহাজে করে তার্ষ শহরে যান এবং ৭ বছর তার নিজের দেশে থাকেন (প্রেরিত্ ৯:৩০ পদ)। যাইহোক, তিনি লোকজনের অজ্ঞাতে প্রায় ১০টি বছর একা একা থেকেছিলেন। তখন তার বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর।

এরই মধ্যে যিরূশালেম মণ্ডলীর অত্যাচারিত খ্রীষ্টিয়ানেরা যারা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা আন্তিয়খিয়াতে মণ্ডলী স্থাপন করেছিল। এখান থেকেই তারা অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আরম্ভ করেছিল। এই পরিচর্যা কাজের বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রেরিত্ ১১:১৯-২০ পদে দেখতে পাই:

"স্তিফানকে কেন্দ্র করে বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচারের দরুন যারা ছড়িয়ে পড়েছিল তারা ফৈনীকিয়া, সাইপ্রাস ও সিরিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত গিয়ে কেবল যিহূদীদের কাছেই ঈশ্বরের বাক্য বলল। কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন আন্তিয়খিয়াতে গিয়ে গ্রীক ভাষায় কথা বলা লোকদের কাছেও প্রভু যীশুর বিষয়ে সুখবর প্রচার করতে লাগল। এরা ছিল সাইপ্রাস দ্বীপ ও কুরীণী শহরের লোক।"

প্রথম দিকে যিরূশালেম মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাগণ অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিল। এর প্রাথমিক কারণ, তাদের মধ্যে ছিল গভীর জাতিগত মতাদর্শ। সে কারণেই ঈশ্বর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে প্রথম যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের ঠেলে দিয়েছিলেন যেন তারা যিরূশালেমের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করতে পারে (প্রেরিত্ ৮:১ পদ)। যদি যিরূশালেম মণ্ডলীর মত আমাদের মণ্ডলীগুলো এখন পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার না করে নিষ্ক্রিয় এবং নিস্তেজ হয়ে বসে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের বেড়ে ওঠার আশা করা ঠিক হবে না। আর নিশ্চয়ই আমাদের বিশ্বাস আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্বীকৃত হবে না এবং আমাদের মণ্ডলীগুলো ছিন্নভিন্নও হয়ে যেতে পারে। বিগত দু'হাজার বছরের মণ্ডলীর ইতিহাসে ঠিক এটাই স্পষ্ট দেখা গেছে। কারণ একটি গীর্জাঘরের বাইরের চেহারা দেখে অথবা গীর্জায় উপস্থিত জনসংখ্যা দেখে বিচার করা সম্ভব নয় যে, সেই মণ্ডলী ঈশ্বরের আশীর্বাদ কতটা লাভ করেছে অথবা তাদের আত্মিক মানদন্ড কি রকম। যদি সুসমাচারের জন্য আমরা নিজেদের একান্তভাবে উৎসর্গ না করি, ঠিক যিরূশালেম মণ্ডলীর মত আমাদের মণ্ডলী যতই বড় হোক না কেন, তবুও আমরা ঈশ্বরের আদেশের বিপক্ষে।

বাইবেলে উল্লেখিত খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে বার্ণবার আন্তিয়খিয়া মণ্ডলী পরিদর্শনের বিষয় আমরা দেখতে পাব (প্রেরিত্ ১১:২২ পদ)। সেখানে লেখা হয়েছে যে, আন্তিয়খিয়া মণ্ডলী বেড়ে উঠেছে এবং অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। এই খবর যিরূশালেমের প্রাচীনেরা জেনে বার্ণবাকে খোঁজ-খবর করার জন্য সেখানে পাঠালেন। পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে অতি স্পষ্ট করেই বলেছে, বার্ণবা যখন আন্তিয়খিয়াতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন, "ঈশ্বর যে কিভাবে আন্তিয়খিয়ার লোকদের দয়া করেছেন", এমন কি দেখতে পেলেন অযিহূদীরাও কিভাবে দয়া পেয়েছে। সম্ভবতঃ অন্যদের চেয়ে বার্ণবা 'ঈশ্বরের অনুগ্রহ' সম্পর্কে বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন; যদিও তিনি যিরূশালেমের যিহূদীদের কাছে বিদেশী, অর্থাৎ সাইপ্রাসের লোক ছিলেন। বার্ণবা দেখেছিলেন যে অযিহূদীরা সুসমাচার শুনছে এবং উদ্ধার পাচ্ছে এতে কোন ভুল নাই। তাই "তারা যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুর কাছে বিশ্বস্ত থাকে সেই জন্য তিনি তাদের সকলকে উৎসাহ দিতে লাগলেন" (প্রেরিত্ ১১:২৩ পদ)।

বার্ণবা পৌলকে আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে নিমন্ত্রণ দিলেন

বার্ণবা যখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করছিলেন, তখন পৌলের কথা তার মনে পড়ল, যার সাথে তার সাত বছর আগে দেখা হয়েছিল। বাস্তবিক যীশুই তাকে পৌলের বিষয়ে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। আন্তিয়খিয়াতে একত্রে পরিচর্যা কাজ করার জন্য তিনি পৌলকে অনুরোধ করে নিয়ে আসলেন। অবশ্য পৌল যেখানে থাকতেন, সেই তার্ষ শহর থেকে আন্তিয়খিয়ার দূরত্ব খুব বেশী ছিল না। বাইবেল বলে, বার্ণবা একটু ইতস্তত না করেই পৌলের খোঁজে তার্ষ শহরে গিয়েছিলেন (প্রেরিত্ ১১:২৫ পদ)। যেহেতু তিনি আত্মার নির্দেশ মতই তার্ষ শহরে গিয়েছিলেন সেহেতু আন্তিয়খিয়া থেকে যেতে তিনি দেরী করেন নাই।

এটি সত্যিই একটি আদর্শ উদাহরণ। কারণ যিরূশালেম মণ্ডলী থেকে বার্ণবাকে আন্তিয়খিয়া মন্ডলীর খোঁজ-খবর করতে তথা পরিচর্যা করতে পাঠানো হয়েছিল। যদি বার্ণবা বর্তমান সময়ের অধিকাংশ পালকদের মত হতেন, তাহলে তিনি হয়তোবা চাইতেন না যে, পৌল তার সাথে একত্রে কাজ করেন। বার্ণবা অবশ্য এও জানতেন, পৌল তার চেয়ে অনেক উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি এও জানতেন, পৌল খুবই জ্ঞানী ও যোগ্যতা সম্পন্ন। যদি পৌল পরিচর্যায় যোগ দেন তাহলে বার্ণবা হয়তো মণ্ডলীতে তার নেতার স্থান হারাবেন। যাইহোক, বার্ণবা সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের একজন ব্যক্তি ছিলেন। সেজন্য পরিচর্যা কাজে পৌলকে আনতে তিনি

ঈশ্বরের আদেশ অতি সত্ত্বর পালন করেছিলেন। তিনি তার্ষ শহরে উপস্থিত হয়ে অল্প খুঁজেই পৌলকে পেয়েছিলেন।

এই ঐতিহাসিক দেখা-সাক্ষাতের সময় তাদের কথাবার্তাগুলো আমরা কল্পনা করতে পারি! হয়তো শুরুটা এ রকমই হয়েছিল: 'যদি ভুল না হয়, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই পৌল?' 'হ্যাঁ, ঠিক। আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?' আমরা এও কল্পনা করতে পারি, একা থাকতে থাকতে পৌল বেশ হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি খ্রীষ্টিয়ান সঙ্গী সাথীরাও তাকে প্রত্যাখান করেছে। ঠিক এমন এক সময়ে, বার্ণবা তাকে দেখতে এসেছেন। এখন তিনি হয়তো ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, দেখতেও বিষন্ন প্রায়! 'আচ্ছা, আপনি কি আমাকে ঠিক চিনতে পারছেন?' 'না তো, ঠিক চিনতে পারছিনা, আপনি কে?' 'সাত বছর আগে যিরূশালেমে আমাদের দেখা হয়েছিল!' 'ওহো, তাইতো, এখন মনে পড়েছে। আপনি নিশ্চয় বার্ণবা, তাই না?' 'ঠিকই বুঝতে পেরেছেন।' 'হু, তার্ষ শহরে কি জন্য এসেছেন?' 'আমি আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর দায়িত্বে আছি; এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি আমার সাথে সেখানে যান। আমরা তাহলে একসাথে প্রভুর পরিচর্যা কাজ করতে পারি।' অতঃপর, তারা উভয়ে একমত হয়েই আন্তিয়খিয়াতে এসেছিলেন (প্রেরিত্ ১১:২৬ পদ)। মনে হয়, আন্তিয়খিয়াতে আসার ব্যাপারে বার্ণবার দৃঢ় সঙ্কল্প পৌলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যিরূশালেমে থাকতেই তিনি প্রেরিত্দের মত বিসদৃশ আচরণ না করে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং উৎসাহিতও করেছিলেন। পৌলের জন্য বার্ণবা ছিলেন একজন অবিস্মরণীয় বন্ধু এবং যার কাছে তিনি সত্যিই কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঈশ্বর এই দু'জনের বিশেষ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই 'বিশ্বব্যাপী সুসমাচার' প্রচার আন্দোলনের ভিত্তিমূল-দু'টি স্তম্ভ হিসাবে তাদের স্থাপন করেছিলেন। যদি পৌলের সাথে বার্ণবার সম্পর্ক ভাল না থাকত, তাহলে তিনি সম্ভবত বার্ণবার আহ্বানে রাজি হতেন না।

এই দু'জনের সাক্ষাতের সময় আমি অবশ্যই সাক্ষী ছিলাম না। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের এই দু'জন মহান কৃতি পুরুষের এমনই একটি ছবি আমরা আমাদের মনের ভেতরে আঁকতে পারি। তারা দু'জনে এক সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন। তারা যে বিশাল কাজের দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন, তা মনশ্চক্ষে দেখেছেন। কি এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য! এটাই ছিল প্রেরিত্ ১:৮ পদের পরিপূর্ণতার শুরু। এই প্রতিজ্ঞা আমাদের প্রভু যীশু স্বর্গে যাবার আগে তাঁর শিষ্যদের কাছে করেছিলেন। এটা এমন এক আন্দোলন, যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে এবং কোটি কোটি প্রাণ উদ্ধার পেতে যাচ্ছে। শুরুটা যদিও সাধারণ, তবু তার্ষ শহরের এই সাক্ষাতকার ছিল বিশাল গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রভু যীশু নিশ্চয়ই সেই বিশেষ মুহূর্তে স্বর্গে আনন্দ করেছিলেন।

অতঃপর, পৌল (শৌল) আন্তিয়খিয়াতে বার্ণবা পরিচালিত মণ্ডলীতে তার সাথে একত্রে কাজ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রেরিত্ ১৩:১ পদে আমরা এ বিষয়ে তথ্য পাই। শৌল সেখানকার মণ্ডলীর পাঁচজন নেতার মধ্যে একজন হয়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা বার্ণবার সাথে সহকারী বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা হিসাবে শিমোনও ছিলেন। এই শিমোন বেশ কয়েক বছর আগে প্রভু যীশুর ক্রুশটি বহন করেছিলেন।

আজকের দিনে আমরা যেভাবে বলে থাকি সেভাবে শৌল মণ্ডলীর সহকারী পালকের দায়িত্বে রত ছিলেন। বলা যায়, পালকীয় দায়িত্ব পালনের কাজটি তিনি একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করেছিলেন। যদিও আগে থেকেই শৌলের সুগভীর জ্ঞান ও যোগ্যতা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত ছিল। শৌল প্রায় এক বছর ধরে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের অধীনে থেকে আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীতে তার পরিচর্যাকাজ করেছিলেন।

যাইহোক, আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠ পালক বার্ণবার জন্য এবং বয়োকনিষ্ঠ পালক শৌলের জন্য পবিত্র আত্মার পরিকল্পনা ছিল একেবারে আলাদা। পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে সুসমাচার প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদের নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। একদিন যখন বিশ্বাসীরা উপবাস সহকারে প্রার্থনায় রত, তখন পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর উপাসনাকারীদের কাছে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন যেন এই দুই ব্যক্তিকে আলাদা করে রাখা হয় (প্রেরিত্ ১৩:২ পদ)। তাই আন্তিয়খিয়ার খ্রীষ্টিয়ানেরা তাদের মাথায় হাত রেখে 'বিশ্ব প্রচার' মিশনের কাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (প্রেরিত্ ১৩:৩ পদ)।

বার্ণবা ও শৌলের প্রথম যাত্রা স্থান ছিল জাহাজে করে প্রায় দুই ঘন্টার সমুদ্রপথ সাইপ্রাস দ্বীপ। শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই শৌল তার সুপ্ত ক্ষমতাকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাতে শুরু করেছিলেন। তারা যখন জনতার সামনে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে শুরু করেছিলেন, তখন শৌল সামনে দাঁড়িয়ে তার মহান নেতাসুলভ আচরণ প্রকাশ করেছিলেন। আর বার্ণবা পিছন থেকে তাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ঠিক এরকম এক সময়ে শৌল তার নতুন নাম "পৌল" বলে পরিচিত হন (প্রেরিত্ ১৩:৯ পদ)।

বার্ণবা ও পৌলের চারিত্রিক পার্থক্য

আগের অধ্যায়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছি যে, বার্ণবা ছিলেন একজন সত্যিকার উৎসাহদাতা। পৌলের প্রতি তার সমর্থনের মনোভাব থেকেও আমরা তার প্রমাণ দেখতে পাই। তিনি পৌলকে সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। বার্ণবার প্রচেষ্টা ও বাধ্যতার ফলে এবং নিমন্ত্রণ করে পৌলকে আন্তিয়খিয়াতে আনার ফলেই তিনি 'বিশ্ব প্রচার' অভিযানে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বার্ণবা পৌলকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং সংগঠিত করেছিলেন যেন তিনি ঈশ্বরের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর বার্ণবাকে বিশেষ করে প্রস্তুত করেছিলেন যেন তিনি এই নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন।

বাস্তবিকই, খ্রীষ্ট ধর্মের সবচেয়ে সুখ্যাতিপূর্ণ প্রভাবশালী বিশ্ব-প্রচারক পৌলের সহকর্মী হতে ঈশ্বর ঠিক কেউ একজনকে মনোনীত করেন নাই। খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, পৌলের সাথে বার্ণবার দেখা হওয়াটা ছিল ঈশ্বরীয় প্রস্তুতি পরিকল্পনার অংশ। প্রভুর পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি পৌলকে সমর্থন দিয়েছিলেন। সেই সাথে, তিনি পৌলকে তার কাজের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে, নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন; এমন কি পৌলের সুপ্ত ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই দু'জন ব্যক্তিত্বের একসাথে হওয়া হঠাৎ করে ঘটা কোন বিষয় নয়, কিন্তু এর পিছনে ছিল ঈশ্বরের নিখুঁত ও ঐশ ইচ্ছা এবং তাঁর কাজের জন্য প্রস্তুতি।

আমরা যদি বার্ণবার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটু কাছাকাছি দেখতে চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এটাই বুঝতে পারব যে, বার্ণবার ছিল এক চমৎকার 'উষ্ণ পরোপকারী' এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়। যীশুর কিছু কিছু গুণ বার্ণবার মধ্যেও ছিল। এখানে আর একবার উল্লেখ করা দরকার যে, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট শিল্পকর্মে বার্ণবার জীবনের প্রতিটি গুণাবলী অংকিত হয়েছিল। তার ছেলেবেলা থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঈশ্বরের তৈরি পথেই তিনি হেঁটেছিলেন। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বোন মরিয়ম ছিলেন ভক্তিপূর্ণ চরিত্রের, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে, এমন কি তার ছেলে মার্ককে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

পবিত্র বাইবেল বার্ণবাকে একজন 'ভাল মানুষ' বলে চিহ্নিত করেছে, যিনি "পবিত্র আত্মাতে এবং বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন"। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনি একজন ঈশ্বর মনোনীত ব্যক্তি, যার অনেক দান ও বিশেষ দক্ষতা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল। তার এই গুণ ও যোগ্যতা একদিনে গড়ে উঠে নাই। প্রস্তুতি মানে আমরা বুঝি, সারা জীবন ব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ক্রমাগত রূপান্তরিত হওয়া। বার্ণবা আস্তে আস্তে, কিন্তু অটলভাবে ঈশ্বরের পছন্দের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। বলা চলে, বার্ণবার ছিল গুরুত্বপূর্ণ উন্নত ব্যক্তিত্ব এবং ভাল স্বভাব। এসব গুণাবলীর প্রেক্ষিতে তিনি পৌলের প্রধান সমর্থনকারী হয়েছিলেন এবং বিশ্বস্ত সহকারী হিসাবে কাজ করতে পেরেছিলেন। আমরা এও জানি, বার্ণবার সমর্থন ছাড়া পৌল ঈশ্বরের মহান দাস হতে পারতেন না।

বার্ণবার স্বাভাবিক নম্রতার আচরণে অনুপ্রাণীত পৌল অবশেষে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। বার্ণবা তার নিজস্ব দায়িত্ব ও প্রতিপত্তি তার উপরে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কারণ পৌল আর একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। এ কারণেই, দৃশ্যপটে পৌলের উপস্থিত হবার পরে বাইবেলে বার্ণবাকে খুব একটা দেখা যায় না। তিনি তার করণীয় কাজ শেষ করেছিলেন এবং নিজেকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছিলেন।

অন্যদিকে, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে পৌল বরং মাথা গরম এবং দ্রুতগতিতে কর্ম সম্পাদনে তৎপর একজন ব্যক্তি বলা যায়। এই কারণে প্রায়ই অন্যদের সাথে তার দ্বন্দ্ব ঘটতো। যেমন- আমরা জানি, পৌলের দ্বিতীয় মিশনারি সফরের আগে পৌল ও বার্ণবার মধ্যে মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল। যোহন- যাকে মার্ক বলা হয়, তাকে সফর সঙ্গী করাকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে মতের অমিল হয়েছিল (প্রেরিত্ ১৫:৩৯ পদ)।

তাদের এই মতের অমিল এতটাই বেশী হয়েছিল যে, পৌল ও বার্ণবা আলাদা হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও, পৌলের সাথে বারোজন শিষ্যেরও খুব ভাল সম্পর্ক ছিল না, যে জন্য তিনি গালাতীয় ২:৬ পদে লিখেছেন: "মণ্ডলীর গণ্যমান্য লোকেরা সুখবরের বিষয়ে নতুন কিছু আমাকে জানান নি। আসলে তাঁরা যা-ই হন না কেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" মণ্ডলীর অন্যান্য নেতাদের সাথে পৌলের এই কঠিন সম্পর্ক, তার ব্যক্তিত্বের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

এমন একটা সময় এসেছিল যখন পৌল পিতরের 'মুখের উপরে' আপত্তি করেছিলেন। প্রথম জীবনে খ্রীষ্টিয়ানদের তাড়নাকারী পৌল বারোজন শিষ্যের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে তিরষ্কার করেছিলেন (গালাতীয় ২:১১ পদ)। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, পৌলের ব্যক্তিত্ব ছিল উষ্ণ, অধৈর্য্য এবং কখনও বা কঠোর। তাকে সংযত রাখতে ঈশ্বর শান্ত, নরম স্বভাবের বার্ণবাকে তার সমর্থনকারী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাছাড়াও ঈশ্বর পৌলকে নানা দুঃখ ও কষ্টভোগ করতে দিয়েছিলেন যেন তিনি তার পক্ষে এক আদর্শ দাস হিসাবে বেড়ে উঠতে পারেন। নানারকম পরীক্ষা ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কুমোরের মত ছেনে তাঁর সৃষ্ট দাসকে তাঁরই হুবহু পছন্দের আকার দিয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১১:২৩-৩০ পদ)।

পৌলের জীবন আরও ভাল করে বোঝার জন্য আমি এখানে তার জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান ঘটনার সময়কাল ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি। পৌল ৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৩০ বছর বয়সে (প্রেরিত্ ৯:৪ পদ) দামেস্কের রাস্তায় যীশুর সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী ৩ বছর তিনি আরব দেশে ঘুরে বেড়ান এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দামেস্কে ফিরে আসেন। তারপর তিনি প্রায় দুই সপ্তাহের জন্য যিরূশালেমে যান (গালাতীয় ১:১৭-১৮ পদ)। পরবর্তী ৭ বছর তিনি তার নিজের দেশ তার্ষ শহরে থেকে পরিচর্যাকাজে সময় কাটান (প্রেরিত্ ৯:৩০ পদ)।

৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, ৪০ বছর বয়সে পৌল তার বন্ধু বার্ণবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আন্তিয়খিয়াতে যান। তিনি সেখানে আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর প্রাচীনদের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রায় এক বছর মণ্ডলীর সেবা কাজ করেন। ৪৬ থেকে ৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়, তিনি বার্ণবাকে সাথে নিয়ে তার প্রথম মিশনারি সফরের সূচনা করেছিলেন। ৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি আরও দু'টি মিশনারি সফর পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করেছিলেন। তারপরে, তার পরিচর্যাকাজ বাধা প্রাপ্ত হয়। কারণ ৬০ থেকে ৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি প্রায় ১৪ বছর ধরে 'বিশ্ব প্রচার মিশন' ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন এবং মণ্ডলী স্থাপন করেন। ৫৫ বছর বয়সে তিনি আবার জেলে বন্দী হন। ঐ কালের বয়স হিসাবে তাকে যথেষ্ট প্রাচীন বলা যায়।

এটা জানা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ যে, পৌল এমন পালক ছিলেন না যার ইচ্ছা বিরাট মণ্ডলী স্থাপন করা। তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ সময়ের জন্যই মিশনারি এবং সেজন্য তিনি কখনই কোন স্থানে তিন বছরের বেশী থাকেন নাই। এক স্থান থেকে কাজ শেষ করে তিনি আর একটি স্থানে গিয়েছেন। এক মিশন ক্ষেত্র থেকে অন্য এক মিশন ক্ষেত্রে গিয়েছেন। এই সবই তিনি পবিত্র আত্মার পরিচালনায় সম্পন্ন করেছেন। তারপরেও, তারই স্থাপিত মণ্ডলীগুলোর পরিচর্যার জন্য তার ছিল লাগাতার সাহায্য দেবার শক্তি। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর একা একা এবং বেশ সমস্যা ও কষ্টের মধ্যে থাকার ফলে তার স্বভাবজাত ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

দু'টি বছর জেলে বন্দী থাকার সময়ে তিনি চারটি চিঠি লিখেছিলেন। একটি ইফিষীয়দের কাছে, একটি ফিলিপীয়দের কাছে, আর একটি কলসীয়দের কাছে এবং একটি ফিলীমনের কাছে লিখেছিলেন। তার আগে, তার লেখা অন্য দু'টি চিঠির চেয়ে এই চারটিতে তার বেশ অনেক পরিপক্কতা এবং নরম মেজাজের প্রতিফলন দেখা যায়। এজন্যই তিনি ইফিষীয়দের কাছে সুপারিশ করতে পেরেছিলেন যেন তারা ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করে শান্তির অনুসন্ধান করে ও ভালবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যকে ক্ষমা করতে পারে। ফিলিপীয় ২:৫ পদে

এরকম আরও একটি উদাহরণ তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন, "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল তা যেন তোমাদের অন্তরেও থাকে।" চিঠির পাঠক-পাঠিকাদের তিনি বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন যেন তারা একে অন্যকে বোঝে ও ধৈর্য ধরে। (এর আগে তিনি আরও ছয়টি চিঠি লিখেছিলেন, তাই না?)

৬২ বছর বয়সে, ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পৌল তার চতুর্থ প্রচার অভিযানের সময় দ্বিতীয় বারের মত জেলে বন্দী হয়েছিলেন। ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শহীদ (সাক্ষ্যমর) হন। কিন্তু শহীদ হবার অল্পদিন আগে, তিনি তার আত্মিক পুত্র তীমথিয়ের কাছে তার দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছিলেন। এই চিঠিতে পৌল তীমথিয়ের কাছে তার শেষ কিছু উপদেশ ও সুপারিশ রেখেছিলেন। এতে অনেক পদ উল্লেখিত আছে, যেখানে বলা হয়েছে, কার সাথে আমরা উঠা-বসা করতে পারি, কার সাথে মেলামেশা করা উচিত না এবং কাদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান থাকা উচিত। তিনি একটি তালিকা তৈরি করে তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, যারা তার দুঃখ-কষ্টের সময় তাকে সাহায্য করেছে। তাছাড়াও, তিনি আরও একটি তালিকা তৈরি করেছেন, যারা তাকে পরিত্যাগ করেছিল। এখানে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পৌলের এই শেষের দিকের লেখাগুলো পরিচর্যার বিষয় না হয়ে মানবিক সম্পর্কের বিষয় কেন্দ্রিক হয়েছিল।

এর কারণ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পৌলের ব্যক্তি জীবনে খুবই নম্রতা এসেছিল, যা অনেক পরিমাণে খ্রীষ্টের চরিত্র সদৃশ। বার্ণবার কাছ থেকে তার আলাদা হয়ে যাবার কারণ হচ্ছে, তিনি খুব দয়ালু মনোভাবের ছিলেন না এবং প্রথম দিকে খুব একটা স্থির স্বভাবেরও ছিলেন না। পৌলের জীবন প্রথম থেকেই উগ্র ও অধৈর্য মনোভাবের ছিল, যা ঈশ্বরের হাতে ক্রমশ নিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়োজন হয়েছিল। এজন্য সময়ের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক ছিল। কোন কোন দিকে বার্ণবাকে পৌলের চেয়ে অনেক ভাল বলতে পারি। কারণ খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তিনি ছিলেন দয়ালু, নরম মেজাজের, সকলের কাছে বিশ্বস্ত ও সুবিবেচক।

এই দু'জন একেবারে ভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেতে পারি। খ্রীষ্টিয়ান পরিচর্যার ক্ষেত্রে পৌল ও বার্ণবার মতন দু'ধরনের কার্যকারী রয়েছে, যারা পৌলের মত আত্মিক শক্তিধর নেতা ও বার্ণবার মত বিশ্বস্ত সহকারী। একজন আত্মিক সহকারী বা সমর্থনকারীর কাজই হচ্ছে পালককে শক্তিশালী করে তোলা যেন তিনি তার মেষদের (সদস্য-সদস্যাদের) যথাযথ যত্ন নেবার জন্য পরিবর্তনের রাস্তা তৈরি করে দিতে পারেন। বার্ণবা ছিলেন সত্যিই একজন আদর্শ সমর্থনকারী। তাই পৌল ঠিক যেমন ছিলেন; বার্ণবা তাকে ঠিক সেখান থেকেই তার নিজের সব গুণ ও যোগ্যতা দিয়ে তাকে সঠিক অবস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন।

একজন নেতার বিশ্বস্ত সহকারী দরকার

যে কোন জাতি পরিচালনার জন্য একজন প্রধান নেতা থাকেন। এরকম নেতা হচ্ছেন একটা দেশের প্রেসিডেন্ট। তাকে আবার সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য মন্ত্রীদের এবং সহকারীর প্রয়োজন হয়। প্রেসিডেন্ট যতই প্রতিভাধর, শিক্ষিত এবং যোগ্য হন না কেন, যদি তার সহকারীগণ উপযুক্ত না হন তাহলে তিনি সঠিকভাবে দেশকে পরিচালনা দিতে পারবেন না। মণ্ডলীতে বা সরকারে যেখানেই হোক, দল নেতাদের জন্য 'বার্ণবার মত' লোক অবশ্যই দরকার হয়, যে কিনা নেতার গুণাবলীকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিতে তৎপরতা দেখাবে। একজন নেতা যদি বার্ণবার মত একজনকে পায়, তাহলে তিনি খুবই খুশী থাকবেন।

উৎসাহদাতা বার্ণবার কথা চিন্তা করলেই আরও একটি উদাহরণ আমার মাথায় আসে। দশ বছর আগে আমেরিকার শিকাগো শহরের কোরিয়ান মণ্ডলীতে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার বয়োজ্যেষ্ঠ পালক বেশ ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি তার কথাবার্তায় কিছুটা অসতর্ক ছিলেন। এমন কি, তিনি তার প্রচারের সময় অদ্ভুত ও হাস্যকর কথাবার্তা বলতেন। মণ্ডলীতে বেশ ক'জন সদস্য-সদস্যা তার ভুলকে সমর্থন দিতে অনিচ্ছুক ছিল।

একদিন এই পালক কোরিয়ার সিউলে একটি মণ্ডলী পরিদর্শনে যান। সেখানে একজন তাকে একটা সোনার আংটি দিয়ে বলেছিলেন যেন তিনি এটা শিকাগোতে তার মণ্ডলীর একজন সদস্যের কাছে তা পৌঁছে দেন। পালক শিকাগোতে ফিরে এসে প্রাপককে আংটিটা পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন একটা বিদ্বেষমূলক আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি অলংকারটি নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন। এতে মণ্ডলীতে বিশৃংখলতা দেখা দিতে শুরু হয়েছিল। ঠিক এরকম ঘটনা মণ্ডলীর রাজনীতিতে ঘটে থাকে। এই গুজব মণ্ডলীর প্রাচীন ও কর্মচারীদের সাধারণ সভায় আলোচিত হলো। এভাবে মণ্ডলীতে দু'টো ভাগও সৃষ্টি হয়ে গেল। একদল, যারা পালককে বিশ্বাস করে, আর অন্য দলটি বিশ্বাস করে না। যাইহোক, সাধারণ সভা কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েই শেষ হল। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, তাদের পালক ঈশ্বরের একজন বিশ্বস্ত দাস এবং অবশ্যই চোর নয়।

এরকম সিদ্ধান্ত ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। সেই মুহূর্তে সব কিছুতে সুশৃঙ্খলতা ফিরে এসেছিল। মণ্ডলীর সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষীতে আর কোন গুজব থাকল না। মণ্ডলীর পরিষদে সাতজন সদস্য-সদস্যা ছিলেন এবং সভার মধ্যে সকলেই চরম সংকটের মুহূর্তে বার্ণবার মত এক বাক্যে তাদের পালকের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন।

সেই কারণে, ভাল সাহায্যকারী সব সময়ই আমাদের জন্য দরকার এবং সেই সাথে ঈশ্বরের মণ্ডলীতে অবশ্য ভাল নেতাও দরকার। সকল মণ্ডলীতে যথাযোগ্য উৎসাহদাতা থাকলে যথার্থ ভাল পালকও তৈরি হবে।

কোন মণ্ডলীর উপাসনাকারীদের মধ্যে অবশ্যই অতিরিক্ত বুদ্ধিমান এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকেন যারা বিচার করতে ভালবাসেন, সমালোচনা করতে এবং জোর গলায় সব কিছুতে যুক্তি উপস্থিত করে থাকেন। এই ধরনের লোকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে মণ্ডলীর গঠনতন্ত্র দিন দিন নড়বড়ে হয়ে উঠছে।

আবার এর ঠিক বিপরীতে একটি মণ্ডলী যখন বার্ণবার মত সদস্য-সদস্যাতে পূর্ণ থাকে, তখন তা আস্তে আস্তে স্বাস্থ্যকর এবং তেজদীপ্ত ঈশ্বরের আবাসস্থান হিসাবে বেড়ে ওঠে। একটি মণ্ডলীতে অনেক বার্ণবা থাকলে প্রভু খুশী হবেন এবং তিনি সেই মণ্ডলীকে মহত্তর ভাবে ব্যবহার করবেন।

এক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, এখন আমাদের বর্তমান সমাজে পৌলের মত লোকের সংখ্যা না বার্ণবার মত লোকের সংখ্যা বেশী? যেমন- কোরিয়ার সমাজে বার্ণবার চেয়ে পৌলের সংখ্যাই বেশী। এটি কোরিয়ার সামাজিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, কোরিয়ানদের মধ্যে বার্ণবা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

মানব ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, যেখানে মহৎ লোকদের মহৎ কর্ম সিদ্ধির নেপথ্যে বার্ণবার মত লোকদের সাহায্যকারী হাত থাকায় তা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনেও তা ঠিক একই ভাবে হয়ে থাকে। এরকম সাহায্যকারীদের বলা হয় 'পরামর্শদাতা' এবং তাদের প্রভাব প্রায়শই আড়ালে থাকে ও লুকানো থাকে। মহৎ ব্যক্তিদের পিছনে এমন অনেক নাম থাকে, যা ইতিহাসে স্মরণীয়। তাদের বলা হয় বিজ্ঞ পরামর্শদাতা। এরাই সাধারণত মহৎ ব্যক্তিদের পিছনে থেকে সাহায্য করে থাকে। রেভারেন্ড ডেভিড ইয়ংগী চো, সারা পৃথিবীতে একজন মহান আত্মিক নেতা। তার শ্বাশুড়ি তার একজন পরামর্শদাতা, যিনি ডেভিডের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পিটার ওয়াগনার একজন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত, একজন ঈশ্বরের মানুষ! সিন্ডি জেকব্‌স নামে একজন মহিলা তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মিসেস জেকব্‌স ওয়াগনারের স্ত্রী ছিলেন না; তিনি ছিলেন অতি সাধারণ, কিন্তু ভাববাণী বলার ক্ষমতা সম্পন্ন একজন প্রার্থনাশীল মহিলা। তিনি ওয়াগনারের পরামর্শদাতা হিসাবে তার দুঃখ-কষ্টের সময়, নিঃসঙ্গতার সময় সমর্থন ও উপদেশ দিতেন। আশ্চর্য বিষয়, বিলিগ্রাহামের মত মহান একজন ব্যক্তিরও অতি সাধারণ, বিশ্বস্ত ও ত্যাগী একজন মহিলা পরামর্শদাতা ছিল।

বাইবেলে মোশিকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। তিনি ইব্রীয়দের মিসর থেকে বের করে আনতে পরিচালনা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পিছনে আর একজন মানুষ ছিলেন যার নাম কালেব। মোশি যে বারোজন গুপ্তচর প্রতিজ্ঞাত দেশ পর্যবেক্ষণে পাঠিয়েছিলেন, কালেব তাদের মধ্যে একজন। অবশ্য মোশিকে সহযোগিতা

করার জন্য যিহোশূয় ছিলেন, তবে তিনি আগেই একজন উদ্যমী নেতার গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। সেজন্য মোশি মারা যাবার পরে তিনিই মোশির পরে নেতা হয়েছিলেন। অন্যদিকে, যিহোশূয় মোশির ক্ষমতা গ্রহণ করার পরেও কালেব ছিলেন সত্যিকার একজন বার্ণবা সদৃশ ব্যক্তি; যিনি মোশির পরে এই নতুন নেতাকে ক্রমাগত সহযোগিতা দিয়ে এসেছিলেন।

বারোজন শিষ্যের মধ্যে প্রেরিত্ পিতর ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি, কিন্তু তার সাথেও ছিল বার্ণবা সদৃশ একজন- তার ভাই আন্দ্রিয়। আমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারি যে, পিতরের আগে আন্দ্রিয় যীশুর দেখা পান। তিনি ছিলেন মূলতঃ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্য কিন্তু পরে তিনি যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আন্দ্রিয় পিতরকে যীশুর সাথে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন; তবু তিনি নিজের জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদা পাবার প্রত্যাশা করেন নাই।

সবশেষে, পৌলের কথা আমরা চিন্তা করি। তারও একজন ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা ছিল। আন্তিয়খিয়াতে পরিচর্যাকাজ শুরু করার পর থেকে একজন স্ত্রীলোক মন-প্রাণ ঢেলে এবং নিঃস্বার্থভাবে পৌলকে সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। পৌলও এই স্ত্রীলোকটির প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও সশ্রদ্ধ প্রশংসা প্রদর্শন করেছিলেন! আমরা জানি, কুরীণী শহরের শিমোন যীশুর ক্রুশ বহন করেছিলেন। এই মহিলা হচ্ছেন সেই শিমোনের স্ত্রী। পৌল বার বার এই স্ত্রীলোককে 'মা' সম্বোধন করে এসেছেন (রোমীয় ১৬:১৩ পদ)। একটু লক্ষ্য করলে আমরা এও দেখতে পাই যে, পরামর্শদানের ভূমিকায় অধিকাংশই ছিল মহিলা। নির্দিষ্ট করে বলা যায়, মহান আত্মিক নেতা ও পালকদের অনেকেরই এরকম মহিলা পরামর্শদাতা আছে।

ইতিহাসের আলোকে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে, আত্মিক নেতাদের নেপথ্যে থেকে সহযোগিতা করার জন্য অনেক কম খ্যাতিপূর্ণ পরামর্শদাতারা ছিলেন। এদের মধ্যে অনেক মহিলা প্রায়শই কোন স্বীকৃতি ছাড়াই নেপথ্যে থেকে কাজ করে গেছেন। যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে- এই পরামর্শদাতারা ভাড়াটে সাহায্যকারী নয় কিন্তু নেতাদের পরিচর্যা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য সঞ্জীবনী শক্তি। নেতারা অনেক ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গ এবং অনেক সময় তারা নিজেরা তাদের দায়িত্ব একা একা পালন করতে পারে না। বাস্তবিক ঈশ্বর তাঁর দাসদের একা কাজ করতে বলেন নাই বরং তিনি তাদের জন্য তাঁরই উপযুক্ত সহকারী জুটিয়ে দেন, যেন ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজে তারা নেতাদের সাহায্য করতে পারে। ঈশ্বর কখনই কোন নেতাকে একা একা কাজ করার অনুমোদন দেন না কারণ এতে তারা ভবিষ্যতে অহংকারী হয়ে উঠতে পারে।

বার্ণবা আসলে মঞ্চের পিছন থেকে প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পৌলের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোক সম্পাত করেছেন; কখনও নিজের দিকে আলোক সম্পাত করেন নাই। পর্দার পিছনে থেকেই তিনি তার সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। ঈশ্বরীয় স্বভাবের সাহায্যকারী লোকেরা সাধারণত নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করেন। চুপচাপ পিছন থেকে সহায়তা দিতে এবং নীরবে মঞ্চের চরিত্রগুলো, অর্থাৎ মণ্ডলীর নেতাদের দিকে আলোক সম্পাত করেন এবং নিজেরা থাকেন আড়ালে। তারা তাদের নেতাদের কখনও হিংসা করেন না, বরং তাদের সাফল্যে আনন্দ পান। এই ধরনের লোকেরা স্বভাবতই 'গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে তবে একটাই বীজ থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে প্রচুর ফসল জন্মায়' কথাটির অনুরূপ। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলেই তারা সাহায্য করার এই গুণ লাভ করেছে। এটা তাদের নিজেদের নেওয়া সিদ্ধান্ত নয় অথবা তাদের সচেতন প্রচেষ্টার ফলও নয়। এই ধরনের উৎসাহ দেবার প্রবণতা ঈশ্বরের অনুগ্রহের উৎস থেকে প্রবাহিত, যিনি আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। এরকম গুণ-বৈশিষ্ট্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া দান।

সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয় যখন মণ্ডলীর সম্পাদক বস হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। সহকারী হিসাবে কাজ করাই যাদের স্বাভাবিক প্রবণতা, নেপথ্যে থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে যাদের কাজ করার কথা, নেতাদের সার্থকতায় যাদের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া উচিত, বাস্তবে তারা নির্দিষ্ট সুযোগ পাওয়া ঈশ্বর দত্ত গুণ অবহেলা করে। বার্ণবা একজন সম্পাদকের মত কাজ করেছিলেন এবং পৌল ছিলেন সেখানে বসের ভূমিকায়। সম্পাদকের কাজ পালকের কাজের দায়িত্বভার কিছু পরিমাণে বহন করা, যেন তার পালক কিছুটা হলেও স্বস্তি ও আরাম বোধ করেন। ঠিক এই কাজটিই বার্ণবা করেছিলেন। যাইহোক, যদি সম্পাদক তার করণীয় কাজ

ঠিকভাবে না করেন তাহলে পালকের জন্য নিশ্চয়ই তা খুবই কষ্টের। তাছাড়াও সম্পাদকের দায়িত্ব আরোপিত একজন ব্যক্তি নিজেই যখন বস হতে চায়, তখন মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে পালকের জন্য তাও খুবই কষ্টের হয়।

অনেকে পৌল হতে পারে, কিন্তু বার্ণবা কমই পাওয়া যায়

একজন নেতার জীবনে আশীর্বাদ নেমে আসে যদি তার চারদিকে বার্ণবার মত লোক অবস্থান করে। একজন নেতার চারদিকে যদি পৌলের মত লোক অনেক থাকে, তাহলে তিনি সমস্যায় পড়ে যাবেন। আমি মনে করি যে, কোরিয়ান লোকদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বার্ণবার মতন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সহকারী হিসাবে কাজ করার প্রবণতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কারণ তারা সকলেই নিজে নিজেই নেতা হতে চায়। কোরিয়াতে সুসমাচার প্রচারিত হবার পর থেকে দেশ জুড়ে অসংখ্য খ্রীষ্টিয়ান ডিনোমিনেশন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কোরিয়াতে অসংখ্য ধর্মীয় নেতারা আছেন, যারা তাদের নিজ নিজ মণ্ডলী ও ডিনোমিনেশন স্থাপন করতে আগ্রহী। একদিকে তা কোরিয়ার লোকদের জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা যেতে পারে। যেমন- আমার মধ্যেও ঠিক একই রকম প্রবণতা আমি দেখতে পেয়েছি।

কেউই সহকারী পালক হিসাবে থাকতে চায় না, বরং প্রথমেই হতে চায় প্রধান পালক। অথচ লোকেরা জানে সহকারী পালক হওয়া মানেই ভবিষ্যতে প্রধান পালক হওয়ার জন্য প্রস্তুতির ধাপ। আমরা অধিকাংশই চিরকালের জন্য বার্ণবা থাকতে চাই না। এটা অবশ্য কোরিয়ার লোকদের বৈশিষ্ট্য।

এই একই কথা কোরিয়ার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ও কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরিয়াতে সাধারণত লোকেরা নতুন নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য সুযোগ খুঁজে থাকে। তারা যেসব জায়গায় কাজ করে সেখান থেকে শেখা কায়দা-কানুন এবং একই ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। কারণ তারা চায় যেন সকলে তাদের 'বস' বলে। কোন কোন সংস্থায় অধিকাংশ কোরিয়ান পুরুষদেরই 'প্রেসিডেন্ট' বলে সম্বোধন করলে তারা খুশী হয়। তাই, যদি আপনি কোরিয়ার কোন রেস্টুরেন্টে যান, তাহলে আপনাকেও প্রেসিডেন্ট বলে ডাকার সম্ভাবনা। বাস্তবিক আমিও প্রায়ই এভাবে সম্বোধিত হই। তবে, আমি তাদের সংশোধন করে দিয়ে বলি যে, আমি বর্তমানে কোন জাগতিক ব্যবসার মালিক নই।

এটা আসলে কোরিয়ান সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। বার্ণবার মত লোক খুব কমই আছে, তবে নেতা বা বস হবার লোকের অভাব নাই। প্রতিটি কোরিয়ান লোকেরই নেতা বা বস হবার চেষ্টা তাদের সারা জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু এর ফলে অনাবশ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি হয়। লোকেরা এজন্য অন্যের সম্বন্ধে এভাবেও চিন্তা করে: 'একদিন ঐ ব্যক্তি পিছন থেকে আমাকে ছুরি মারবে, কারণ আমরা দু'জনে একই জিনিষ চাই।' যে পালকেরা একসাথে ঈশ্বরের সেবা কাজ করে অথবা যে ব্যবসায়ীরা একই ধরনের ব্যবসা করে; তারা তো এভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেই পারে: 'এই লোকটি আমার কাছ থেকে খুব ভাল করেই শিখেছে; এখন আমার মণ্ডলী (অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) ছেড়ে আমারই অধীনস্থদের নিয়ে গিয়ে নিজেই মণ্ডলী (অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) গঠন করে এখন হয়েছে নেতা বা বস।' সেজন্য একটা মণ্ডলীর প্রধান পালক বা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক তাদের নিম্ন পদস্থ নেতাদের বিশ্বাস না করে বরং ভবিষ্যতের প্রতিযোগী হিসাবে দেখে থাকেন। এই বিষয়টির সমাধান আমাদেরই করা উচিত। শুধুমাত্র কোরিয়াতে নয়, সারা পৃথিবীর জন্য তা একই ভাবে প্রযোজ্য।

দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে আমি শিক্ষা দেবার কাজ করে আসছি। আমি তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত ঈশতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি সাধারণ ঝোঁক দেখতে পেয়েছি। মূলতঃ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার সব জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি। কিন্তু বিশেষতঃ কোরিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি। সেমিনারিতে, কোরিয়ান ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তৃতীয় বর্ষে পা রাখে, তখন থেকে তারা তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবন নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। প্রত্যেক বছর আমার অফিসে এরকম কিছু ছাত্র-ছাত্রী ভিড় করে, যারা শিক্ষা শেষে কি করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এর কারণ, তাদের মণ্ডলীর প্রধান পালকেরা ঈশ্বরের পক্ষে তাদের সহ-কার্যকারী না ভেবে এখন থেকেই ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করছে। এটা সত্যি খুবই বাস্তব সমস্যা। বিশেষতঃ ডিগ্রী পাবার পরেই তা অনেকের জীবনে বাস্তবেই ঘটতে থাকে। তাদেরই প্রধান

পালকেরা খুবই খোলামেলা তাদের বিপক্ষতা শুরু করে এবং তারা প্রায় কমবেশী সকলেই স্পষ্টভাবে তাদের মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠা অর্জনে এই তরুণ পালকদের অনুমোদন দেয় না। এ কারণেই এই ভবিষ্যত স্নাতক উপাধিধারী তরুণেরা তাদের পালকীয় কাজ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এরকম একই রীতি কোরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত পৃথিবীতে স্বাভাবিক ভাবেই রয়ে গেছে।

আমি এখন পর্যন্ত এমন কোন দেশের কথা জানিনা, যেখানে ব্যাপক হারে এরকম সমস্যা নাই। তবে, চীনের মণ্ডলীগুলোতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রধান পালক সত্যি করেই সহকারী পালকদের দেখাশোনা করেন। সমগ্র মণ্ডলীর উপাসনাকারী লোকদের সাথে নিয়েই প্রধান পালক তার অধীনস্থ, অভিষেক প্রাপ্ত নয় এমন তরুণ পালকদের ভবিষ্যত পরিচর্যার পরিকল্পনা গ্রহণে তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে থাকেন। তারা প্রায় সমস্ত বছরের নির্দিষ্ট করণীয় কাজ সময় অনুযায়ী ভাগ করে দিয়ে এই তরুণ পালকদের পরিচর্যা ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। চীন দেশে, মণ্ডলীগুলোতে প্রধান পালক এবং তরুণ সহকারী পালকেরা সহ-কর্মচারী এবং সহ-কার্যকারী হিসাবে ঈশ্বরের রাজ্যে কার্যরত। তারা একে অন্যকে মণ্ডলীর শাখা প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা করেন। আপনি যখন চীনা মণ্ডলীগুলোর দিকে লক্ষ্য করবেন, তখন দেখবেন- তাদের একটি মাতৃ-মণ্ডলী তিন চারটি নতুন মণ্ডলী স্থাপনে সাহায্য করেছে। তারপর, মাতৃ-মণ্ডলী এবং নতুন মণ্ডলীগুলো সহভাগিতার অংশীদার সহকর্মী হিসাবে সহযোগীতা করছে। তারা কোনভাবেই একে অপরকে প্রতিপক্ষ মনে করে না।

অন্যদিকে, কোরিয়ার মণ্ডলীগুলো খুব ব্যাপকভাবে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে। যে কারণে তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব নাই। কারণ বার্ণবার মত অনেক লোক তাদের মণ্ডলীগুলোতে নাই। আবার, চীনের গোপন মণ্ডলীগুলোতে বার্ণবার মত অনেক লোক রয়েছে। সেখানে রয়েছে একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা, আর অন্যান্য সকলেই বার্ণবার মত তাদের নেতাকে বিশ্বস্তভাবে পরিচর্যা কাজে সাহায্য করে।

মণ্ডলীর জন্য হোক বা সমগ্র জাতির জন্য হোক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন বার্ণবার মত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেন সংস্থাগুলো একই ঐক্যে বেড়ে উঠে এবং স্ব স্ব লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। সেজন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনায় আমাদের এই অনুরোধ রাখা উচিত যেন তিনি অনেক বার্ণবা উৎপন্ন করেন। কিন্তু মন্ডলীর জন্য আরও বার্ণবা উৎপন্ন করতে হলে (বিশেষতঃ কোরিয়ার মণ্ডলীতে) তাদের লোকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করতে হবে। যত কথা বলি না কেন, যত চেষ্টা করি না কেন, কোরিয়ানদের বর্তমান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের আচার-আচরণ দেখে মনে হয় যে, কোরিয়ান মণ্ডলীগুলো ভবিষ্যত বার্ণবা উৎপন্ন করতে পারবে না।

আমাদের জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হওয়া দরকার। যেহেতু আমরা অধিকাংশ কোরিয়ানরাই নেতা হতে চাই, সেহেতু আন্তর্জাতিক ভাবে বিশেষ কাজের স্বীকৃতি অর্জনকারীদের অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যায়। আমরা কখনই তাদের প্রশংসা করতে চাই না, অথবা সোজা হয়ে দাঁড়াতেও দিতে চাই না। ফলে আমরা কোরিয়ানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক নেতা খুব একটা দেখতে পাই না।

রেভারেন্ড ডেভিড ইয়োংগী চো প্রায় বিশ বছর আগেই প্রথিতযশা পালক হয়েছিলেন এবং আজও তিনি একজন মহান আত্মিক নেতা হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এক সময় তিনি যখন কোরিয়াতে বিখ্যাত হয়ে উঠছিলেন, তখন অনেকেই তার শিক্ষাকে ভ্রান্ত শিক্ষা বলে সমালোচনা করেছিল এবং গোপনে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল। অথচ তার নিজের দেশের বাইরে যে কোন দেশের মণ্ডলীর নেতাদের কাছে এবং খ্রীষ্টিয় ভাই-বোনদের কাছে তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন। কিন্তু যে কারণে তিনি তার নিজের দেশে অপছন্দের কারণ হয়েছিলেন, তা হচ্ছে সত্যি করে- অন্যান্য খ্রীষ্টিয় ধর্মনেতাদের হিংসার মনোভাব। তারা পৃথিবীতে তার মর্যাদাকে স্বীকৃতি না দিয়ে বরং তাকে দুর্বল করে দিতেই চেষ্টা করেছিল। এরকম পরিবেশে অনেক বিশ্ব নেতার জন্ম হওয়া প্রায়ই অসম্ভব। যদিও এমন অনেকেই আছেন, যাদের রয়েছে নেতা হবার সঠিক গুণ ও যোগ্যতা, তবে তার জন্য দরকার অন্যরকম পরিবেশ এবং অন্য কোন স্থান।

যাইহোক, জাপানিরা আবার কোরিয়ানদের চেয়ে আলাদা রকম। শতাব্দীকাল আগেই জাপানিরা অবশ্য কোরিয়ান সংস্কৃতির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মেইজি পুনঃসংস্কারের

মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ করাতে তাদের নিজেদের জীবনে পশ্চিমা সংস্কৃতির আধুনিকতার ছাপ সংযুক্ত হয়েছিল। একটা উন্নত দেশ হিসাবে জাপান তাদের দেশ থেকে অনেক বিশেষজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিদের আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ইউরোপের দেশগুলোতে পাঠিয়েছিল যেন তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি ভালভাবে রপ্ত করতে পারে। এই আধুনিকতার ফলশ্রুতিতে জাপানিরা তাদের রাজনীতি, তাদের শিক্ষানীতি ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীসহ অনেক কিছুতেই উন্নত হতে পেরেছে এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর আঙ্গিকে তাদের সমগ্র সামাজিক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করতেও সক্ষম হয়েছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্যতম একটা দিক হচ্ছে "বার্ণবা সংস্কৃতি" অর্থাৎ এই সংস্কৃতিকে জাপানিরা আমদানি করেছে এবং প্রয়োজনে প্রয়োগও করছে। একে আবার সক্রিয়ভাবে সহযোগিতার সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। এভাবেই জাপানের পক্ষে মহান বিশ্ব নেতাদের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আমেরিকায় প্রতি বছর একটা জরিপ হয়, যে সময় আমেরিকার জনগণকে বলা হয় যেন তারা তাদের পছন্দের ৫০টি দেশের একটা তালিকা তৈরী করে। আমেরিকার জনগণ ইংল্যান্ডের নাম প্রথমে লেখে এবং জাপানকে রাখে দ্বিতীয় স্থানে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, তারা জাপানকে দ্বিতীয় স্থানে রাখে, অথচ এই জাপান হচ্ছে এশিয়ার একটি দেশ এবং আমেরিকার একটি শত্রু দেশ। কারণ তারাই ষাট বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল। যাদের সাথে এক সময়ে যুদ্ধ হয়েছিল, এশিয়ার এমন একটা দেশের প্রতি আসলে কেন আমেরিকার জনগণের এতটা সহানুভূতি একথা ভেবে আমরা আসলে অবাক হই।

এর একটা কারণ হচ্ছে, জাপানি লোকেরা সচরাচর যথার্থ ভদ্রলোক। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সমষ্টিগত জীবনের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝে এবং তাদের অনেকেরই আচার-আচরণ বার্ণবার সমতুল্য। এই কারণে তাদের দেশ জাগতিকভাবে অনেক প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। এখানে লক্ষণীয়, পঞ্চাশটি দেশের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার স্থান তেতাল্লিশে রাখা হয়েছে, যদিও কোরিয়ার জনগণ আমেরিকার সেনাবাহিনীর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কোরিয়ার যুদ্ধ ও ভিয়েতনামের যুদ্ধের মত দু-দু'টি যুদ্ধ করেছিল। এটি তো আমাদের দেশের আত্মসম্মানে আঘাত লাগার কথা; কিন্তু বাস্তবে এটাই কোরিয়ার লোকদের সম্বন্ধে আমেরিকান লোকদের অভিমত।

আপনি হয়তো নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা শুনেছেন। এটা আমেরিকা এবং কানাডার সীমানা ঘেষে অবস্থিত বিশ্বের আকর্ষণীয় একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র এবং পৃথিবীতে তিনটি শীর্ষস্থানীয় পর্যটন স্থানের একটি। আমি একজন ব্যক্তিকে জানি, যিনি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছাকাছি স্থানে তার ট্রাভেল এজেন্সি চালাতেন। তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলেছিলেন: 'পালক, বলতে পারেন, কোরিয়ানদের সাথে জাপানিদের কেন এত পার্থক্য? আমি খুব অবাক হয়ে তাকে ব্যাপারটা ভেংগে বলতে অনুরোধ করি। তখন তিনি আমাকে তার উদ্‌ঘাটিত তথ্য বর্ণনা করেছিলেন। যখনই তিনি কোরিয়ান পর্যটকদের জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যেতেন, তখনই তারা তাদের দিনের বেড়ানো শেষ হতে না হতেই মূল দল থেকে নিজে থেকেই আলাদা হয়ে যেত। একবার তিনি দশজন কোরিয়ান পর্যটকদের নিয়ে একটি দল পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই একত্রে থাকার অসংখ্য জরুরি কারণ বলে দেওয়া সত্ত্বেও তাদের পাঁচজন পথ হারিয়ে ফেলে।

ঐ পথ প্রদর্শকের কথা অনুসারে, কোরিয়ানরা নিয়ম মানতে চায় না। তারা দলনেতা বা পথ প্রদর্শককে অনুসরণ না করে নিজেরাই নিজেদের বস হয়ে যেখানে খুশী সেখানে যেতে চায়। অতঃপর পথ প্রদর্শককে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করে হারানো পর্যটকদের আবার খুঁজে বের করতে হয় এবং এতে তাদের সারা দিনের সব কার্যসূচি নষ্ট হয়ে যায়। তিনি আরও বলেছিলেন যে, অধিকাংশ কোরিয়ান পর্যটক নিয়ম কানুন বলে দেওয়া সত্ত্বেও তা মেনে চলে না। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, এরকম কাজ করেও তাদের মধ্যে সামান্যতম অনুশোচনা দেখা যায় না। এর কারণ কোরিয়ানরা নেতা হতে চায় কিন্তু অনুসরণকারী হতে চায় না।

তার কথায়, জাপানি পর্যটকেরা আচার-আচরণে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। তারা সব সময় তাদের দল নেতাকে অনুসরণ করে থাকে। তিনি আবার একটা দৃশ্যমান পতাকা বহন করেন যাতে সকলে একত্রে থাকতে পারে। তারা কোন প্রশ্ন না করেই প্রাচীন থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত সকলে সারিবদ্ধভাবে বামে কিংবা ডানে না ঘুরে তাদের নেতাকে অনুসরণ করে। আমি বিশ্বাস করি, এখানে আমরা জাপানিদের জাতীয়

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা হলেও দেখতে পাই। জাপানিরা কোন অভিযোগ না করেই যে কোন কর্তৃত্বের অধীনতা মেনে চলতে পারে, যদি সেটা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঠিক একই জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের মণ্ডলীতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং জাপানি মণ্ডলীগুলো সহজে ভাগ হয়ে যায় না।

এই ট্রাভেল এজেন্টের কথা শোনার পরে অনুভব করেছি, আমাদের কোরিয়ানদের এক আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। একজন কোরিয়ান হিসাবে আমি ভীষণভাবে দুঃখ অনুভব করি, যখন দেখি আমাদের দেশে প্রচুর সংখ্যক খ্রীষ্টিয়ান থাকা সত্ত্বেও আমাদের সাধারণ জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খুব অল্পই পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সুসমাচারের শক্তি এমনই, যা কিনা শুধু একটি দেশকে নয়, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারে। এটিই প্রভু যীশুর প্রতিজ্ঞা! তারপরেও আমার মাতৃভূমিতে এই পরিবর্তন পরিপূর্ণভাবে ঘটে নাই। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, এখন পর্যন্ত আমরা সুসমাচারের শক্তির গভীরতা ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি নাই।

সুসমাচারের শক্তির পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা পেতে পারি এবং এই শক্তিকে সমগ্র জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্য জোরেশোরে ব্যবহার করতে পারি? একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি যা আমাদের হৃদয়ের জঞ্জাল কেটে পরিষ্কার করে আত্মিক পুষ্টি দিতে পারে, তারই মাধ্যমে অবিচলিত ও দৃঢ়ভাবে গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়েই শুধুমাত্র আমাদের জীবনের এরকম পরিবর্তন অর্জন করা সম্ভব। ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের মধ্যে থাকা 'পিনিউমা' পবিত্র আত্মা এবং আমাদের জন্য নেমে আসা 'প্যারাক্লেটস' পবিত্র আত্মার সাহায্যে আমাদের পুড়িয়ে খাঁটি করতে পারে। আমাদের জীবন ও চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য বিকল্প আর কোন পথ নাই ।

আমাদের আত্মিকতাকে ও আমাদের ব্যক্তিত্বকে অবশ্যই দৃঢ় ও অটলভাবে পরিবর্তিত করতে হবে। এই কাজটি একদিনে করা যায় না। এজন্য দরকার অনেক দীর্ঘ সময়। বাস্তবিক পক্ষে, সমগ্র দেশব্যাপী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সার্থক করার জন্য সুদীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়, এমন কি তা এক বা দুই প্রজন্মে সম্ভবপর নাও হতে পারে। আজকের দিনে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নরত তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকালে আমার মনে হয়, আমরা কোরিয়ার জনগণ বর্তমান প্রজন্মে এই পরিবর্তন আশা করতে পারি না। হয়তো আমাদের নাতি-নাতনি এবং তাদের বংশধরদের এই পরিবর্তন হতে পারে। তবে হৃদয় বিদারক হলেও সত্যি যে, ভাল দিকে না গিয়ে আমাদের অবস্থা এখন মন্দের দিকেই অগ্রসরমান এবং মন্দ প্রবণতাগুলো ক্রমশ নতুন করে বেড়ে উঠছে। আমি মনে করি, সম্ভবতঃ দেশব্যাপী সমগ্র জাতিকে অনুতাপ করতে ও পরিবর্তিত হতে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু তার আগে যা বলা দরকার তা হচ্ছে: খ্রীষ্টিয়ানদেরই প্রথমে পরিবর্তিত হতে হবে। তাহলে আমাদের পরিবর্তনের জন্য আমরা কি করতে পারি? প্রথমত, ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়কে পরিবর্তিত করতে হবে এবং যীশুর মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয়ে তৈরি করতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন স্বর্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আমাদের প্রার্থনা উপস্থিত করা; তবেই আমাদের হৃদয় ঈশ্বরীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আকার বিশিষ্ট হবে। তাছাড়াও, এর আগে আমরা যে কথা আলোচনা করেছি, আমরা আমাদের তরফ থেকে উপদেশ দিয়ে, আহ্বান রেখে, সান্ত্বনা দিয়ে এবং প্রশংসা করে আমাদের প্রতিবেশীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতে অভ্যস্ত হতে পারি। ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনে অথবা দৈহিকভাবে মমতা প্রদর্শন করেও আমরা তাদের বেশী করে উৎসাহ দিতে পারি। আমাদের বিনতি প্রার্থনা এবং আতিথেয়তা প্রদর্শনের দ্বারাও আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। সবশেষে, আমরা নিমন্ত্রণ পেলে সব রকম সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে এবং সক্রিয়ভাবে নিজেদের জড়িত করেও তাদের উৎসাহ দিতে পারি। উৎসাহ দেবার এই সব উপাদান এবং পদ্ধতিগুলো হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী কাজ, যার সাহায্যে বার্ণবা তার ভালবাসা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে অন্যদের তার কাছে টেনে আনতেন।

এই পরিবর্তন আনতে হলে অবশ্যই আমাদের অনেক ধৈর্য ধরতে হবে ও নিরলসভাবে ত্যাগ স্বীকার করেই সময় ও চেষ্টা চালাতে হবে। আমরা যদি আমাদের নিরলস চেষ্টায় নিজেরা পরিবর্তিত হই, তাহলে আমাদের ছেলে-মেয়েরাও তা আমাদের কাছ থেকে শিখে তাদের জীবনে প্রয়োগ করবে। আমাদের কাজের ফলগুলো তারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারবে। তারা আবার তাদের পরের প্রজন্ম এবং তাদের নাতি-নাতনিদের তা দিয়ে যাবে। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে আমাদের বংশধরেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠবে ও তাদের

প্রভাব বেড়ে যাবে। এভাবেই সমগ্র জাতির পরিবর্তন আসবে। তারাই ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে উৎসাহ দেবার দায়িত্ব পালন করবে ও তাদের পরিবর্তনের পথ ধরে এই মিশন সম্ভব হবে।

যথেষ্ট জোর দিয়ে আমি বলতে পারি না যে, খুব অল্প সময়ে পরিবর্তনের ফলগুলো পাওয়া যেতে পারে। সমগ্র দেশের পরিবর্তনের জন্য, এমন কি আমাদের অন্তর পরিবর্তনের জন্যও যথেষ্ট সময় দরকার হয়। যেমন করে প্রেরিত্ পৌল দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য বার্ণবার মত এমন একজন তার পাশে ছিলেন, যার উৎসাহ তাকে উদ্যমী করেছিল। পৌলের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাকে একজন মহান ঈশ্বরীয় মানুষে রূপান্তরিত করতে ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা সার্থক করতে বার্ণবার ত্যাগী মনোভাব একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পৌলকে একজন মহান ঈশ্বরের মানুষ হিসাবে রূপান্তরিত করতে বার্ণবার ভূমিকা ত্রিত্বের পবিত্র আত্মার ভূমিকার অনুরূপ। পিতা ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেন, পুত্র তা এই পৃথিবীতে কাজে পরিণত করেন। অর্থাৎ পুত্র ঈশ্বর নিজে নিজেই কোন কাজ করেন না, কিন্তু তিনি সব সময় পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সাহায্যে করণীয় কাজ করেন। ঠিক যেমন- বার্ণবার সহায়তা নিয়ে পৌল তার পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে প্রভুর দেওয়া কাজ সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। ত্রিত্বের পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের ভূমিকা হচ্ছে সমর্থন করা, সাহায্য করা এবং ক্ষমতা দান করা; ঠিক বার্ণবা যেমন করে পৌলের জন্য করেছিলেন।

কেউই একা একা কোন কাজে সার্থক হতে পারে না। এই কথাটি পৌলের জন্য যেমন প্রযোজ্য ছিল, তেমনি আমার জন্যও বটে। যদি ধরে নেই আমি পৌলের মত একজন, তাহলে আমার নিজের একজন বার্ণবা দরকার, যে আমাকে দেওয়া ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ সমাপ্ত করতে সাহায্য করবে। একইভাবে আমার মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের এবং তরুণ পালকদের অবশ্যই বার্ণবার ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু সুসমাচারের কাজ সবই দলীয় প্রচেষ্টার ফল। তাই ঈশ্বরের কাছ থেকে পৌল যে পুরস্কারগুলো পেতে যাচ্ছেন, নিশ্চয়ই বার্ণবা তার ভাগ পাবেন। যদিও পৌলকে আত্মায় উদ্দীপিত নেতা হিসাবে সামনে থেকে দেখা যায়, কিন্তু বার্ণবা নেপথ্যে তার সাথে ছিলেন। যাদের দেখা যায় এবং যাদের দেখা যায় না তারা সকলেই সঠিক সময়ে প্রভুর কাছ থেকে তাদের পুরস্কার অবশ্যই ভাগাভাগি করে নেবে।

প্রভু আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের মণ্ডলীতে আত্মিক নেতা তৈরি করতে প্রশিক্ষণ দেই এবং ঈশ্বরের বাক্য অর্থাৎ সুসমাচার দূরে- অতি দূরে, যারা এখনও পায় নাই তাদের কাছে পৌঁছে দেই। যদি ঈশ্বর আমাকে 'পৌল' বলেই আহ্বান দিয়ে থাকেন, তাহলে আমার মণ্ডলীর অধিকাংশই হচ্ছেন এক একজন 'বার্ণবা'। আমি দৃশ্যমান নেতা এবং আমার মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাগণ সকলেই তাদের প্রার্থনা, অর্থ, সময় এবং দূরদৃষ্টি দিয়ে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য-সদস্যাদের বার্ণবার মত যোগ্যতা দিয়েছেন, যেন তারা পর্দার আড়ালে থেকেই মণ্ডলীর সকল পরিচর্যা ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। সেজন্য আমি তাদের অনুরোধ করি যেন তারা ঈশ্বরের কাজ বিশ্বস্তভাবে পালন করে। আরও বলি, তারা শুধুমাত্র পাশে দাঁড়ানো দর্শক হয়ে নয়, কিন্তু সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের কাজে নিজেদের জড়িত করে। তাহলে, আমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে ঈশ্বরের সন্তোষজনক, খাঁটি এবং মঙ্গল ইচ্ছা একই সাথে পূর্ণ করতে পারব। যখন আমরা এভাবে এক সাথে কাজ করব, আমি নিশ্চিত যে, তখন আমাদের প্রভু গৌরবান্বিত হবেন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আসুন আমরা আমাদের স্ব-স্থানে, স্ব-পদে থেকে, যেখানে ঈশ্বর আমাদের রেখেছেন, সেখানে থেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করি, যেন ঈশ্বরের বাক্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সকল জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের এই প্রচেষ্টা এবং আত্মত্যাগ মনে রাখবেন ও স্বর্গে আমাদের জন্য চমৎকার পুরস্কার প্রদান করবেন। আমরা যেন সব সময় পৌলের মত দৃশ্যমান নেতা হতে আকাঙ্ক্ষা না করি, কিন্তু বার্ণবার মত অন্যদের উৎসাহ দিতে ও সহযোগিতা করতে উদ্যমী হই। এভাবে আমরা আমাদের কাছে প্রদত্ত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহান আদেশ চূড়ান্তভাবে সফল করে তুলতে পারি।

২ তীমথিয় ৪:৯-২২ পদ

তুমি খুব চেষ্টা কর যাতে আমার কাছে শীঘ্র আসতে পার, কারণ দীমা এখনকার জগতকে ভালবেসে আমাকে ছেড়ে থিষলনীকীতে চলে গেছে। এছাড়া ক্রীষ্কেন্ত গালাতিয়াতে এবং তীত দালমাতিয়াতে গেছেন; কেবল লূক আমার কাছে আছেন। তুমি মার্ককে সংগে করে নিয়ে এস, কারণ আমার কাজে তাকে খুব দরকার। আমি তুখিককে ইফিষে পাঠিয়েছি। ত্রোয়াতে কার্পের কাছে আমি যে গায়ের কাপড়টা ফেলে এসেছি, আসবার সময় তুমি সেটা নিয়ে এস। তাছাড়া গুটিয়ে-রাখা বইগুলো, বিশেষ করে যেগুলো চামড়ার উপর লেখা, সেগুলো সংগে করে নিয়ে এস। যে আলেক্সান্দর তামার কাজ করে সে আমার অনেক ক্ষতি করেছে। সে যা করেছে তার শোধ প্রভুই নেবেন। তুমিও তার বিষয়ে সাবধান থেকো, কারণ সে আমাদের প্রচারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছিল। প্রথম বার যখন আমার বিচার হয়েছিল তখন কেউ আমাকে সাহায্য করে নি, বরং সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল; তবে এটা যেন তাদের বিরুদ্ধে ধরা না হয়। কিন্তু প্রভু আমার সংগে ছিলেন এবং আমাকে শক্তি দান করেছিলেন। তার ফলে আমি সম্পূর্ণভাবে সুখবর প্রচার করতে পেরেছিলাম আর অযিহূদীরা সবাই তা শুনেছিল। ঈশ্বর আমাকে সিংহের মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন। প্রভু আমাকে সমস্ত মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করবেন এবং নিরাপদে তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে নিয়ে যাবেন। যুগে যুগে চিরদিন তাঁর গৌরব হোক। আমেন। প্রিষ্কিলা ও আকিলা এবং অনীষিফরের পরিবারকে আমার শুভেচ্ছা জানায়ো। ইরাস্ত করিন্থে রয়ে গেছেন এবং ত্রফিমকে আমি অসুস্থ অবস্থায় মিলীতে রেখে এসেছি। তুমি খুব চেষ্টা কর যাতে শীত পড়বার আগে এখানে আসতে পার। উবুল, পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া এবং সব ভাইয়েরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। প্রভু তোমার সংগে সংগে থাকুন। ঈশ্বরের দয়া তোমাদের অন্তরে থাকুক।

অষ্টম
অধ্যায়

যারা পৌলের বিশ্বস্ত উৎসাহদাতা

যারা পৌলের বিশ্বস্ত উৎসাহদাতা

পবিত্র বাইবেলের অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে তীমথিয়ের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠিটি আমি বিশেষ করে পছন্দ করি। সেজন্য আমি সময় সময় এটি ধ্যান করি। আমার মত যারা পালকীয় কাজ করে ও এই চিঠিটি নিয়ে চিন্তা করে, তারা অবশ্যই পৌলের শেষ জীবন নিয়ে কল্পনা করে এবং হয়তোবা নিজেদের কাছে প্রশ্ন করে: 'একদিন আমরা সকলে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব! পৌল এমন চিন্তা করেছিলেন এবং আমাদেরও করতে হবে। আচ্ছা, তখন কি আমরাও পৌলের মত হৃদয় নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে সমর্থ'? বাইবেলের এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি লেখার সময় পৌলের বয়স তেষট্টি হয়ে গেছে। তিনি ৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আর ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই চিঠি লেখেন এবং একই বছরে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়।

আমাকে যদি তীমথিয়ের কাছে লেখা এই দ্বিতীয় চিঠিটির সারমর্ম করতে বলা হয়, তাহলে আমি বলব যে এটি হচ্ছে, পৌলের প্রিয় শিষ্য তীমথিয়ের কাছে ভালবাসা ও সহানুভূতি জানানোর জন্য লেখা তার চিঠি। এখানে পৌল তার শিষ্য তীমথিয়কে তার সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের পরিচর্যার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন; যা তিনি ৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দামেস্ক থেকে মন পরিবর্তন করার পর লাভ করেছিলেন। সেই সময়, তিনি তার আসন্ন মৃত্যুও দেখতে পাচ্ছিলেন! তাই তিনি তার চলে যাবার আগে তীমথিয়ের পরিচর্যা কাজের জন্য তার সুপারিশমালা দিয়ে গেছেন। পৌল এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন।

পরিচর্যা কাজ কিভাবে করতে হবে পৌল প্রথমেই তা তীমথিয়কে বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ কিভাবে শিষ্যদের মনোনীত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ দিতে হবে সে বিষয়ে বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যেন তীমথিয় সাবধান থাকে, কারণ বিভিন্ন রকমের লোক এ জগতে রয়েছে। বিশেষ করে, আমরা যখন লোকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য মনোনীত করি, তখন আমরা যেন শুধুমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদেরই মনোনীত করি, যারা অন্যদের শিক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে (২ তীমথিয় ২:২ পদ)।

শিষ্যের গুণাবলী

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে শব্দ রচনা করে আদর্শ শিষ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে থাকেন। এরকম একটি ইংরেজি শব্দ হচ্ছে: এ,সি,টি (A.C.T)! এখানে 'এ' মানে হচ্ছে 'এভেইলেবল', অর্থাৎ ডাকলেই যাকে পাওয়া যায়। তার মানে, শিষ্য পদপ্রার্থী অবশ্যই সুসমাচারের জন্য সময় ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকবে। আমরা নিশ্চয়ই এমন কোন শিষ্য প্রত্যাশা করব না যে, পরিচর্যা কাজে তার সময় ব্যয় করতে চাইবে না। একজন লোক যতই গুণী ও বুদ্ধিমান হোক না কেন, যদি তিনি সবসময় ব্যস্ত থাকেন তাহলে শিষ্য হবার যোগ্যতা তার নাই। দ্বিতীয়তঃ 'সি' মানে হচ্ছে 'ক্রেডিবল'। অর্থাৎ একজন শিষ্যকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য, বাধ্য এবং দাস সুলভ শান্ত মেজাজের হতে হবে। অন্যকথায়, আবেগ দমন করার শক্তি তার থাকতে হবে। কারণ একজন ব্যক্তি যদি বারবার তার আবেগের বশে ইচ্ছামত চলে, তাহলে শিষ্য হবার যোগ্যতা তার নাই। আমরা এমন লোকদের নির্বাচিত করব যারা নিজেদের দমন করতে পারে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল নয়। একজন শিষ্যের স্থির ও অপরিবর্তনীয় চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে আমি পারি না। একজন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা থেকে তার গুণ ও যোগ্যতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শেষে- 'টি' মানে হচ্ছে 'টিচিং অথবা টিচেবল'। এখানে এমন ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের শিক্ষা দেবার ক্ষমতা বা দান আছে। এরকম গুণ বা যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে শিষ্য নির্বাচন করতে পৌল তীমথিয়কে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন।

পৌল আবার তীমথিয়কে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতেও বলেছেন। কেন তিনি এমন কথা বলেছেন? কারণ তীমথিয় খ্রীষ্টের পক্ষে একজন আত্মিক যোদ্ধা। একজন যোদ্ধা অবশ্যই তার খাওয়া বা কাপড়-চোপড়ের বিষয়ে চিন্তিত হবে না, কারণ স্বর্গীয় ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছুই তাকে দেওয়া হবে।

মহান পরিচারক পৌল যিনি এখন স্বর্গে যাবার জন্য শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে, তিনি তার প্রিয় শিষ্য তীমথিয়কে অনুরোধ করে বলছেন যেন তিনি লোকদের চরিত্র যাচাই করে তাদের সাথে মেলামেশা করেন। পৌলের একথা বলার পিছনে কারণ- তিনি ভুল লোকদের সাথে মেলা-মেশার পরিণতি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, শুধুমাত্র খ্রীষ্টিয়ান হলে এবং আবেগে পরিচালিত হলেই একজন লোক বিশ্বস্ত হবে তা ঠিক নয়। আবার একজন সত্যি করেই যথেষ্ট শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানী বা মন্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা রয়েছে বলেই তাকে বিশ্বাস করা যাবে তাও ঠিক নয়। একজন ব্যক্তি পালক, প্রাচীন বা পরিচারক হওয়া মানে এই নয় যে, তিনি বিশ্বস্ত। তবে শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত এ,সি,টি, (A.C.T) দ্বারা যে অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শুধু তেমন ব্যক্তিদের অটল ও বিশ্বস্ত বলা যেতে পারে।

পৌলের অবিশ্বস্ত শিষ্যেরা

তীমথিয়কে বলা পৌলের কথাগুলো আমরা যে শাস্ত্রাংশে পড়েছি, যেখানে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, অনেকে আছে- যারা প্রথমে তাকে অনুসরণ করেছে কিন্তু পরে তারাই বেঈমানি করে তাকে কষ্ট দিয়েছে। অনেক রকম সমস্যা, বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও যারা ত্যাগী মনোভাবের এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সহযোগিতা করে গেছেন, পৌল তাদের কথাও স্বীকার করেছেন। পৌলের দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই সব লোকেরা শেষ পর্যন্ত পৌলের সাথে ছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, এর কারণ হচ্ছে- তারা পৌলের মধ্যে সারা জগতের হারানো লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার আগ্রহ দেখতে পেয়েছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, তাদের আত্মিক চোখ খোলা থাকায় তারা পৌলের মধ্যে প্রভুর আদেশ পালন করার একান্ত আগ্রহ এবং বাধ্যতা দেখতে পেয়েছিলেন। তার হৃদয় ছিল সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষায় উষ্ণ। তবে এই লোকেরা সংখ্যায় খুব বেশী নয়।

যারা পৌলকে একসময় ভালবাসত এবং অনেক দিন ধরেই তার সাথে ছিল, কিন্তু পরে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেরকম একজনের নাম হচ্ছে দীমা। প্রথম দিকে দীমা পৌলের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রচার অভিযানের সময় একজন একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বাইবেল এটাও আমাদের বলেছে যে, ৬০ থেকে ৬২ খ্রীষ্টাব্দে রোমে পৌলের প্রথমবার জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় দীমা তার পাশে থেকে বিশ্বস্তভাবে তার সেবা করেছিলেন (কলসীয় ৪:১৪ পদ)।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার জেলে বন্দী থাকার সময়ে পৌল তার শেষ চিঠিতে এই দীমা সম্পর্কে লিখেছিলেন: "কারণ দীমা এখনকার জগতকে ভালবেসে আমাকে ছেড়ে থিষলনীকীতে চলে গেছে" (২ তীমথিয় ৪:১০ পদ)। কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কঠোর ভাষা নতুন নিয়মে খুব একটা দেখা যায় না। এর মানে, দীমাকে পৌলের সত্যিই প্রয়োজন ছিল; তার বদলে তিনি জাগতিকতার মোহে পৌলের সাথে বেঈমানি করেছিলেন।

খুব সম্ভব দীমা হচ্ছেন এমন একজন, যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পৌলের সাথে থাকলে জগতের মানদন্ডে উপকার পাবার চেয়ে বরং অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। পৌলের পরিচর্যা কাজের সাথে তার ব্যক্তি ইচ্ছার গুরুতর দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই তাকে অনুভব করতে হয়েছিল। এমনও হতে পারে, পৌলের বার বার জেলে যাওয়া তার ভাল লাগে নাই। কারণ পৌলের জেলে বন্দীত্বের কলংকের ছাপ তাকেও স্পর্শ করেছিল। তাই দীমা পৌলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এখানে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাচ্ছি। পৌল যখন বলেছেন, দীমা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন তার মানে এই নয় যে, দীমা যীশুকে ছেড়ে দিয়ে জগতের কোন কিছুর উপাসনা করতে শুরু

করেছিলেন। বরং বলা যায়, জগতের প্রতি ভালবাসার ফলেই তিনি সুসমাচার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আজকের মন্ডলীগুলোতেও এরকম লোক দেখা যায় এবং তাদের কারণে পালকদের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়; ঠিক যেভাবে পৌলের দীমাকে নিয়ে হয়েছিল। দীমার মত হওয়া আমাদের উচিত না। সেজন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করা আমাদের একান্ত আবশ্যক। এই বাক্য আমাদের জীবনে ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা একান্তভাবে উচিত।

আরও একজন ব্যক্তি পৌলের সাথে বেঈমানি করেছিল, যার নাম হচ্ছে আলেক্সান্দর। তিনি তামার কাজ করতেন। দীমার মত তিনিও পৌলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। পৌলের কথায়, আলেক্সান্দর "আমার অনেক ক্ষতি করেছে।" (২ তীমথিয় ৪:১৪ পদ)। তার প্রতি প্রেরিত্ পৌলের খুবই ক্ষোভ ছিল। কারণ ১৪ পদে তিনি লিখেছেন, "সে যা করেছে তার শোধ প্রভুই নেবেন।" আলেক্সান্দরকে তিনি অভিশাপই দিয়েছিলেন। কারণ তারই কারণে একজন ঈশ্বরের লোক হিসাবে পৌলকে অনেক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল। আমাদেরও মনে রাখা উচিত যে, ঈশ্বরের কোন প্রেরিত্ বা কার্যকারীর ক্ষতি করা অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

১৫ পদে পৌল তীমথিয়কে এই ধরনের কথা বলেছেন, "তুমিও তার বিষয়ে সাবধান থেকো, কারণ সে আমাদের প্রচারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছিল।" আলেক্সান্দরের মত লোকেরা মন্ডলীর নেতাদের খুবই কষ্ট দেয়। তারা সামনে খুব সম্মানের সাথে পালকদের সম্বোধন করে, কিন্তু পিছন থেকে নানা বাজে গুজব ছড়ায়। এই ধরনের লোকদের মধ্যে ধার্মিকতার অভাব রয়েছে এবং প্রায় সব মন্ডলীতেই তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। তারা দু'মুখো এবং বিপদজনক!

সত্যি কথা বলতে কি, যারা শেষ পর্যন্ত পৌলের সাথে ছিল তাদের সংখ্যা খুবই কম। এর আগে, দ্বিতীয় বার জেলে যাবার ফলে অনেক সহযোগী পৌলকে 'ছেড়ে চলে গিয়েছিল'। এশিয়া মাইনরের (বর্তমান দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, তুর্কি দেশ) অনেক খ্রীষ্টিয়ান পৌলের প্রয়োজনের সময় তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ফুগিল্ল ও হর্মগিনি (২ তীমথিয় ১:১৫ পদ)। আমরা এও জানি যে, এশিয়া মাইনরে সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে এবং সাতটি মন্ডলী স্থাপন করতে গিয়ে পৌলকে ভীষণ কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেই মন্ডলীগুলোর নাম হচ্ছে: ইফিষ, স্মূর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা, সার্দি, ফিলাদিল্ফিয়া এবং লায়দিকেয়া। ভীষণ রকম তাড়না ও কষ্টের মধ্য দিয়ে খুব ধৈর্যের সাথে পৌল ঈশ্বরের এই মন্ডলীগুলো স্থাপন করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, পৌল যখন দ্বিতীয় বার জেলে গিয়েছিলেন, তখন এই মন্ডলীগুলোর অনেক সদস্য-সদস্যা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া হয়েছে জেনে অনেকে তার সমালোচনাও করেছিল। ফুগিল্ল ও হর্মগিনির কথা পৌল খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, কারণ এই দু'জন তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এটা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, এই তথাকথিত খ্রীষ্টিয়ানেরা পৌলের কাজের মধ্য দিয়ে প্রচুর ঋণী ছিল, অথচ তার বিষম সংকটের মুহূর্তে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তার শেষ চিঠিতে, পৌল আসলে তার শিষ্য তীমথিয়কে এ কথা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, কিছু লোক এরকমই হয়ে থাকে।

বিশেষ করে এশিয়া মাইনরের খ্রীষ্টিয়ানদের বেইমানির জন্য পৌল ভীষণ রকম কষ্ট পেয়েছিলেন। আমরা এ বিষয়ে অনেক ঘটনা জানতে পারি। এই খ্রীষ্টিয়ানেরা পৌলের কাছ থেকে যথেষ্ট ভালবাসা পেয়েছিল। অথচ তার বিশেষ প্রয়োজনের সময় তারা তাকে ছেড়ে চলে যেতে দ্বিধা করে নাই। ব্যক্তি পৌলের আত্মবিশ্বাসের উপরে তা ছিল প্রচন্ড আঘাত। প্রথমবার জেলে বন্দী থাকা কালে তিনি এশিয়া মাইনরের মন্ডলীগুলোর কাছে চারটি চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে: ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয় এবং ফিলিমন। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা পেয়ে তার সমগ্র হৃদয় নিংড়ে তিনি তাদের ভালবাসার কথা বলেছিলেন, সান্ত্বনার কথা বলেছিলেন, সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন এবং উপদেশ দিয়েছিলেন।

ইফিষে গিয়ে পৌল দুই বছরেরও বেশী সময় ধরে "তুরান্ন নামে একজন শিক্ষকের বক্তৃতা দেবার ঘরে গিয়ে প্রত্যেক দিন যুক্তি তর্কের সংগে আলোচনা" করেছিলেন (প্রেরিত্ ১৯:৯ পদ) এবং শিষ্যদের শিক্ষাও দিয়েছিলেন। কিন্তু এই লোকেরা পৌলের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে এবং তার নির্দেশনা জেনে-বুঝেও

সম্পূর্ণভাবে তাকে ত্যাগ করেছিল। যদিও এভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার সঠিক কারণ আমরা শুধুমাত্র অনুমান করতে পারি।

সেই সময়ে পৌল তেমন একজন বিখ্যাত বা জনপ্রিয় ব্যক্তিও ছিলেন না। এমন কি তিনি কোন একজন ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী ব্যক্তিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মিশনারি ও সুসমাচার প্রচারক। তিনি যখনই কোন সুযোগ পেতেন, এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হলেও সেখানে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতেন, মন্ডলী স্থাপন করতেন এবং সেই সব স্থানের জন্য নেতাও নিয়োগ দিতেন। তিনি খুব বেশী দিন এক জায়গায় থাকতেন না। এক স্থানের কাজ শেষ হলেই তিনি অন্য আর এক স্থানে- যেখানে সুসমাচার দরকার সেখানে চলে যেতেন।

সম্ভব হলে তিনি আবার অর্থ সংগ্রহ করতেন, যেন শুধুমাত্র তার অভিযানের খরচ নয় কিন্তু সরাসরি নতুন স্থাপিত মন্ডলীর ও তাদের নতুন নেতাদের সাহায্য করতে তা কাজে লাগে। যাইহোক, পৌল মোটেও মন্ডলীর রাজনীতি নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না। ক্ষমতা লাভের জন্যও তিনি আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তার বদলে, বরং বাক্য প্রচারের জন্য তিনি বার বার অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং দুই বার জেলেও গিয়েছিলেন।

আমার মনে হয়, প্রথম থেকে পৌলের সাথে অনেকেই ছিল, কিন্তু তারা যখন দেখেছিল যে, পৌল জগতের কাছে তুচ্ছ, বারংবার অত্যাচার সহ্য করছেন এবং জেলে বন্দী হচ্ছেন, তখন তারা এই মিশনারিকে ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা করে নাই। পৌলের সাথে থাকতে বোধকরি তাদের বেশ অস্বস্তি অনুভূত হয়েছিল বলেই তারা তার কাছ থেকে পালিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, এই লোকেরা একজন মানুষ পৌলকে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু তার পিছনে যিনি আছেন সেই ঈশ্বরকে নয়। তাদের নেতার মর্যাদাহানি হচ্ছে, তিনি অত্যাচারিত হচ্ছেন, জেলে যাচ্ছেন; সবই যেন তাদের জন্য অপমানের এবং পরাজিত হবার মত বিষয় হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পৌলকে অনুসরণ করা তাদের জন্য বড়ই লজ্জার বিষয় এবং নিশ্চয়ই তাদের জন্য উত্তম কিছু নয়। তাছাড়া এটা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, তাদের পরিবারের জন্য, তাদের দৈহিক সুরক্ষা ও ছেলে-মেয়েদের জন্যও কিছু মাত্র লাভজনক নয়।

যার ফলে তারা সকলেই পৌলকে ত্যাগ করেছিল। অন্যদিকে, পৌলের কাছে তার ব্যক্তি জীবনের সার্থকতা ও আশীর্বাদের চেয়ে বিশ্বাসে আত্মত্যাগ করা এবং ক্রুশের উপরে বিশ্বাস রাখা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ঐসব লোকদের কাছে তা সত্যিকার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত ছিল না। সর্বোপরি, পৌল যে ঈশ্বরের খুবই প্রিয় এবং বিশ্বস্ত দাস তা তারা একেবারেই বুঝতে পারে নাই। তাদের আত্মিক চোখ ছিল বন্ধ। ফলে, পৌলের আবেগের যৌক্তিকতাও তারা দেখতে ও বুঝতে পারে নাই। তার কৃত কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তারা তাও বুঝতে পারে নাই। বিশেষ করে খ্রীষ্টের অলৌকিকতা বুঝতেও তারা ব্যর্থ হয়েছিল।

তারা পৌলের পরম বিশ্বস্ত সেবা ও আত্ম-ত্যাগের মূলনীতি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ঈশ্বর স্বর্গে পৌলের জন্য যে কত মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা বুঝবার মত ক্ষমতাও তাদের হয় নাই। অযিহূদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা শুনেছিল যে, এটি প্রভুর কাছ থেকে আসা সবচেয়ে প্রধান আদেশ। কিন্তু আত্মিক অস্বচ্ছতার কারণে তাও তারা সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং প্রভুর আদেশের প্রাসংগিক যৌক্তিকতা তারা বুঝতে পারে নাই। আজকের দিনেও তা একইভাবে সত্যি। বর্তমানে অনেক খ্রীষ্টিয়ান তাদের ব্যবসা-বানিজ্য, তাদের পরিবার এবং তাদের নিজেদের উন্নতির জন্য আশীর্বাদ পাবার প্রত্যাশা নিয়ে নিয়মিত গীর্জায় যায়। ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা যা পেয়েছে তা ধরে রাখতেই তারা ব্যস্ত থাকে। কিন্তু পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করার দূরদৃষ্টি বা দর্শন তারা হারিয়েছে।

পৌলের বিশ্বস্ত শিষ্যেরা

যদিও অনেক লোকই পৌলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে বেশ কিছু লোক তাকে উৎসাহিত করেছে, তার সাথে থেকেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছে। তাদের মধ্যে তীমথিয় সবচেয়ে সুনামের অধিকারী (২ তীমথিয় ৪:১-৯ পদ)। তিনি ৫০ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের দ্বিতীয় প্রচার অভিযানের সময় তার সাথে পরিচর্যা কাজে অংশ নিয়েছিলেন। ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তীমথিয় তার সাথে ছিলেন। তাদের এই এক সাথে করা পরিচর্যা কাজ ১৮ বছর টিকেছিল। তাদের সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে, পৌল তীমথিয়কে তার আত্মিক সন্তান মনে করতেন। আমরা তীমথিয়ের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাইবেলে অনেক কথা পাই। যেমন বলা হয়েছে: তিনি বাধ্য, নরম মনের, খাঁটি স্বভাবের ও বিশ্বাসে সৎ মনোভাবের অধিকারী ছিলেন (২ তীমথিয় ১:৫ পদ)।

দ্বিতীয়তঃ প্রিষ্কিল্লা ও আকিলা দম্পতিকে পৌল বেশ সম্মানীয় মর্যাদা দিয়েছেন, যারা তার বিপদের সময় তাকে ছেড়ে যায় নাই। তারা ছিলেন যিহূদী, কিন্তু পরে বর্তমানের তুর্কি অঞ্চলে অভিবাসী হয়েছিলেন। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন এবং একটা সার্থক ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। তারা যে শুধু টাকা-পয়সা দিয়ে পৌলকে সাহায্য করেছেন তা-ই নয়; তারা পৌলের পরিচর্যা কাজে বিভিন্ন ভাবে জড়িত হয়েছিলেন। আকিলার স্ত্রী প্রিষ্কিলা বিশেষ করে পৌলের প্রচার অভিযানে সহযোগিতা করতেন। পরে তীমথিয় যখন ইফিষীয় মন্ডলীর পালকীয় দায়িত্বে ছিলেন, তখন এই দম্পতি মন্ডলীর প্রাচীন-প্রাচীনা হিসাবে নৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতাও করেছিলেন। সাধারণ বিশ্বাসী হিসাবে প্রভুর কাজে তাদের বিশ্বস্ত সহযোগিতা সত্যিকার আদর্শ ছিল।

তৃতীয় বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন ডাক্তার লূক, যিনি একজন বিদেশী- গ্রীস দেশের লোক ছিলেন। ৫০ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের দ্বিতীয় প্রচার অভিযানের সময় লূক তার সাক্ষাত পান। ঐ একই বছর তীমথিয়ের সাথেও তার দেখা হয়। লূক ও তীমথিয়, উভয়ে পৌলের জীবনের সাথে আঠারো বছর ধরে জড়িত ছিলেন। এমনকি পৌল দ্বিতীয়বার জেলে বন্দী হবার পরে যখন অনেকেই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন লূক তার পাশে পাশে থেকে তার স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করেছিলেন। ঠিক একইভাবে, পৌলের প্রথমবার জেলে থাকাকালেও তিনি তার দেখাশোনা করেছিলেন। পৌলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও সহকারী ছাড়াও এই লূককে আমরা 'প্রেরিতদের কাজ' নামে বইটির লেখক হিসাবে জানি। এই বইটি প্রেরিতদের কাজের ও ঈশ্বরের লোকদের সকল তথ্য ধরে রাখতেই ৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের চতুর্থ প্রচার অভিযানের সময় লেখা হয়। অবশ্য তার আগে তিনি পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় একটি সুসমাচার লিখেছিলেন, যাকে আমরা বলি, 'লূকের লেখা সুখবর'। যাইহোক, লূক ছিলেন পৌলের সবচেয়ে বাধ্য সহকারীদের মধ্যে একজন।

আরও একজন বিদেশী- তুখিককে আমরা পৌলের বাধ্য সহযোগী হিসাবে দেখতে পাই। তিনিও আঠারো বছর ধরে পৌলের সাথে ছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ৬০ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের প্রথমবার জেলে বন্দী থাকার সময় ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো-ছিটানো খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে পৌলের লেখা চিঠিগুলো বিতরণ করেছিলেন। আমরা জানি, তখনকার রাস্তা-ঘাট মোটেই ভাল ছিল না এবং ভ্রমণের জন্য ছিল খুবই বিপদজনক। সম্ভবতঃ পৌলের এই চিঠিগুলো পৌঁছে দেবার জন্য তুখিককে অনেক দীর্ঘ ও বিপদপূর্ণ পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। যদিও তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, এইসব যাত্রায় কত দীর্ঘ সময় ব্যয় হবে; তবুও কোন প্রশ্ন ছাড়াই তিনি পৌলের অনুগত থেকে তার কথা পালন করেছিলেন।

এ রকম আরও একজন হচ্ছেন ইপাফ্রদীত, যিনি ছিলেন ফিলিপী মন্ডলীর পালক এবং একজন বিশ্বস্ত ঈশ্বরের দাস। তিনি পৌলকে বিশ্বস্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিলেন। ফিলিপী শহরের খ্রীষ্টিয়ানেরা যখন তাদের আত্মিক শিক্ষক পৌলের জন্য অর্থ সাহায্য করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, তখন ইপাফ্রদীত স্বেচ্ছায় মেসিডোনিয়া থেকে ইতালির রোম পর্যন্ত সেই অর্থ পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। পৌল তখন ছিলেন জেলখানায় বন্দী। এই বিপদপূর্ণ পথে ইপাফ্রদীত অসুস্থতার কারণে তার জীবন হারাতে বসেছিলেন। কিন্তু বাইবেল আমাদের বলেছে যে, পৌল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে তিনি অলৌকিকভাবে সুস্থ হন এবং তার দেশ ফিলিপীতে ফিরে যান। তাই, যদিও পৌলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা লোকদের সংখ্যা খুবই কম, তবুও পৌলের

পরিচর্যা কাজের প্রতি তাদের বিশ্বস্ত ত্যাগ স্বীকার ও সংগী হিসাবে তাদের অংশগ্রহণ অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ (ফিলিপীয় ২:২৫-৩০ পদ)।

পৌলের আরও একজন সহযোগীর নাম অনীষিফর। তাকে আমরা ২ তীমথিয় ১ অধ্যায়ে দেখতে পাই। তিনি বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ ভাবে পৌলকে সব সময় সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন (২ তীমথিয় ১:১৬ পদ)। এই অনীষিফরের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখতে পৌল তীমথিয়কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি আসলে এশিয়া মাইনরের বাসিন্দা হলেও ইফিষ থেকেই এসেছিলেন। কিন্তু এশিয়া মাইনরের অন্যান্য সকল খ্রীষ্টিয়ানদের মত তিনি পৌলকে ত্যাগ না করে বরং শেষ পর্যন্ত তার সাথে থেকে তার পরিচর্যা কাজে সাহায্য করেছিলেন। তার বিষয়ে পৌল বলেছেন: "অনীষিফরের পরিবারের উপর প্রভু করুণা করুন; তিনি অনেক বার আমাকে সতেজ করে তুলেছেন, আর আমি কয়েদী হয়েছি বলে তিনি লজ্জিত হননি" (২ তীমথিয় ১:১৬ পদ)। পৌল যতবার তার প্রিয় সহযোগীদের বেঈমানিতে অসহায় বোধ করেছেন, ততবারই অনীষিফর তাকে উৎসাহিত করেছিলেন ও সতেজ করেছিলেন।

কিভাবে অনীষিফর পৌলকে উৎসাহিত করেছিলেন? বাইবেল বলেছে যে, পৌল যখন কষ্টকর মুহূর্তগুলি মোকাবেলা করছেন তখনও অনীষিফর "অনেক খোঁজ করে" তার কাছে গিয়েছিলেন। অনীষিফরের বিশ্বস্ততা সত্যি প্রশংসা করার মত। প্রকৃতপক্ষে, পৌলের শিষ্যেরা যখন তার জেলে থাকার কারণে লজ্জা পেয়ে দূরে থাকার চেষ্টা করেছিল, তখন অনীষিফর বরং তার আত্মিক শিক্ষকের দেখাশুনা করারই চেষ্টা করেছিল; কারণ পৌলের প্রতি তার ছিল সশ্রদ্ধ ভক্তি। অনেকেই পৌলের কাছ থেকে সাহায্য ও অনুগ্রহ পেয়েও তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু অনীষিফর পৌলের কাছ থেকে পাওয়া দয়া ও অনুগ্রহ ভুলে যান নাই। তাই তিনি অনেক কষ্ট করে হলেও এসে পৌলের সাথে দেখা করেছিলেন এবং পৌলকে উৎসাহিত করেছিলেন।

তারই বদলে ২ তীমথিয় ১:১৬ পদে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল অনীষিফরের পরিবারকে আশীর্বাদ করেছেন। পরিবার বলতে আমরা স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও নাতি-নাতনিও বুঝি। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এরকম বিনীত প্রার্থনা গ্রাহ্য করেছেন, কারণ এই প্রার্থনা ছিল মূলতঃ তাঁরই একজন উৎসর্গীকৃত দাস পৌলের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা। ঈশ্বর অবশ্যই অনীষিফরের পরিবারের প্রতি পৌলের অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন। কারণ অনীষিফর নিজেও ঈশ্বরের দাস ও খ্রীষ্টেতে সহ-ভাই পৌলের প্রতি তার দয়ার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দয়া দেখানো মানে, একজন ব্যক্তির নানা দোষ ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো। যারা দয়াশীল তাদের দয়া দেখাতে ঈশ্বর কখনও ভুলে যান না (মথি ৫:৭ পদ)। ঈশ্বর অবশ্যই অনীষিফরকে আশীর্বাদ করেছেন এবং তিনি পৌলের বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে উচ্চতর মর্যাদা প্রাপ্তও হয়েছেন।

ঈশ্বর পৌলকে কেন ভালবেসেছেন?

একটি বিষয় এ ক্ষেত্রে ভাবা স্বাভাবিক; কেন ঈশ্বর পৌলকে এত বেশী ও এত গভীর ভাবে ভালবেসেছেন? এর কারণ, পৃথিবীর যে যে স্থানে সুসমাচার প্রচারিত হয় নাই, পৌল সেই সব স্থানে সুসমাচার পৌঁছে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন।

খ্রীষ্টিয় ইতিহাসের দু'হাজার বছরের পটভূমি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, মন্ডলীসমূহ 'প্রচার' অথবা 'সুসমাচারের' প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে গিয়েছে ও প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা মূলতঃ তাদের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তার করেছে। আবার কোন কোন সময়, তারা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্থির থেকে সদস্য-সদস্যা বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে। এভাবে কোন মন্ডলী যখন বাড়তে থাকে, তখন তা 'বাবিলের উঁচু ঘরের মত' নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে।

প্রেরিত্ পৌল এই মানবিক দুর্বলতার কথা আগে থেকেই বুঝেছিলেন। এই কারণেই তিনি সতর্ক হয়েছিলেন এবং এক মন্ডলীতে তিন বছরের বেশী থাকেন নাই। তিনি ইফিষেই সবচেয়ে বেশী সময় অর্থাৎ তিন বছর থেকেছিলেন। আর করিন্থ শহরে তিনি প্রায় দেড় বছর ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক স্থানে তিনি মাত্র কয়েক মাস কাটিয়েছিলেন। মন্ডলী স্থাপন করতে ও মন্ডলীর নতুন নেতাদের শিক্ষা দিতে ঠিক যতটা সময়

দরকার, তার বেশী সময় তিনি থাকেন নাই। সেজন্য বলা যায় যে, কোন একক মন্ডলীতে তার পদমর্যাদা একজন প্রধান পালকের অনুরূপ নয়। তিনি শুধুমাত্র একজন মন্ডলী স্থাপনকারী, একজন মিশনারি ও ঈশতত্ত্ববিদ। তিনি সত্যি করেই একজন আত্মিক নেতা, অথচ কোন মন্ডলীতে তার কোন সদস্যপদ ছিল না।

বাস্তবিকই যখন কোন মন্ডলী খুব বড় হয়ে ওঠে, তখন মন্ডলীর নেতৃত্ব সংগত কারণেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না যে, আমার মন্ডলীতে হাজার হাজার সদস্য-সদস্যা হোক; বরং প্রভুর কাছে আমার প্রার্থনা, যেন তিনি এত লোক না পাঠান। আমি সত্যি করেই সচেতন- যদি আমার মন্ডলীতে হাজার হাজার সদস্য-সদস্যা হয়, তাহলে মহত্তর সম্মানবোধ ও ক্ষমতা আমাকে অধঃপাতে ঠেলে দিতে পারে। তার বদলে আমি প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বর আমাদের উপাসনা ঘর ভরে দেন। আমাদের গীর্জাঘরে প্রায় তিনশ জন বসতে পারে এবং তিনশ জন প্রকৃত বিশ্বস্ত ও উৎসর্গীকৃত খ্রীষ্টিয়ান সারা পৃথিবীকে বদলে দেবার জন্যই যথেষ্ট।

মূলতঃ আমি কোরিয়ার বেশ একটা গোঁড়া প্রেসবেটিরিয়ান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমার বাবা ও ঠাকুরদা দু'জনেই ছিলেন মন্ডলীর প্রাচীন। আর আমার মা ছিলেন বিশ্বাসী হিসাবে অসাধারণ। প্রতিদিন সকাল ছয়টার সময় তিনি ফিস ফিস করে সকালের প্রার্থনা সভার জন্য আমাদের ডেকে তুলতেন। ছোট বেলায় এত সকালে ঘুম থেকে উঠে এই প্রার্থনা সভা আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। যখনই আমরা হাত খরচের টাকা পেতাম, তখনই আমাদের মা-বাবা দশমাংশ দিতে বাধ্য করতেন। আমরা ব্যাংকে গিয়ে টাকা ভাঙ্গিয়ে বাইবেলের মধ্যে রেখে দিতাম যেন পরের রোববার উপাসনায় গিয়ে দশমাংশ দিতে পারি। যদি অবাধ্যতা করতাম, তাহলে আমাদের ভীষণ শাস্তি দেওয়া হতো। আমাদের পায়ে লাঠি দিয়ে পিটানো হতো।

এইভাবেই আমি বড় হয়ে উঠেছি। সেজন্যই সম্ভবতঃ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমি পালকীয় জীবন গ্রহণ করতে পেরেছিলাম এবং আমার বোন একজন পালককে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। আমার মা প্রথম থেকে আশা করতেন যেন আমি সেমিনারিতে যাই ও পালক হই। কিন্তু যতবার তিনি এ কথা বলেছেন, ততবারই আমি তাকে উত্তর দিয়েছি: 'আমি তো পাগল নই। কোনভাবেই আমি পালক হতে চাই না।' আমি চেয়েছিলাম যেন তিনি কোন ভাবেই আমাকে পালক বানাবার চিন্তা না করেন। আমার কৈশোরকালে আমি নিয়মিত গীর্জায় গিয়েছি কিন্তু তা নির্দিষ্ট আগ্রহের বশে নয়, শুধুমাত্র অভ্যাসের বশেই গিয়েছি। তরুণ বয়সে সিগারেট ও মদ দু'টোই বেশ উপভোগ করতে শুরু করেছিলাম এবং আমি যখন উত্তর আমেরিকার ছাত্র তখনও এভাবেই জীবন-যাপন করেছিলাম।

কোন কারণে ঈশ্বর আমাকে কোরিয়ার তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মত করে জাগতিক জীবনে চলতে দিয়েছিলেন। বোধহয়, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যেন আমি আমার জীবনের প্রথম তিরিশ বছর পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াই; যেমন করে তিনি পৌলকে তার জীবনের তিরিশটি বছর পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াতে, এমন কি মন্ডলীর তাড়নাকারী হতে অনুমোদন দিয়েছিলেন। আমেরিকা আসার আগে পর্যন্ত আমি ঈশতাত্ত্বিক পড়াশোনার ধারে কাছেও যাই নাই। আত্মিক মান বিচারে আমি ছিলাম আমেরিকাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কোরিয়া থেকে আসা একজন আদর্শ বিদেশী ছাত্র। কারণ এই দেশকে বলা হতো অনেক সুযোগ-সুবিধায় ভরা একটি দেশ। গীর্জাতে আমি নিয়মিত যেতাম। তবে আমার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ জাগতিক।

বাসবয় হিসাবে কাজ করতে করতে পরবর্তীতে বারটেন্ডার হয়ে আমি সম্ভবতঃ মদ জাতীয় পানীয় বিষয়ে পিএইচডি অর্জন করেছিলাম। আমার মাথার মধ্যে ছিল প্রায় শতেক খানেক মদের মিশ্রণ প্রণালী (ককটেল) এবং তাদের আসল নামগুলিও আমি চট-জলদি মুখস্থ বলতে পারতাম। বাস্তবিকই, কোরিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আমি বেশ বিখ্যাত হয়েছিলাম, কারণ আমি বারটেন্ডার হতে পেরেছিলাম। তখনকার সময়ে এটা একটা বড় সার্থকতা বলে বিবেচিত হতো। সত্যিকথা বলতে কি, সাদা চামড়ার লোকদের বার টেন্ডার হওয়াটা কষ্টসাধ্য ছিল।

পরে আমি একটা বড় মন্ডলীর সাথে জড়িত হই, কিন্তু তার পিছনে ছিল শুধুমাত্র কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। আমি গীর্জাঘরে বড়দিনের নাচের পার্টির ব্যবস্থা করেছিলাম। তখনকার দিনগুলোতে আমাকে উত্তর আমেরিকার একজন ধনী কোরিয়ান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তখন আমি বিলাস বহুল

গাড়ীতে চড়তাম এবং টাকা পয়সার বদৌলতে সব রকম সম্মান ও মর্যাদা উপভোগ করতাম। কিন্তু একদিন, একটি উদ্দীপনা সভাতে যোগ দিতে আমি গীর্জাঘরে গিয়েছিলাম। ঠিক উদ্দীপনা সভাতে আমার আগ্রহ আছে বলে নয়, কিন্তু একজনের সাথে দেখা করতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

শুনতে দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, আমি গীর্জাঘরে একজনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে নয়। তাছাড়া, আমি এত দেরী করে সেখানে পৌঁছেছিলাম যে, উপাসনা প্রায় শেষ হবার পথে। ঐ দিনের বক্তা তবুও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একজন ছোটখাট বৃদ্ধা মহিলা, পরিচ্ছন্ন ভাবে পরা কোরিয়ার জাতীয় পোশাক। পরবর্তী সময়ে আমি জানতে পেরেছিলাম, তিনি একটি সুপরিচিত কোরিয়ান আশ্রমের পরিচালিকা। এটি ছিল কোরিয়ার প্রথম প্রার্থনা কেন্দ্র। তিনি সত্যিই একজন প্রখ্যাত মহিলা, যিনি শত শত লোককে পালক হতে সাহায্য করেছিলেন।

যখন আমি গীর্জাঘরে ঢুকি, তখন সুস্পষ্টভাবে এই মহিলা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তাই অন্যান্য অনেক দেরী করে আসা লোকদের মত আমি ঠিক পিছনের সারিতে বসেছিলাম। কিন্তু প্রচারের শেষে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। প্রচারের শেষে, সংক্ষিপ্ত গানের সময়, ঐ মহিলা উঠে দাঁড়ালেন এবং পুলপিট থেকে সোজা হেঁটে আমার কাছে আসলেন। এর চেয়েও রহস্যময় মনে হচ্ছিল, কারণ তিনি যেন কাউকে খুঁজছেন- অথচ তার চোখদুটি বন্ধ! অতিশয় আশ্চর্যজনক ভাবেই তিনি এসে আমাকে ধরলেন এবং সোজা মঞ্চে নিয়ে গিয়ে আমাকে সাক্ষ্য দিতে বললেন!

এই দিদিমা, যিনি আমাকে- আমার মত একেবারে অপরিচিত একজন যুবককে, উপস্থিত সমস্ত লোকদের সামনে সাক্ষ্য দিতে বললেন। আমি কল্পনাও করতে পারি না, কতটা হত বিহ্বল আমি হয়েছিলাম। তাকে বললাম, 'দেবার মত আমার কোন সাক্ষ্য নাই' এবং তারপর আমি মঞ্চ থেকে নেমে সোজা চলে এসেছিলাম। কিন্তু কৌতুহলের বিষয় হচ্ছে, মাত্র অল্পদিন পরে গীর্জায় যেতে আমার ইচ্ছা হল। অতঃপর, আমি গীর্জায় গিয়ে ঠিক আগের নির্দিষ্ট জায়গায় বসলাম।

ঐ দিনও প্রচার শেষ হবার পরে, গান চলাকালীন সময়ে, ঐ মহিলা চোখ বন্ধ করেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং আমার হাত চেপে ধরলেন। গীর্জাঘরে বেশ কয়েক'শ পুরুষ ও মহিলা উপাসনা করতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারপরেও, তিনি দু-দু'বার আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন। ঐ দিন তিনি আমাকে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে আমার জন্য জোরে জোরে প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি এ যুগের প্রেরিত্ পৌল হিসাবে ব্যবহৃত হবে। তুমি প্রভুর নামে এই পৃথিবীতে মহৎ কাজ সম্পন্ন করবে।' আমি প্রেরিত্ পৌলের মত কেউ একজন হব তা কখনই ভাবি নাই, কিন্তু এই বৃদ্ধা মহিলা আমার জন্য প্রার্থনা করলেন যেন আমি প্রেরিত্ পৌলের মত একজন হই!

আমার কাছে এটি একটি অদ্ভুত ঘটনা! এই মহিলা– যার সাথে দেখা করাই কারও পক্ষে বেশ কষ্টকর, অথচ এখন তিনিই আমাকে খুঁজে বেড়ান। একদিন তিনি আমাকে তার কোরিয়ার প্রার্থনা কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ দিলেন, যেখানে কোরিয়ান মন্ডলীর প্রায় পাঁচ হাজার নেতা একটা সভাতে সমবেত হয়েছিলেন। তারপরের বিষয়টা আরও আশ্চর্যজনক! তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যেন আমি, পালকীয় অভিষেক ছাড়াই এই আত্মিক নেতাদের সামনে প্রচার করি। এই স্থানটি অভিজ্ঞ পালকদের জন্য নিঃসন্দেহে সম্মানের ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তিনি আমাকে দেশের অনেক খ্যাতনামা আত্মিক নেতাদের সামনে ঈশ্বরের বাক্য বলতে সুযোগ করে দিলেন।

সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত ঈশ্বরের অধীনে থেকে তাঁরই নির্দেশনায় ও অনুগ্রহে, আমি তাঁরই পথ অনুসরণ করে আসছি। আমি বিশ্বাস করি, আমিও ঠিক এ যুগের অন্যান্য অনেকের মতই একজন, যাকে প্রেরিত্ পৌলের ভিশন বা দূরদৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যখন আমার বয়স চল্লিশ, তখন ঈশ্বর দৃঢ়ভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যেন আমি আমার ধনদৌলত এবং প্রতিপত্তি পরিত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করি। এই হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে, প্রথমেই আমার স্ত্রীকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। বিগত এক যুগ ধরে যা কিছু সম্পদ আমরা জড়ো করেছিলাম, তা সবই ত্যাগ করার বিষয় এখানে জড়িত। কিন্তু ক্রমশঃ সময়ের সাথে সাথে টাকা-

পয়সার প্রতি আমার আগ্রহ কমে গেল। আমার চারপাশের লোকেরা আমাকে পাগল বলেছে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিজের উদ্দেশ্যেই আমাকে ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

চল্লিশ বছর বয়স থেকে শুরু করে প্রায় দশটি বছর ধরে আমি ঈশতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলাম এবং পালক হবার জন্য প্রয়োজনীয় সব কটি ধাপ অতিক্রম করেছিলাম। আমার পড়াশোনার সময় থেকেই ঈশ্বর আমাকে প্রচার মিশনে পাঠিয়েছিলেন। যেখানে সুসমাচার প্রচারিত হয় নাই এমন অনেক স্থানে যাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। যে ব্যক্তি বিশটি বছর ধরে উত্তর আমেরিকার মত স্থানে আরামদায়ক জীবন কাটিয়েছে; ঈশ্বর তাকে প্রত্যন্ত মিশন এলাকাতে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখনও কত দেশ আছে যেখানে সুসমাচার প্রচারিত হয় নাই। আমি যখনই সেই সব স্থানে যাই, তখনই ঈশ্বর বার বার আমাকে বলেছেন যেন আমি এইসব লোকদের পরিচর্যা করি। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে, তাঁর বাক্য অনুসরণ করে আজও আমি তা-ই করে আসছি।

সত্যি কথা বলতে কি, কোরিয়াতে আমার সাথে কোন মন্ডলী বা কোন ডিনোমিনেশনের একেবারেই কোন যোগাযোগ নাই। কোন মন্ডলী আমাকে অতিথি বক্তা করেও প্রচার করতে বলে না। এমন কি, আমার সেমিনারির এমন কোন বন্ধু-বান্ধবও নাই যারা কোরিয়াতে পরিচর্যা কাজ করছে। সে কারণেই এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আমি নিজে নিজে পরিচর্যা কাজ করে আসছি। কিন্তু যখনই আমি পৌলের কথা চিন্তা করি, ঈশ্বর তাকে কতটা নিঃসংগ করে রেখেছিলেন। তিনি পৌলের মত আমাকেও নিঃসংগ অবস্থায় তাঁর সেবাকাজে ব্যবহার করছেন।

এই ভাবে নিরিবিলি থাকার ফলে, ঈশ্বর আমাকে দেশীয় পরিচর্যা কাজের চেয়ে বিদেশের মিশন ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে চোখ খুলে দিয়েছেন। বিদেশীদের কাছে ও সুসমাচার পৌঁছে নাই এমন দেশে সুসমাচার প্রচার করতে প্রভু আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। যার ফলে, তিনিই আমাকে একটি বাইবেল কলেজ স্থাপন করে কোরিয়াতে অবস্থানরত বিদেশীদের কাছে ঈশতত্ত্ব পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে সাহায্য করেছেন। আমার জন্য তিনিই তাদের জোগাড় করে দিয়েছেন। আজকে আমাদের শিক্ষা ভবনটি অতি চমৎকার, অথচ প্রথম তিনটি বছর আমাদের সব আয়োজন ছিল তাঁবু টাঙিয়ে অথবা কনটেইনারে। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে আমি কিছু বললে, তিনি উত্তর দিতেন: 'আর কারও উপরে তোমার বিশ্বাস করা দরকার নাই, তাই না? তোমার তো কোন প্রাক্তন সেমিনারি বন্ধু-বান্ধব বা কোন পরিচিত লোকজন নাই। আসলে তোমার তো কোন কিছুতে নির্ভর করার নাই, তা আমি জানি। এখন আমি এমন সব লোকদের নির্বাচন করব, যাদের আমি ভালবাসি। তোমাকে সাহায্য করতে আমি তাদেরই তোমার কাছে পাঠাব।' আর, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষায় কখনও ব্যর্থ হন নাই। একের পর এক এই পরিচর্যা কাজে লোকজন ঠিকই জড়ো হতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে আমার বর্তমান সহকর্মী ও মন্ডলীর সদস্য-সদস্যাগণ রয়েছে। এদের মধ্যে খুব কম লোকের সাথে আমার আগে থেকে জানা শোনা ছিল বা তাদের আগে থেকে চিনতাম। এজন্যই তারা আমার কাছে সত্যিই অমূল্য। আর আমি এও জানি যে, তারা সকলেই ঈশ্বরের মনোনীত, যেন এই পরিচর্যা কাজে আমরা সকলে একসাথে কাজ করতে পারি।

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে: কোন বড় মন্ডলী অথবা কোন বড় ডিনোমিনেশনের সাথে যুক্ত না থেকে বা কোন সাহায্য না নিয়ে কিভাবে আমি এত বড় ও ব্যাপক বিশ্ব মিশন কার্যক্রম পরিচালনা করি! সরলভাবেই বলি, একথার কোন উত্তর আমার জানা নাই। বড় কোন মন্ডলী বা সংস্থা আমাদের পরিচর্যা কাজে আর্থিক কোন সহায়তা দেয় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কারও কথা বলা সম্ভব নয়, যিনি সময়ের প্রয়োজনে প্রচুর যুগিয়ে দিচ্ছেন যেন আমাদের পরিচর্যা কাজ আমরা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, ঈশ্বর নিজেই এই কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন– আমি নই।

আমাদের এই পরিচর্যা কার্যক্রম সারা এশিয়া জুড়ে, মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশে এবং আফ্রিকাতে প্রায় পনেরোটি দেশে পাঁচ হাজার ঈশতত্ত্ব শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ভার বহন করছে। তাছাড়াও, এমি সেটেলাইট ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের দ্বারা আমি সত্যি আশীর্বাদ লাভ করছি, যার মধ্য দিয়ে সারা এশিয়া মহাদেশ জুড়ে আমাদের সংবাদ প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। এই সবই সম্ভব হচ্ছে কারণ ঈশ্বর এগুলো পরিকল্পনা করেছেন

এবং আমার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। যদিও আপনাদের চোখে আমি দৃশ্যমান পরিচর্যাকারী, তবু আমি নই, কিন্তু আমাদের প্রভু আমাদের পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতই সব কিছু সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

আমরা জানি না আমাদের এই পরিচর্যা কাজ ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে। আগামীকাল কি হবে তা-ও আমরা বলতে পারি না, এবং আগামী দিনগুলো কি হবে তা-ও আমি দেখতে পাই না। তবে, আমি যখন বিশ্বাসে এক পা বা দু পা ফেলি, প্রভু তখন আমাকে সব সময়ই সঠিক পথে পরিচালনা দেন। সেজন্য আমি মন স্থির করেছি যে, আমি আমার জীবনের পথে ও পরিচর্যার পথে নিজের পরিকল্পনায় নির্ভর না করে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস ও নির্ভরতা রেখে তাঁরই পরিচালনায় করব।

এটাও সত্যি যে, আমাদের এমি মণ্ডলী সম্পূর্ণ ঈশ্বরের নির্দেশনায় স্থাপিত হয়েছে। মূলতঃ কোন স্থানীয় মণ্ডলী স্থাপনের ইচ্ছা আমার ছিল না। যেহেতু আমি এও মনে করি, স্থানীয় মণ্ডলীর পালকীয় পরিচর্যা কাজে আমি উপযুক্ত নই। তাছাড়াও, সত্যি করে স্থানীয় মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ করতে গেলে আমার 'বিশ্ব মিশন' কার্যক্রমের সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে।

যাইহোক, তবু ঈশ্বর আমাকে বলেছেন যেন এমি মণ্ডলী একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এবং একটি খাঁটি মিশনকেন্দ্রিক মণ্ডলী হয়। আমি এই মণ্ডলীতে সেবা দিচ্ছি, কারণ এই মণ্ডলী আমার বিশ্ব মিশনের উদ্যোগ বুঝে আমার দর্শনকে সমর্থন দেয়। সেজন্য প্রভুর বাক্যের দ্বারা সাহস পেয়েই আমি ছোট একদল লোক নিয়ে মণ্ডলী স্থাপন করি এবং তাঁবুর মধ্যে গীর্জা করতে শুরু করি। আমি এও বিশ্বাস করি, বর্তমানে যারা আমাদের গীর্জাতে উপস্থিত হয় অথবা সাময়িক ভাবেও আসে, তারা সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই উপস্থিত হয়। সে কারণে মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের আমি বিশেষ করে উৎসাহিত করি যেন তারা যে সব মণ্ডলী থেকে এসেছে সেইসব প্রচলিত মণ্ডলীগুলোর সাথে তুলনা না করে আমাদের মণ্ডলীর নেতৃত্ব অনুসরণ করে।

প্রভু যীশু চান তাঁর দেওয়া মহান নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের মণ্ডলী যেন আমার অংশীদার ও সহকর্মী হয়। এর আগে আমি উল্লেখ করেছিলাম, তুলনামূলক ভাবে কোন বিরাট মণ্ডলী পরিচালনা করার ইচ্ছা আমার নাই। সেজন্য আমাদের মণ্ডলী অন্যান্য সাধারণ মণ্ডলীগুলো থেকে কিছুটা হলেও আলাদা। কিন্তু তারপরেও, ঈশ্বর আমার জন্য যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন, তা পূর্ণ করার জন্যই আমি শুধুমাত্র দৌড়াচ্ছি। আর আমি নিজে এই লক্ষ্য অর্জন করতে চাই না, কিন্তু আমার অংশীদার ও সহকর্মীদের সাথে নিয়েই তা করতে চাই।

বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোকদের নেতা হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সেইসব মিশন ক্ষেত্রে মণ্ডলী স্থাপন করা ও বাইবেল কলেজ স্থাপন করার দান ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। স্ব স্ব মিশন ক্ষেত্রের নেতারা যখন আমাদের প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে নির্দিষ্ট মাপে বেড়ে উঠবে, তখন আমি তাদের উপরেই স্থানীয় পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পণ করি এবং অন্য আর একটি মিশন ক্ষেত্রে যাবার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশ গ্রহণ করি।

আমার আরও একটি দর্শন হচ্ছে: আমাদের এমি ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টে এক দেহ হিসাবে সমভাবে সকল আত্মিক নেতা, সকল মিশনারি সংস্থা এবং সকল খ্রীষ্টিয় ডিনোমিনেশনের পরিচর্যা করা। অনেক দিন আগে থেকেই ঈশ্বর এই গভীর দর্শন আমাকে দিয়েছিলেন। এমি ব্রডকাস্টিং হচ্ছে সেই দর্শনের ফল। যখন আমি প্রভুর কাছে স্বীকার করি: প্রভু, এই দর্শন সার্থক করতে আমার তো কোন সম্পদ নাই; ঠিক তখনই তিনি আমাকে এমি ব্রডকাস্টিং স্থাপন করতে ব্যবহার করেছিলেন।

অন্যান্য সাধারণ গীর্জাঘরের মত আমাদের এমি মণ্ডলীর গীর্জাঘর কিন্তু সদস্য-সদস্যাদের দান ও উপহারের টাকায় তৈরী নয়। যদি গীর্জাঘর তৈরীর জন্য তারা টাকা-পয়সা দিত, তাহলে হয়তো তারা বলত: 'এটা আমার মণ্ডলী, আমার গীর্জাঘর'। তারপরে তারা এর 'মালিকানা' দাবি করে নিজেদের স্বার্থ দেখতেই পরস্পর ভাগাভাগি করতে যুদ্ধ শুরু করে দিত। যাইহোক, আমাদের সময় ঠিক তা হয় নাই। আমাদের গীর্জাঘর মাত্র একজন ব্যক্তির দানে তৈরী করা হয়। গীর্জাঘরটি তৈরী করার আগে, ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীর

একজন পরিচারিকাকে একটি দর্শন দিয়েছিলেন। বাস্তবে আমরা কখনই কল্পনা করি নাই যে, শাক-সব্জি চাষাবাদ করার মাঠে একটা গীর্জাঘর তৈরী করা সম্ভব হবে। তারপর ঈশ্বর ঠিক একই দর্শন ঐ পরিচারিকার স্বামীকে দিলেন। তার দর্শন ছিল যেন এখানে একটা নতুন গীর্জাঘর হয়, যেখানে লোকেরা সমবেত হতে পারে। অতঃপর, এই পরিবার খুশী মনে গীর্জাঘর তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় সব টাকা দান করেছিলেন। এতে মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের নতুন গীর্জাঘরের জন্য দান করার চিন্তা থাকল না, বরং এতে তাদের পক্ষে আমাদের আসল পরিচর্যা ক্ষেত্র অর্থাৎ 'বিশ্ব মিশন' ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছিল।

আমার জন্য ভীষণ দুঃখজনক, এমনকি হৃদয় বিদারক হয়, যখন আমি আজকের মন্ডলীগুলো দেখি। নিঃসন্দেহে তারা সংখ্যায় ও আকৃতিতে বেড়ে উঠছে, কিন্তু কোন না কোন ভাবে তারা তাদের খাঁটিত্ব হারিয়ে ফেলছে। বাইরে থেকে মনে হয়, তারা বিশ্ব মিশনের জন্য তাদের সম্পদ ব্যবহার করছে; অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের উপকারের কথা চিন্তা করে এবং তাদের বৃদ্ধি ও লাভের কথা চিন্তা করেই তারা তা করছে। তারা অধিকাংশই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের হৃদয়ের ইচ্ছার অনুরূপ সত্যিকার মিশন মানসিকতায় প্রকাশিত নয়। আমি অনুভব করি এতে আমাদের প্রভু খুবই দুঃখীত হন।

মন্ডলীতে পুনর্জাগরণ আনতে আমি নিজে অবশ্যই সমর্থ না। কিন্তু অতি সরল ভাবে আশা করি, আমাদের এই ছোট মন্ডলীর আদর্শ যেন গ্রহণ ও অনুসরণ করার মত হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা ঈশ্বর যেভাবে চান, যেন ঠিক সেইভাবে আমাদের মন্ডলী গড়ে ওঠে। তাই আমি সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এখানে এমন লোকদের পাঠান যাদের মধ্যে রয়েছে পুনর্জাগরণের হৃদয়াবেগ। এটি আমার অকৃত্রিম বাসনা। এই যুগে প্রভু সত্যিই এমন লোকদের প্রয়োজন অনুভব করেন, যারা পুনর্জাগরণের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। যারা সবরকম ক্ষতি ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেও স্বেচ্ছায় এই কাজে ব্রতী হতে ইচ্ছুক।

এমি মন্ডলীতে এমন অনেকেই আছেন যারা ঈশ্বরের কাজের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক। তাদের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি যখনই তাদের দেখি, তখনই ঈশ্বরের কাছে বিনীত প্রার্থনা করি– ঠিক যেভাবে পৌল তার প্রিয় অনীষিফরের জন্য ও তার পরিবারের জন্য করেছিলেন যেন তারা প্রভুর দয়া ও আশীর্বাদ পায়। এ যুগে পৌলের পরিচর্যা কাজের অনুরূপ আহ্বানে আহূত হয়ে আমিও যথেষ্ট আশীর্বাদের ভাগী হতে চাই। তাইতো আমার দরকার তীমথিয়ের মত, প্রিষ্কিলা ও আকিলার মত বিশ্বাসীদের। লূক এবং তুখিকের মত লোকদের জন্য আমি অপেক্ষমান। ইপাফ্রদীত, বার্ণবা, যোহন, মার্ক এবং অনীষিফরের মত লোকদের সমর্থনের জন্য আমি অতিশয় আকুল।

প্রভু আমাকে এমন লোকদের যোগাড় করে দিয়েছেন এবং আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি ভবিষ্যতেও এমন আরও অনেককে যোগাড় করে দেবেন। এই আশীর্বাদপ্রাপ্ত লোকেরাই আমার জীবনের উৎসাহদাতা; আমার দুর্বলতায়, আমার পতনোম্মুখ অবস্থায়, তারাই আমাকে উৎসাহ দিয়ে ধরে রাখবে। তাদের উৎসাহ সত্যিই আমার জীবনে ভীষণভাবে দরকার। ঠিক যেভাবে পৌল তার বন্ধু অনীষিফরের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন: "অনীষিফরের পরিবারের উপর প্রভু করুণা করুন; তিনি অনেক বার আমাকে সতেজ করে তুলেছেন।" এটি আমারও একান্ত প্রার্থনা যেন আমার সহকর্মীগণ, আমার কার্যকারীগণ, অনীষিফরের মত একই করুণার আশীর্বাদ পেতে পারে। আমি তাদের বলি যেন তারা আমাকেও একইভাবে উৎসাহ দেয়। আর এখন আমি আপনাদের সকলকেই এক একজন উৎসাহদাতা হতে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

উৎসাহদানের শক্তি, উৎসাহের স্বাদ

প্রথম বাংলা প্রকাশ : এপ্রিল ১২, ২০০৯ (ইস্টার)
দ্বিতীয় বাংলা প্রকাশ : জুলাই ১০, ২০১৭

প্রকাশক : আলফ্রেড সুবীর দে
ন্যাশনাল ডিরেক্টর,
আন্টিয়ক মিশনস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, বাংলাদেশ
মোবাইল : +৮৮০-০১৭১৬-০১৬০৬৫/+৮৮০-০১৯১৩-৩০৪০০
ই-মেইল/ ওয়েব : amibangla@outlook.com/ amiglobalbangla.net

অনুবাদ : আলফ্রেড সুবীর দে
সম্পাদনা : এমি মিশনারীগণ
মুদ্রণ :
শুভেচ্ছা মূল্য : : ১৫০.০০ মাত্র

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোন অংশ কোন আকারে প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনঃমুদ্রণ করা যাবে না]

TASTE THE POWER OF ENCOURAGEMENT

First Printing : April 12, 2009 (Easter)
Second Printing : July 2017

Publisher : Alfred Subir Dey
National Director
Antioch Missions International
Dhaka, Bangladesh
Mobile : +880-1716016065/+880-1913390400
E-mail/Web : amibangla@outlook.com/ amiglobalbangla.net

Translation : Alfred Subir Dey
Edited : AMI Missionaries
Printer :
Price : 150.00 Only

[All rights reserved. No part of this book may reproduced in any form without written permission from the Publisher]